দেব সাহিত্য কুটীর
কলিকাতা
চন্দ্রচূড়

আমাদের কথা

ব্রহ্মাবৈ ব্রহ্মপুরাণে আছে তখনকার রাজা ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ একবার চন্দ্রের ওপর রুষ্ট হয়েছিলেন। শুধু রুষ্ট নন, তাঁকে আক্রমণ করেছিলেন। ভয়ে চন্দ্র দেবাদিদেব মহাদেবের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আশ্রিতকে মহাদেব তাঁর মাথায় স্থান দিয়েছিলেন। সেই থেকেই মহাদেবের আর এক নাম **চন্দ্রচূড়।**

অথচ রূপকথায় আমরা দেখতে পাচ্ছি, চাঁদে নাকি একজন বুড়ী আছে। সে নাকি দিনরাত চরকা কেটে যাচ্ছে। তার বয়স কত কেউ জানে না। চাঁদের কালো দাগগুলোকে ঘিরে গাছের তলায় বুড়ী বসে আছে, এইটাকেই মানুষ কল্পনা করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু নিজের কল্পনাতে মানুষ সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। তাই চললো অনুসন্ধান। বৈজ্ঞানিকরা বললেন, 'চাঁদ আমাদের এই পৃথিবীর মতনই একটি গ্রহ।' তবে ওই কালো দাগগুলো কিসের? ওগুলো হল পাহাড় আর সমুদ্রের দাগ। তাই কি? না এও নতুন কল্পনা?

চললো আবার অনুসন্ধান। শুরু হল নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা। হিসেবে সব মিললো। কিন্তু প্রমাণ কই? মানুষ আবার সচেষ্ট হয়ে উঠলো, সেখানে পাড়ি জমাবার জন্যে। অবশেষে তিনজন মার্কিনবাসী আর্মস্ট্রং, আলড্রিন আর কলিনস্ গত ২১শে জুলাই ১৯৬৯ সালে চাঁদে পদার্পণ করলেন। আমাদের বাস্তব জগতে এ একটা বিস্ময়। চাঁদ আজ কল্পনার বস্তু নয়, সে আজ মানুষের কাছে বাস্তব সত্য। সেখানে বুড়ীও নেই বা শিবের মাথায়ও চাঁদ আশ্রিত নয়।

প্রতিবারের মত দেব সাহিত্য কুটীর যে পুজোর বই এবার বার করছে, তার নাম রাখা হল **'চন্দ্রচূড়'।** মানুষের বিস্ময়কর আবিষ্কার স্মরণে রাখার জন্যই এই ধরনের নাম রাখা হল। তোমরা বড় হয়ে যাতে আরও দুর্গম অভিযানে জয়ী হয়ে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করতে পার, তার জন্যই এই প্রচেষ্টা।

প্রকাশক

যে সব লেখা আছে

চিত্রসূচী

● একবর্ণ চিত্র ●

● দ্বিবর্ণ চিত্র ●

● ত্রিবর্ণ চিত্র ●

—মুরারিমোহন বিট

বোসেদের দোতলার ফোকরে তিন-চার পুরুষ ধরে পিংকুদের বসবাস। এখন ওরা চারজনে থাকে। পিংকু, পিংকুর মা-বাপ, আর খুব ছোট্ট একটি বোন। পিংকুর বয়সও অল্প। সবে কৈশোরে পদার্পণ করেছে। চেহারাটিও দেখতে খাসা। বেশ হৃষ্টপুষ্ট···গায়ের সবুজ রঙটা খুবই উজ্জ্বল···টুকটুকে লাল ঠোঁট।

পিংকু রঙিকে খুব ভালবাসে···দুজনে খুব ভাব। রঙিকে তোমরা চেন না বোধহয়? রঙি হল শালিক মা-বাপের একমাত্র ছেলে। ওরা থাকে বোসেদের বাড়ি থেকে আধ মাইলটাক তফাতে নন্দীদের বাড়ির ফোকরে। নন্দীদের বাড়ির সামনে দিয়ে গরুরগাড়ি-চলা যে চওড়া কাঁচা সড়কটা গেছে, ঐ সড়ক ধরে সোজা উত্তরমুখো কিছুটা গেলেই বাঁ হাতে পড়ে হারান মুখুজ্যের তালপুকুর। পুকুরটার চারিদিক তালগাছে ঘেরা। আর আছে একটা বড় বাবলা গাছ পুকুরটার ঠিক কিনারে—জলের

ওপর ঝুঁকে। গাছটায় যখন ছোট ছোট হলুদ রঙের ফুল ফোটে, বড় সুন্দর লাগে দেখতে।

প্রায় প্রতিদিনই দুপুরে পিংকু আসে রঙিদের ফোকরে। রঙিকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বসে ঐ বাবলা গাছের ডালে। ঝিরঝিরে হাওয়ায় যখন বাবলা গাছের ডাল দোলে, বড় ভাল লাগে পিংকু আর রঙির। দোল খায় আর গল্প করে। অনেক কথাই হয় দুজনের মধ্যে।

শালিকের সঙ্গে ছেলের মেলামেশার কথা জানতে পেরে পিংকুর মা-বাপ তো রেগেই অস্থির! মা পিংকুকে ডেকে আচ্ছা করে ধমকে দিল,—ছোট জাতের সঙ্গে মিশতে তোর লজ্জা করে না হতভাগা? আমরা হচ্ছি জাতে টিয়া—পক্ষিজাতের মধ্যে আমাদের স্থান অনেক উঁচুতে! আর ওরা শালিক, নোংরা ঘেঁটে পোকা খায়··· স্বর্গ আর নরকে যতটা তফাত, টিয়া আর শালিকেও ততটা তফাত। তুই তো কচি খোকাটি ন'স যে তোকে এসব বুঝিয়ে দিতে হবে? ফের যদি ঐ শালিকদের ত্রিসীমানায় যাবি, তাহলে তোরই একদিন কি আমারই একদিন!

পিংকু তবু ছাড়তে পারে না রঙির সঙ্গ। রঙিকে বড় ভাল লাগে ওর। বেশ মিষ্টি স্বভাব ছেলেটার। মায়ের কাছে বকুনি খাওয়ার পর পিংকু সুযোগমত গোপনে রঙির সঙ্গে মেলামেশা করতে শুরু করে···রঙিকে সে নিজের ভাইয়ের মত আপনজন বলে মেনে নিয়েছে।

পিংকুর মন জাত-বিচার করতে রাজী নয়। সে ভাবে শালিকও পাখি, টিয়াও পাখি—সবাই পক্ষিজাত। এর মধ্যে আবার পৃথকভাবে জাতবিচার করা কেন?

সেদিন বাবলাগাছের ডালে বসে রঙি পিংকুকে শুধাল,—তুমি তো আগের মত আর আমার সঙ্গে গল্প করো না পিংকু ভাই, দু-একটা কথা বলেই চলে যাও! আমাকে কি তোমার আর ভাল লাগে না?

পিংকু ইতস্তত: করে বলল,—না, না, তা কেন? তোমাকে আমার বড় ভাল লাগে, তোমার জন্যে আমি জান দিতে পারি ভাই! কিন্তু ব্যাপারটা কি হয়েছে জান? ক'দিন থেকে মায়ের শরীরটা ভাল যাচ্ছে না—তাই মন-মেজাজ আমার ভাল নয়।

চন্দ্রচূড়

রঙি ক্ষুব্ধ হয়ে বলল,—একথা আমাকে বলো নি কেন? চলো, তোমার মাকে দেখে আসি।

পিংকু তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠে,—না, না, সেরকম কিছু হয় নি, এই সামান্য একটু···মানে তুমি বড্ড ধৈর্য হারিয়ে ফেল রঙি!

রঙি আর কোন কথা না বলে চুপ করে। কিন্তু সে বেশ অনুভব করতে পারে পিংকুর কিছু একটা হয়েছে···মিথ্যে কথা বলছে সে।

অবশেষে একদিন ওদের ঐ গোপন মেলামেশাও ধরা পড়ে গেল টিয়া-মা আর টিয়া-বাপের কাছে। বাপ তো অগ্নিশর্মা! চিৎকার করে বলল,—দূর হ' হতভাগা কুপুত্র কোথাকার! টিয়া হয়ে শালিকের সঙ্গে মেশা আমি বরদাস্ত করতে পারব না! টিয়া-সমাজের কানে যদি একথা ওঠে, তারা যে আমাদের একঘরে করে দেবে! বদ্যি-গিরি করে যা দু-পয়সা রোজগার করছি তা-ও বন্ধ হবে। তখন যে দাঁতে দড়ি দিয়ে থাকতে হবে হতভাগা।

পিংকু কোন কথা বলতে সাহস পায় না—চুপচাপ ঘাড় গুঁজে বসে থাকে। বাবা যা বদরাগী—কিছু বলতে গেলেই ঠোঁট দিয়ে মাথায় এমন এক ঠোক্কর লাগাবে যে, চোখে সরষে ফুল দেখতে হবে!

বাপ আর ছেলের এই বোঝাপড়া চলছিল ফোকরের সামনে রাস্তার ধারের নিমগাছটার আগডালে। ঝগড়া শুনে টিয়া-মা ফোকর থেকে উড়ে এসে বসল ওদের সামনে। বলল টিয়া-বাপকে উদ্দেশ্য করে,—খুব হয়েছে আর গলাবাজি করতে হবে না! পাখিরা সবাই জুটে মজা দেখবে যে! কাল থেকে পিংকুকে আর বাড়ির বার হতে দেব না, তাহলেই হবে। এখন দয়া করে একটু থাম দিকি।

পরদিন সত্যিই মায়ের সতর্ক দৃষ্টির পাহারা উপেক্ষা করে পিংকু রঙির কাছে যেতে পারল না। ওদিকে রঙি বসে বসে ভাবে, কেন আজ এল না তার বন্ধু পিংকু? তবে কি ওর মায়ের অসুখ খুব বেড়েছে? ভাবতে-ভাবতেই সেদিনটা কেটে গেল

রঙির। কিন্তু পরদিনও যখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল এল, অথচ পিংকুর দেখা নেই, সে তখন রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়ল। মনস্থির করল পিংকুদের বাড়ি গিয়ে দেখে আসবে ব্যাপারটা কি ? যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। রঙি তার পাখনা মেলে দিল আকাশের গায়ে।

নিমগাছের যে ডালটা একেবারে পিংকুদের ফোকরের কাছে গিয়ে পড়েছে, সেই ডালে বসে ডাকল,—পিংকু, পিংকু—

—কে, রঙি ?

ফোকরের ভেতর থেকে পিংকুর ভীত-চঞ্চল কণ্ঠ ভেসে এল। রঙি খুশী হল বন্ধুর সাড়া পেয়ে। বলল,—হ্যাঁ আমি। একবারটি শোন না ভাই ?

এবার পিংকুর পরিবর্তে এক ভারিক্কি কণ্ঠ শুনতে পেল রঙি,—কে রে ? সেই শালিক ছোঁড়াটা বুঝি ?

বলতে বলতেই বেরিয়ে এল পিংকুর বাপ। রঙিকে দেখেই তার লাল চোখ দুটো আগুনের মত জ্বলে উঠল ! ট্যাঁ-ট্যাঁ শব্দে চিৎকার করে বলল,—ব্যাটা ছোট জাত, লজ্জা করে না টিয়ার বাড়ি আসতে ? তোরা তো মেথরের জাত—নরদমা ঘেঁটে বেড়াস ! বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার মতলব ঠাউরেছিস বুঝি ? ওসব চালাকি চলবে না বাছাধন !

মুখ শুকিয়ে আমসির মত হয়ে যায় রঙির। ভয়ে ভয়ে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে—আজ্ঞে—

টিয়া-বাপ আরও রেগে যায়। মুখ ভেংচে বলে,—আবার 'আজ্ঞে' করা হচ্ছে ! ফক্কোড় ডেঁপো ছোকরা, নচ্ছার, হারামজাদা···দেখবি মজাটা ?

বলেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ে রঙির ওপর, তারপর ধারাল ঠোঁট দিয়ে ওর মাথায় এমন জোর এক ঠোক্কর মারে, মাথার মাঝখানটা একেবারে ফুটো হয়ে যায়। চ্যাঁ-চ্যাঁ করে চেঁচাতে চেঁচাতে রঙি দুচোখে অন্ধকার দেখে পড়ল নীচেকার কাঁটা ঝোপে।

ব্যাপার দেখে তীব্র আর্তনাদ করে ওঠে পিংকু। তারপর সকল বাধা এবং ভয় উপেক্ষা করে সে ফোকর থেকে বেরিয়ে পড়ে।

চন্দ্রচূড়

—কোথায় যাচ্ছিস্ ? চিৎকার করে ওঠে টিয়া-বাপ।

জবাব দেয় না পিংকু—সোজা নেমে যায় ঝোপটার মধ্যে। যন্ত্রণায় ছটফট করছে রঙি, আর চ্যাঁ-চ্যাঁ করে কাতরাচ্ছে। মাথা দিয়ে বেরুচ্ছে টাটকা তাজা রক্ত··· সমস্ত মাথাটা ভিজে গেছে সে-রক্তে। আর বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে পিংকু রঙিকে ঠোঁটে তুলে নিয়ে আকাশের গায়ে পাখা মেলে দেয়।

টিয়া-বাপ আর টিয়া-মা দেখেও আর কিছু বলল না।

পড়ল নীচেকার কাঁটা ঝোপে। [পৃঃ ৪

গাঁয়ের শেষ প্রান্তে আছে আগাছা আর ঝোপ-ঝাড়ের জঙ্গলে ঘেরা একটা জলা। সেই জলার ধারে ভিজে মাটির ওপর একরকম ছোট ছোট অদ্ভুত ধরনের গাছ আছে। ঐ গাছের ডাল ভাঙলে গাঢ় সাদা রস বের হয়। ঐ রস পাখিদের যে কোন ক্ষতস্থানে লাগালে নাকি সেরে যায়, একথা পিংকু শুনেছে তার বদ্যি-বাপের কাছে। তাই সে রঙিকে এনে নামাল ঐ জলার ধারে। তারপর ঠোঁটে করে পটাপট দুটো ডাল ছিঁড়ে এনে তার রস লাগিয়ে দিল ক্ষতস্থানে।

রঙি চোখ মেলে তাকাল কিছুক্ষণ পর। চোখের ভেতরেও রক্ত ঢুকে গেছে। সে বোধহয় ঠিক চিনতে পারছে না পিংকুকে। কিচকিচ করে শুধাল,—তুমি কি পিংকু ?

—হ্যাঁ ভাই, আমি তোমার বন্ধু পিংকু। তোমার মাথায় ওষুধ লাগিয়ে দিয়েছি, তুমি ঠিক সেরে উঠবে।

একটু চুপচাপ রইল রঙি। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। তারপর বলল,—আমাকে মা-বাবার কাছে নিয়ে চল ভাই, আমি আর বাঁচব না।

না, না, না, পিংকু তা পারবে না। এ অবস্থায় রঙিকে কি পৌঁছে দেওয়া যায় তার মা-বাপের কাছে? ইতস্ততঃ করে বলল,—বাড়িতে তোমাকে পৌঁছে দেব বইকি, আর একটু সুস্থ হয়ে নাও।

রঙি কাতরভাবে বলল,—না পিংকু, এখুনি আমাকে নিয়ে চল, আমি যে আর বেশীক্ষণ বাঁচব না।

সত্যিই সে বাঁচল না—প্রায় তখুনি সে মরে গেল।

শালিক মা-বাপের একমাত্র ছেলে রঙি। চোখের মণি! সেই চোখের মণির মৃত্যু-সংবাদ যখন বয়ে নিয়ে এল পিংকু, তখন সে কি কান্না শালিক মা-বাপের।

ফোকরের ওপরকার ছাদের কার্নিসে পিংকু হতভম্বের মত বসে রইল। ওদের কান্না থামলে পিংকু হঠাৎ ডাকল,—মা!

চমকে ওঠে শালিক-মা।

পিংকু উড়ে এসে বসল শালিক-মায়ের পাশে, বলল,—আজ থেকে আমি তোমার ছেলে, তুমি আমার মা।

রঙিদের ফোকরের পাশে আর একটা ফোকর খালি। সেই ফোকরেই রয়ে গেল পিংকু। বাড়ি ফিরল না—ফিরবেও না আর কোনদিন। তারই জন্য যখন মৃত্যু হয়েছে রঙির, তখন সে-পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাকে এইভাবেই করতে হবে।

সন্ধ্যে হয়ে আসে, তবু ছেলেকে ফিরতে না দেখে টিয়া-মা তো ভেবেই অস্থির। টিয়া-বাপকে বলল,—একবার খোঁজ করে দেখলে না ছেলেটা কোথায় গেল?

গর্জন করে ওঠে টিয়া-বাপ,—চুলোয় যাক, জাহান্নমে যাক! আমার কোন

দরকার নেই ও কুলাঙ্গার কুপুত্রের। জাত-মান-ইজ্জত—সব খুইয়েছে ও! আমার ঘরে ও-ছেলের স্থান হবে না।

রাত্রি এল, টিয়া-বাপ ঘুমিয়ে পড়ল, কিন্তু টিয়া-মায়ের চোখে ঘুম নেই। তারপর যেন কত যুগ ধরে অপেক্ষা করার পর রাত্রি প্রভাত হল। টিয়া-বাপের ঘুম ভাঙলেই টিয়া-মা ভয়ে ভয়ে বলল,—একবার খুঁজে দেখবে না ছেলেটাকে?

—না, না, না! ফের যদি তুমি ও ছেলের নাম মুখে আনবে, তোমাকেও তাড়াব বাড়ি থেকে।

সূর্য উঠলে টিয়া-বাপ বেরিয়ে পড়ে রুগী দেখতে। নন্দীদের বাড়িটার সামনে দিয়ে যেতেই থমকে সে বসে পড়ে একটা শিমুলগাছের ডালে। নন্দীদের ছাদের কার্নিসে বসে একটা শালিকের সঙ্গে কথা কইছে পিংকু। দেখে পায়ের রক্ত মাথায় উঠে যায় টিয়া-বাপের। গাল-মন্দ খাওয়া সত্ত্বেও এমন নির্বিবাদে বাড়ি ছেড়ে চলে এসে ছোট জাতের সঙ্গে মিশছে? এত অধঃপতন! কিন্তু তার যত রাগ গিয়ে পড়ল শালিকটার ওপর। সে আজ এ শালিকটাকেও খুন করবে। ছোট জাত হয়ে এত স্পর্ধা! সে তখুনি তীরবেগে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল রঙির মায়ের ওপর।

আর ঠিক সেই সময় পেটে এক তীব্র আঘাত অনুভব করল টিয়া-বাপ! ট্যাঁ-ট্যাঁ শব্দে আর্তনাদ করে উঠল সে। কোন রকমে টাল সামলাতে সামলাতে মাটিতে না পড়ে নন্দীদের ছাদের ওপর গিয়েই লুটিয়ে পড়ল সে। শালিক মা-বাপ আর পিংকু তখুনি টিয়া-বাপের কাছে গিয়ে হাজির হল।

গুলতি ছুড়েছিল একটা ছোট ছেলে। সেই গুলতির আঘাতেই টিয়া-বাপের ঐ অবস্থা। ছেলেটা গুলতি ছুড়েছিল কিন্তু পিংকুকে লক্ষ্য করে। টিয়া-বাপ ঐ সময় হঠাৎ ওদের কাছে গিয়ে হাজির হওয়ায় গুলতিটা তার গায়েই লাগে।

এদিকে টিয়া-বাপের অবস্থা কাহিল। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে এক সময় সে জল চাইল,—একটু জল দাও, বড্ড তেষ্টা—

পিংকু তৎক্ষণাৎ ছুটল। খুঁজে-পেতে রাস্তা থেকে এক টুকরো ছেঁড়া কাপড় ঠোঁটে তুলে নিয়ে পুকুরের জল থেকে কাপড়টা ভিজিয়ে নিয়ে ফিরে এল।

চন্দ্রচূড়

—বাবা হাঁ কর, জল খাবে।

টিয়া-বাপ হাঁ করেও আবার মুখ ঘুরিয়ে নিল।

পিংকু ডাকল,—বাবা—

দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যেও টিয়া-বাপ কঠোর কণ্ঠে বলল,—না! যে-ছেলের জাত নেই তার হাতে আমি জল গ্রহণ করব না। তুই সরে যা আমার সামনে থেকে। তুই চোখের সামনে থাকলে আমি মরেও শান্তি পাব না!

শালিক-মায়ের ইঙ্গিতে পিংকু খানিকটা তফাতে সরে গিয়ে বসল।

এরপর কিছুক্ষণ চুপচাপ। কেউ কোন কথা বলছে না।

টিয়া-বাপ কাতরাচ্ছে শুধু। আর থাকতে পারছে না সে—তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। ওঃ! কী ভীষণ তৃষ্ণা! নাঃ, আর সহ্য করতে পারছে না। মরিয়া হয়ে সে বলে উঠল,—কে আছো, একটু জল দাও।
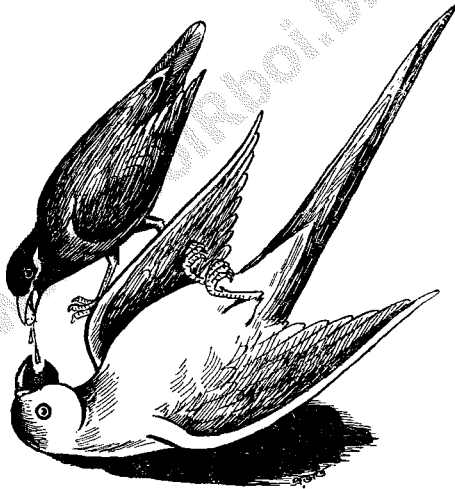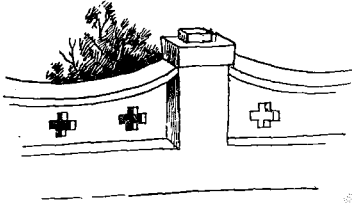
শালিক-মা তাড়াতাড়ি ভিজে কাপড়ের টুকরোটা টিয়া-বাপের ঠোঁটের ওপর তুলে ধরল।

কাপড়ের টুকরোটা টিয়া-বাপের ঠোঁটের ওপর তুলে ধরল।

● মুরারিমোহন বিট

আঃ! যেন স্বর্গের সুধা! ফোঁটার পর ফোঁটা জল খেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠল টিয়া-বাপ।

আরও কিছুক্ষণ পর টিয়া-বাপ উড়বার শক্তি ফিরে পেল। শালিক-মা বলল,—পিংকুর ওপর আর রাগ করবেন না; অল্প বয়েস, অবুঝ ছেলে। একে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে যান। গিয়ে পুরুত ডেকে আপনার আর আপনার ছেলের যাহোক কিছু একটা প্রায়শ্চিত্ত করে নেবেন। আপনার জাত যাক, এ ইচ্ছা আমাদের ছিল না। আচমকা বিপদটা দেখা দিল বলেই……আর আমরা আপনাকে কথা দিচ্ছি, পিংকুকে আমাদের কাছে আর আসতে দেব না—নিশ্চিন্ত থাকুন।

টিয়া-বাপের চোখে জল।

—পূরবী দেবী

রাজার মনে একটুও সুখ নেই। রানীও সব সময় মনমরা হয়ে থাকেন। এত বড় প্রাসাদ, এত ধনরত্ন তবুও তাঁদের মন সদাই খাঁ-খাঁ করে। তাঁরা অনেক আশা করে একটা ঘরে ছোট ছেলেদের খেলনা সাজিয়ে রেখেছিলেন। তাঁদের ছেলে হলে সেই সব জিনিস নিয়ে খেলা করবে। কিন্তু তাঁদের সে আশায় ছাই পড়েছে। ছেলেও হল না, মেয়েও হল না।

একদিন রানীকে একলা জানলা দিয়ে বিষণ্ণ মনে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে রাজা এসে বললেন, এমন একলা মনমরা হয়ে কি ভাবছ তুমি ?

রানী রাজার দিকে ফিরে বললেন, ভেবেছিলুম একটা সুন্দর মেয়ে হবে আমার। আজও হল না তাই আমার আর কিছু ভাল লাগছে না।

মেয়ে হওয়ার কথায় রাজার মনটাও খুব খারাপ হয়ে গেল। বললেন, সত্যি রানী যদি একটা ছেলে থাকতো তাহলে তাকে নিয়ে আমরা কত আনন্দ করতুম !

এই রকম আলোচনা তাঁরা রোজই করেন।

সে দেশে এক জাদুকর থাকতো। অনেক তুক-তাক করে সে লোকের রোগ ভাল করতো। কিন্তু সোনার উপর তার ভারী লোভ। সোনা পেলে যে যা চাইতো তাকে সে তাই পাইয়ে দিতো। এতো রকম মন্ত্র জানতো সে।

সে যখন টের পেলে যে সন্তান হয়নি বলে রাজা-রানীর মনে দুঃখের শেষ নেই তখন বললে, রাজা যদি আমায় পঞ্চাশ থলি সোনার মোহর দেয় তাহলে আমি ছেলে হবার মন্ত্র বলে দেব।

কথাটা লোকের মুখে মুখে ফিরে মন্ত্রী মশায়ের কানে ওঠে। মন্ত্রীর কাছ থেকে রাজা সে কথা জানতে পারেন। সে কথা শুনে রাজা তখনি লোক পাঠালেন জাদুকরকে তাঁর সভায় ডেকে আনতে।

রাজার আদেশ অমান্য করা যায় না। তাই জাদুকর এসে উপস্থিত হল রাজসভাতে।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি পার কোন মন্ত্র শেখাতে যাতে রাজপুত্র হয় ?

—পারি মহারাজ।

—তবে শেখাও আমায়।

—বিনামূল্যে তো মন্ত্র দেওয়া যায় না।

—কি চাই তোমার বল।

—আজ্ঞে, পঞ্চাশ থলি মোহর।

রাজা বললেন, বেশ, আজই বিকেলে পাঠিয়ে দেব মোহর। এবার বল তোমার মন্ত্র।

জাদুকর বললে, রানীমা যখন ঘুমোবেন আপনি মাথার কাছে দাঁড়িয়ে শুধু বলবেন, হিং টিং ছট্—ছেলে হবে চট্।

এই বলে জাদুকর চলে গেল।

রাজা ছিলেন ভারী কৃপণ। তাঁর অনেক ধনদৌলত থাকলেও প্রাণ ধরে কাউকে দিতে পারতেন না। মোহর হাতছাড়া হবার আগেই মন্ত্রটা হাতে পেয়ে তিনি ভারী খুশী। দুপুরবেলা রানীকে ঘুমোতে দেখে তাঁর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে মন্ত্রটা তিনবার আউড়ে তিনি বাইরে বেরিয়ে এলেন।

তারপর কোষাগারে গিয়ে খাজাঞ্চীকে হুকুম দিলেন পঞ্চাশ থলি তাঁবার পয়সা জাদুকরের কাছে পৌঁছে দিতে।

ওদিকে দুপুর উতরে বিকেল হল। জাদুকর তার ঘরে বসে দোরের দিকে চেয়ে আছে, কখন রাজার লোক এসে থলিভরতি মোহর দিয়ে যাবে।

কেউ আর আসে না।

জাদুকর উঠে একবার বাইরে বেরিয়ে দেখে।

কারো দেখা পাওয়া যায় না।

এদিকে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হল।

তখন জাদুকর অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ভাবছে রাজা বুঝি তাকে ঠকালে। তা যদি ঠকায় তাহলে সে আবার মন্ত্র পড়ে ছেলে হওয়ার মন্ত্রের গুণ নষ্ট করে দেবে।

এই ভেবে আগুন জ্বেলে, তাতে কড়া চাপিয়ে জাদুকর একটা তুক করতে লাগল। কড়ায় ছিল একরকম জল। সেটা ফুটে উঠলেই জাদুকর মন্ত্র পড়বে। ব্যস তারপরই রাজার বলা মন্ত্রে আর কাজ হবে না।

জলটা গরম হয়েছে।

জাদুকর কাছে এসে দাঁড়াল।

এমন সময় দরজা ঠেলে এসে ঘরের মাঝখানে দাঁড়াল রাজার লোক। হাতে তার থলিভরতি পয়সা। তার পেছনেও অনেক লোক। তাদের হাতেও সেইরকম থলি। তাই দেখে মন্ত্র বলা বন্ধ করে জাদুকর তাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

থলিগুলো রেখে যে লোকটি প্রথমে ঢুকেছিল সে বললে, রাজামশাই এই থলি-

ভরতি মোহর পাঠিয়ে দিলেন। এখানে রইল। এই বলে সে চলে গেল। তার পিছু পিছু বাকী লোকগুলিও বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

তখন ভারী খুশী হয়ে জাদুকর এসে একটা থলি তুলে নিলে মেঝে থেকে। থলির ভেতরে মোহরের শব্দ কেমন যেন ঢ্যাবঢ্যাব করে উঠল। সে তাড়াতাড়ি থলির বাঁধা মুখটা খুলে ফেলে তার ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিলে। হাতের মুঠোয় উঠে এল একরাশ তাঁবার পয়সা।

তাঁবা দেখে জাদুকরের হল ভারী রাগ। কি, আমায় ঠকানো! সে তো গিয়ে আর রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে না। তাই অন্যভাবে প্রতিশোধ নেবে ঠিক করলে।

এই ভেবে ফুটন্ত জলের সামনে ফিসফিস করে মন্ত্র পড়ে সেই জল একটা হাতায় তুলে নিয়ে রাজবাড়ির দিকে ছুড়ে দিয়ে বললে, রাজার ছেলেকে যেন গাধার মত দেখতে হয়।

একথা রাজামশাই টের পেলেন না।

যথাসময়ে রানীর একটি ছেলে হল। ছেলে দেখে সকলে অবাক। কে বলবে এ মানুষ। ঠিক যেন একটা গাধা খোকা সেজে এসেছে।

দেখে রাজার মন খারাপ। রানীরও দুঃখের শেষ নেই। রেগে গিয়ে বললেন, এটা সেই জাদুকরের কাণ্ড। তার জন্যেই ছেলে আমার গাধা ছেলে হল। ওকে খুব শাস্তি দিতে হবে।

সে কথা শুনে রাজা বললেন, না রানী, জাদুকরের কোন দোষ নেই। সব দোষ আমার। আমি তাকে সোনার মোহরের বদলে তাঁবার পয়সা দিয়ে ঠকিয়েছিলুম, তারি শাস্তি পেয়েছি। যা হবার হয়েছে। এ যখন আমাদের ছেলে, একেই আমাদের মানুষ করতে হবে।

রাজার ছেলে মানুষ হতে থাকে রাজবাড়িতে।

একটু যখন হামা দিতে শিখলে, খোকা-গাড়িতে চড়িয়ে মুখে চুষি দিয়ে রাজ-বাড়ির দাসীরা তাকে বাগানে হাওয়া খাইয়ে বেড়াতে লাগল।

চন্দ্রচূড়

ছেলেটা দেখতে গাধা হলেও আচরণ তার ঠিক মানুষের মতই ছিল। তাছাড়া তার বুদ্ধিও খুব। স্বভাবে খুবই বিনয়ী। তাই অনেকে ভালবাসতো তাকে, আবার গাধা বলে কেউ কেউ বিদ্রূপও করতো। কিন্তু কোন ছোট ছেলে তার সঙ্গে মিশতো না।

তিন-চাকার সাইকেল চালিয়ে একলা বেড়াতো।

তারপর একটু বড় হয়ে সে তিন-চাকার সাইকেল চালিয়ে একলা বেড়াতো। ছোট ছেলেরা দূর থেকে দেখে হাসতো। কেউ আসতো না তার কাছে।

এখন তার বয়েস ছ'বছর পার হয়েছে। তাকে লেখাপড়া শেখাবার জন্যে রাজামশাই ভাল দেখে শিক্ষক নিযুক্ত করে দিলেন। শিক্ষক ভাবলেন গাধার মাথায় কাদা পোরা, এ আর কি লেখাপড়া শিখবে! কিন্তু মাস্টারমশাই-এর ধারণা ভুল হল। দেখতে দেখতে গাধা সবকিছু শিখে ফেললে।

গাধা যত বড় হতে থাকে নানা বই পড়ে সে অনেক কিছু শিখে ফেলে। তার মত পণ্ডিত আর সে রাজ্যে কেউ রইল না। অথচ তার একটাও সঙ্গী হল না। গাধার সঙ্গে কে আর মিশবে! তাই যখন সে অন্য সব ছেলেদের খেলতে দেখতো, তারও খেলবার ইচ্ছে হত খুব, কিন্তু খেলতে না পেয়ে একলা বসে মনের দুঃখে কাঁদতো হাপুসনয়নে।

সেবার রাজার সভায় একজন নামকরা সেতার-বাজিয়ে এসেছে। সেতারে তার বাজনা শুনে সকলেই মুগ্ধ। গাধাও সেখানে ছিল। সে ভাবলে, সব পড়া শেষ করেছি কিন্তু গানবাজনা তো শেখা হয়নি। এর কাছ থেকে সে বিদ্যেটা শিখে নিলে মন্দ হয় না।

● পূরবী দেবী
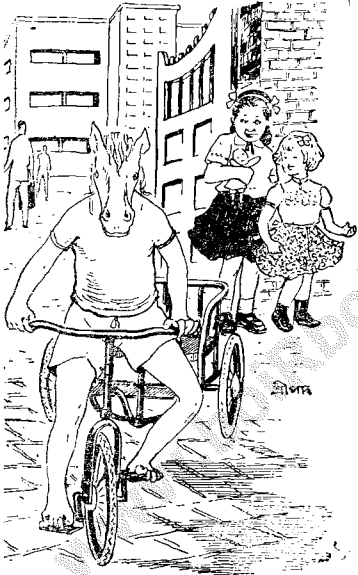
এই ভেবে সে একদিন বাজিয়ের বাড়ি গিয়ে হাজির। বাজিয়েকে বললে, আপনি আমায় গানবাজনা শিখিয়ে দিন।

বাজিয়ে তো হেসেই খুন। বললে, তোমার গলায় কি আর সুর বেরোবে ?

—হ্যাঁ। চেষ্টা করব। নিশ্চয় হবে।

—সেতারে হাত দিলেই তোমার খুরে সব তার জড়িয়ে সব কিছু একাকার হয়ে যাবে। তুমি টেবিল বাজানো শেখ—এই বলে বাজিয়ে হো হো করে হেসে উঠল। যেন এটা একটা মস্ত বড় রসিকতা।

এত বড় বিদ্রূপেও গাধা রাজপুত্তুর নিরাশ হল না। সে বললে, আমি নিশ্চয়ই পারব। আপনি আমায় শেখান।

বাজিয়ে যখন দেখলে গাধাকুমার একেবারে নাছোড়বান্দা তখন সে তাকে শেখাতে লাগল।

প্রথম প্রথম সত্যিই তার হাতে তার ছিঁড়ে যেতে লাগল আর গলা দিয়ে হেঁড়ে স্বর বেরোতে লাগল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সে তার নিজের দোষগুলো শুধরে নিয়ে বেশ ভাল বাজাতে ও গান গাইতে শিখলে। তবুও সে শেখা বন্ধ করলে না।

একদিন সেই বাজিয়ে বললে, রাজকুমার, আর কোন গান বা সুর আমার জানা নেই। সব তোমায় শিখিয়েছি। এখন আমার চেয়েও অনেক ভালো গাইতে বাজাতে পার তুমি।

সে কথা শুনে খুশী হয়ে গাধা একদিন তার বাবা মাকে গান শোনাতে গেল।

রাজামশাই ও রানীমা তখন দুজনে বসে তাস খেলছিলেন। তাঁদের কাছে একটু দূরে একটা টুলে বসে সেতার বাজিয়ে গাধাকুমার একটা গান ধরলে,—

বক বকম পায়রা
তোর রকম সকম দেখে—

গান সে সত্যিই ভাল গেয়েছিল। গান শেষ হতে সে ভেবেছিল তার বাবা মা খুশী হয়ে তাকে আদর করবেন তার গুণ দেখে। কিন্তু সে নিরাশ হয়ে গেল। তাঁরা

তো ভাল বললেনই না, বরং রাজামশাই বললেন, আমরা এখন বড় ব্যস্ত, তুমি অন্য কোথাও খেলোগে। বিরক্ত কোর না।

এ কথা শুনে গাধাকুমারের মনে হয়েছিল ভারী দুঃখ। কেউ তাকে ভালবাসে না। এমন কি তার নিজের বাবা মাও তাকে দেখতে পারে না। তাই সে একলা বসে ভাবতে লাগল কি করবে।

অনেক ভেবে ঠিক করলে যে দেশে কেউ তাকে ভালবাসে না সে দেশে থেকে আর লাভ কি! তার কাছে রাজপ্রাসাদও যা বনও তাই। বনে তবু জন্তু-জানোয়ারদের সঙ্গে ভাব হতে পারে। এই ভেবে সে তার সেতারটা সঙ্গে নিয়ে কাউকে কিছু না বলে সোজা বনে চলে গেল।

সেখানে রোজ সকালে সে পাখিদের গান শোনাতো।

একদিন বনের পথে হাঁটতে হাঁটতে সে এসে হাজির হল এক প্রাসাদের সামনে। প্রাসাদ দেখে তার খুব কৌতূহল হল। সে গাধার মত দেখতে হলেও মনটা তো মানুষের মত। তাই প্রাসাদের ফটকের সামনে এসে হাজির হল।

ফটক আগলে দাঁড়িয়ে ছিল একজন রক্ষী।

গাধা বললে, আমি রাজার সঙ্গে দেখা করব।

গাধা মানুষের মত কথা বলছে—সেই রক্ষী তো হেসেই আকুল।

রক্ষী তাকে দোর ছাড়ছে না দেখে সেতার বাজিয়ে গাধা একটা গান ধরলে।

গাধা গায় গান, এ তো ভারী অদ্ভুত কথা।

রক্ষী ছুটল রাজার কাছে।

রাজা তখন রাজকন্যা ও রানীর সঙ্গে খেতে বসেছেন।

রক্ষীর মুখে সব কথা শুনে বললেন, কী আশ্চর্য! নিয়ে এস তাকে।

রানী আশ্চর্য হয়ে বললেন—গাধা গান গায়!

রাজকুমারী বললে—এ এক অদ্ভুত ব্যাপার!

তাঁরা কৌতূহলী হয়ে খাওয়া ভুলে গাধার অপেক্ষায় দরজার দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন।

● পূরবী দেবী

সেতার হাতে লেজ দোলাতে দোলাতে গাধাকুমার সেখানে এসে হাজির হল।

তাকে দেখে রাজা একটা আসন দেখিয়ে বসতে বললেন।

গাধা উপবেশন করার পর রাজা বললেন, তুমি গান গাইতে পার?

—পারি মহারাজ!

—আমাদের একটা শোনাও না।

টুং টুং করে সেতারে শব্দ উঠল। গাধার সামনের পা দুটো হাতের মত সেতারের উপর ওঠা-নামা করতে লাগল। সেতারের সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গাধা গান ধরলে। গাধার গলা থেকে এমন মিষ্টি গান বেরোতে পারে রাজা রানী তো ভাবতেই পারেননি। রাজকুমারীও ভারী খুশী। সে বললে, তোমার গলা কী সুন্দর! তুমি এখানে থাকো আর আমাদের রোজ গান শুনিয়ো।

এত সহানুভূতি গাধাকুমার কখনও পায়নি। সে রাজী হল থাকতে। তখন রাজা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি খাবে?

গাধা বললে, আমি সব কিছু খাই।

টেবিলে অনেক রকম খাবার সাজানো ছিল।

তারা সকলে টেবিল ঘিরে বসল। গাধা বসল রাজকুমারীর পাশে। খেতে খেতে নানা কথা হতে লাগল। খাওয়া শেষ হতে রাজকুমারী বললে, তুমি আর একটা গান গাও।

রাজকুমারীর পাশে বসে গাধা এবার একটা ঘুমপাড়ানী গান গাইলে।

সে গান কানে যেতেই রাজা রানী ও রাজকুমারী সেখানেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

তারপর গাধাকুমার মনের সুখেই সেখানে দিন কাটাতে লাগল।

একদিন রাজামশাই বসে রাজ্যের হিসাবনিকাশ দেখছেন। গাধাও তাঁর পাশে বসে আছে। একটা হিসেব রাজা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না। তাই দেখে গাধা সেটা তাঁকে বুঝিয়ে দিলে।

গাধার এত বুদ্ধি দেখে রাজা অবাক হয়ে গেলেন। তারপর থেকে রাজকার্যের নানা সমস্যার কথা তিনি গাধার সঙ্গে আলোচনা করতেন।

চন্দ্রচূড়

রাজকুমারী যখনই সময় পেত তখনই গাধাকে বাগানে নিয়ে গিয়ে গান শুনতো। একদিন রাজকুমারী বললে, তুমি একটা হাসির গান গাইতে পার?

গাধা বললে, পারি।

—গাও তো শুনি।

গাধা গান ধরলে সেতার বাজিয়ে।

হাসতে হাসতে রাজকুমারী গড়িয়ে পড়ল। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। দু'হাতে পেট চেপে ধরে বললে, দোহাই তোমার এবার একটা করুণ গান কর। তা না হলে আমার হাসি থামবে না। দম ফেটে মরে যাব।

গাধা বললে, করুণ গান যে ভুলে গেছি।

এইভাবে মহানন্দে সেখানে গাধার দিন কাটতে লাগল।

একদিন গাধা একটা বাগানে বসে বই পড়ছে। তার কাছ দিয়ে দুজন রাজার রক্ষী গল্প করতে করতে চলে গেল। তাদের কথা গাধার কানে এল—

তারা বলাবলি করছে, এবার রাজকন্যার বিয়ে হবে। সব ঠিক হয়ে গেছে।

সে কথা শুনে গাধার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। সে যে রাজকন্যাকে মনে মনে এত পছন্দ করতো এটা এতদিন বুঝতে পারেনি। বিয়ে হলে রাজকুমারী শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে শুনে তার মনে খুব কষ্ট হল।

সেদিন সব সময়ে সে রাজকুমারীর কথাই ভাবতে লাগল। সারারাত তার ঘুমও হল না। সে ঠিক করলে রাজকুমারীর বিয়ের আগে এ রাজ্য ছেড়ে চলে যাবে।

তাই সকাল হতেই সে রাজার কাছে এসে হাজির হল।

রাজা বললেন, কি ব্যাপার? আজ এত সকালে যে?

—আজ্ঞে আমি বিদায় নিতে এসেছি।

আশ্চর্য হয়ে রাজা বললেন, সে কি! না না তোমার এখন যাওয়া হবে না। তুমি না থাকলে আমাদের ভারী কষ্ট হবে।

কিন্তু গাধার মত বদলাল না। সে বললে, না মহারাজ, আমি ঠিক করেছি আজই যাব। আমায় বিদায় দিন।

রাজা ভাবলেন ওর বুঝি কষ্ট হচ্ছে প্রাসাদে থাকতে। তাই বললেন, তোমার জন্যে সুন্দর মার্বেল পাথরের তৈরী বাড়ি করে দেব। তুমি যেও না।

তবু গাধা থাকতে রাজী হয় না।

অগত্যা রাজা মত দিলেন।

তখন রাজকুমারীর কাছে বিদায় নিতে গাধা বাগানে এসে হাজির হল।

রাজকুমারী তখন একলা বাগানে বসে ছিল। গাধাকে দেখে তার মুখ খুশিতে ভরে উঠল। সে বললে, একটা গান শোনাও আজকে—

—শোনাচ্ছি, তার আগে বিদায় চেয়ে নি। আমি এখান থেকে চলে যাব।

—সে কি!

—হ্যাঁ রাজকুমারী। আমি গাধা, আমায় কেউ চায় না। তাই থেকে কি আর করব!

গাধার স্বরটা খুব করুণ কান্নাভেজা শোনাল।

গাধার কথায় রাজকুমারীর মনটাও দুঃখে গলে গেল। সে বললে, আমি চাই গাধাকুমার। তোমাকে আমার বড্ড ভাল লাগে।

সে কথা শুনে গাধা বললে, যাকে কেউ ভালবাসে না তার বেঁচে কি সুখ! আচ্ছা তার আগে তোমায় একটা গান শোনাই। এই বলে সেতার বাজিয়ে গাধা একটা করুণ গান গাইলে।

গান শুনে কাঁদতে কাঁদতে রাজকন্যা বললে, তোমায় আমি ভালবাসি গাধাকুমার!

—সত্যি? উঃ!

উঃ বলেই গাধা বুকে হাত দিলে। একটু আগেও বুকটা তার সাধারণ গাধার মত মসৃণ ছিল। কিন্তু এখন সেখানে একটা বোতাম দেখা গেল। বোতামে হাত দিয়ে গাধা ভাবছে এটা আবার কোত্থেকে এল।

সে বোতামটা রাজকন্যারও চোখে পড়েছিল।

সে তাড়াতাড়ি খুলে দিলে সেটা।

বোতামটা খুলে দিতেই গাধার খোলসটা খুলে পায়ের কাছে পড়ে গেল, আর তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল সুন্দর এক রাজপুত্র।

বেরিয়ে এল সুন্দর এক রাজপুত্র।

রাজপুত্রকে দেখে রাজকন্যা বললে, যা ভেবেছি তাই। এত সুন্দর লোকের কি গাধা রূপ হতে পারে!

রাজকুমারও বললে, আমার সব সময় মনে হত আমি মানুষ। তোমার জন্যে আমার আসল রূপ ফিরে পেলুম। তুমি আমায় বিয়ে করবে?

রাজকন্যা খুব রাজী।

তখন তারা রাজার কাছে গেল।

সব শুনে রাজা অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর হল ভারী আনন্দ।

একটা ভাল দিনে তাদের বিয়ে হয়ে গেল। তারপর সে দেশের রাজা হল রাজপুত্র রাসভ কুমার *।

---

* ইংরেজী রূপকথা থেকে

খেয়ালী চন্দ্রবিন্দু

—যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা বর্ণমালার মধ্যে অ-আ ক-খ ইত্যাদি কত বর্ণই তো আছে! কিন্তু তার মধ্যে চন্দ্রবিন্দু যে এমন চিড়বিড়ে মেজাজের বর্ণ, কে তা জানত?

সে খবর প্রকাশ পেয়েছে মাত্র কয়েক বছর আগে—১৯৪৭ সালে।

দেশ নাকি তখন স্বাধীন হয়েছে! কিন্তু দেশ স্বাধীন হোক বা না হোক, মানুষগুলো যে স্বাধীন হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। কেউ স্বাধীন হয়েছিল মজা লুটতে, আর কেউ স্বাধীন হয়েছিল উপোস করে মরতে!

দেশের এমনি যখন অবস্থা, সেই সময় এক অলিখিত মাসিকপত্রে, অদৃশ্য ছাপার অক্ষরে, নেপথ্যের ভাষায়, এক অর্ধাশনব্রতী সাহিত্যিক চন্দ্রবিন্দুর খবরটি সর্বপ্রথম পরিবেশন করেন।

চন্দ্রচূড়

ভাগ্যিস তিনি সাবধান করে দিয়েছিলেন, "চন্দ্রবিন্দুর জাগরণ! সবাই হুঁশিয়ার!"

যথাসময়ে হুঁশিয়ার করে না দিলে, কত ঝামেলাই যে হতো, কে জানে? তার ফলে পুলিশী মন্ত্রী নাজেহাল হয়ে যেতেন, আর বর্ণমালার বই থেকে চন্দ্রবিন্দুকে ছেঁটে ফেলার জন্য হয়তো কত 'অর্ডিন্যান্স' জারী হতো!

তবু মাত্র কয়েকটা দিনের মধ্যেই চন্দ্রবিন্দু মশাই যে অনর্থের সৃষ্টি করেছিলেন, সেকথা মনে হলে আজও শিউরে উঠতে হয়!

কি যে ঘটেছিল, তাই বলছি।—

এক দুষ্টু ছেলে পীণ্টু। সে কিছুতেই বাংলা বর্ণমালা শিখতে পারলে না। তাই তার বাবা তাকে তিন চাঁটি লাগিয়ে রেগেমেগে বললেন, "গাধা কোথাকার! এক বছর চেষ্টা করে একটা অক্ষরও শিখতে পারলি না?"

পীণ্টু আর যাই হোক, কথায় খুবই পরিষ্কার! সে তক্ষুণি প্রতিবাদ করে বলে, "না বাবা! একটা অক্ষর আমি তিন দিনেই শিখে নিয়েছি।"

—"বটে! সে কোন্ অক্ষর রে?" বাপ জিজ্ঞেস করেন।

পীণ্টু বলে, "চন্দ্রবিন্দু। সে আমি তিন দিনেই শিখে ফেলেছি।"

বাপ ধমকে ওঠেন, "নে নে, থাম! চন্দ্রবিন্দু আবার একটা অক্ষর নাকি? না ওর কোন দরকার আছে? আসলে ও একটা অক্ষরই নয়, ও একটা ফাউ!—"

হঠাৎ পীণ্টুর পুঁথি-পত্তরে কোথায় একটা সরসর করে শব্দ শোনা গেল। পীণ্টুর মনে হলো, তার 'বর্ণবোধ' বইখানা থেকে চন্দ্রবিন্দুটা বোধহয় এখনই ছুটে বেরিয়ে আসবে! আর, তারপরেই শুরু হবে একটা খুনোখুনি ব্যাপার!

বাস্তবিক, এমন একটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের কথা কেউ কখনো সইতে পারে?

'চন্দ্রবিন্দু আবার একটা অক্ষর নাকি? না ওর কোন দরকার আছে?'—চন্দ্রবিন্দু সম্পর্কে এই যে একটা অবহেলার কথা, এ নিশ্চয়ই একটা চূড়ান্ত অপমান।

● যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চন্দ্রচূড়

এমন একটা অপমান যদি চন্দ্রবিন্দু মশাই সহ্য না করেন, তাহলে কি তাঁকে কোন দোষ দেওয়া যায় ?—

না, একেবারেই না। আর সত্যি বলতে কি, সেদিন থেকে স্পষ্টই বোঝা গেল, পীণ্টুর বাবার ঐ অপমানজনক কথা চন্দ্রবিন্দু সহ্য করেনি একেবারেই। প্রতিহিংসার খেয়াল তার মাথায় কেবল একটার পর একটা চাড়া দিয়েই যেতে শুরু করলো। খেয়ালী চন্দ্রবিন্দুর খেয়ালের ফলে, মাত্র কয়েকটা দিনেই মানুষ কেমন হাঁপিয়ে উঠলো !

রাত্তিরে খেতে বসেছেন পীণ্টুর বাবা। তাঁর পাশে বসেছেন পীণ্টুর মামা ও পীণ্ট। ডাল-তরকারি খাওয়া হয়েছে, বাকি শুধু মাছ।

পাশের ঘরে পীণ্টুর মা। তিনি হাত ধুয়ে মাছ দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন ; কিন্তু তারি মধ্যে পীণ্টুর বাবা উত্ত্যক্ত হয়ে উঠেছেন। তিনি একটু হেঁকে বললেন, "কি হচ্ছে গো ! মাছ দাও না কেন ? মাছ ?"

"দিচ্ছি।" পাশের ঘর থেকে সাড়া দেন পীণ্টুর মা। তিনি উঠে দাঁড়ালেন ঝোলের গামলা হাতে, মাছ পরিবেশন করবেন।

হঠাৎ অদৃশ্যভাবে এগিয়ে আসে খেয়ালী চন্দ্রবিন্দু ! পীণ্টুর বাবার কাঁধে সে তক্ষুণি ভর করলো। তার ফলে তাঁর স্বাভাবিক কণ্ঠ হয়ে গেল অনুনাসিক।

তিনি বললেন, "দিঁচ্ছিঁ ! কেঁবঁল দিঁচ্ছিঁ ! মাঁছঁ, শীঁগ্‌গির মাঁছঁ নিঁয়েঁ এঁসোঁ !—"

তাঁর এমন কণ্ঠস্বরে চমকিত হয়ে পীণ্টুর মামা তাকালেন তাঁর দিকে। আর পীণ্টু ? সে তো ভ্যাঁ করে কেঁদেই ফেললে ভয়ে।

ঠিক তক্ষুণি মাছ নিয়ে বেরিয়ে আসছিলেন পীণ্টুর মা। হঠাৎ নাকী সুরে মাছের তাগিদ ও পীণ্টুর কান্না শুনে, তিনি গেলেন ঘাবড়ে। তবু দু'এক পা এগিয়ে এলেন সেই ঘরের দিকে।

কিন্তু তাঁকে দেখতে পেয়েই পিত্তি জ্বলে উঠলো তাঁর স্বামীর। তিনি দাঁত খিঁচিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, "মাঁছঁ মাঁছঁ কঁবাঁর বঁলবোঁ ? মাঁছঁ দেঁবেঁ, নাঁ—"

চন্দ্রচূড়

আর বলতে হলো না। একে অন্ধকার রাত, তায় অমন নাকী সুরে মাছের তাগিদ! "ঠাকুর-ঝি গো, ভূত!" বলেই তিনি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন, মাছের গামলাও হলো ধূলিসাৎ!

"ঠাকুর-ঝি গো, ভূত!" বলেই তিনি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন, মাছের গামলাও হলো ধূলিসাৎ।

সঙ্গে সঙ্গে তুমুল কাণ্ড। ছুটে এলো পীণ্টুর পিসী, ছুটে এলো পাড়াপড়শী, আর ছুটে এলো ওঝা। সকলের মুখেই এক বুলি, "পেত্নী! ভূত!"

সবারই ধারণা,—পীণ্টুর বাবার ছদ্মবেশে কোন ভূত এসে খেতে বসেছে।

তারপর যা হয়ে থাকে, পীণ্টুর বাবার বরাতে হলো তাই। ওঝা এলো, ফকির এলো, শুরু হলো মন্তর পড়া আর তার সঙ্গে ঝাঁটাপেটা ও উত্তমমধ্যম ধোলাই! কিন্তু কেন যে তিনি মার খেলেন, তিনি তার কিছুমাত্র বুঝতে পারলেন না। চন্দ্রবিন্দুর খেয়ালেই ছিল বৈশিষ্ট্য। যাকে সে ভর করে, নিজে সে একবারও বুঝতে পারে না যে কণ্ঠস্বরের কোন পরিবর্তন হয়েছে।

যাহোক্, মার খেয়ে আধমরা হয়ে তিনি পড়ে রইলেন; আর চন্দ্রবিন্দুও তখন তাঁকে ছেড়ে দিয়ে অন্য আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়েছে।

● যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চন্দ্রচূড়

(২)

পরদিন বিকেলে। এক বিখ্যাত জননায়কের মৃত্যু-বার্ষিকী। তারি অনুষ্ঠান হচ্ছে বিরাট এক হলঘরে। লোকে লোকারণ্য।

নীতীশবাবু বিখ্যাত বক্তা। শত হাততালির মধ্যে বক্তৃতা শুরু করলেন,—

"মাননীয় সভাপতি মহোদয়! সমবেত মহিলাবৃন্দ ও ভদ্রমহোদয়গণ! যুগে যুগে এমন সব মানুষ আবির্ভূত হয়েছেন, দেশ ও জনসাধারণ যাঁদের ঋণ কোনদিনই পরিশোধ করতে পারে না। স্বর্গত দাশ মশাই ছিলেন তেমনি এক মহাপুরুষ।

ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে আমার মতের মিল ছিল না বটে, আমাদের চিন্তাধারাও ছিল বিভিন্ন। তবু একথা স্বীকার করতে কোন বাধা নেই যে, তাঁর দেশপ্রেমে কোন খাদ ছিল না।"

নীতীশবাবু এই পর্যন্ত বলেই টেবিল থেকে গ্লাস তুলে এক চুমুক জল খেয়ে নিলেন। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন। কিন্তু চন্দ্রবিন্দুর খেয়ালে সহসা তাঁর কণ্ঠ থেকে বেরুতে লাগলো খোনা স্বর।

জনসাধারণ সহসা চঞ্চল হয়ে উঠলো। কারণ, নীতীশবাবু তখন নাকী-স্বরে বলছিলেন, "স্বঁর্গতঁ দাঁশ মঁশাঁইয়েঁর দেঁশপ্রেঁমেঁ খাঁদঁ ছিঁল নাঁ বঁটেঁ কিঁন্তুঁ যেঁ পঁন্থা তিঁনিঁ বেঁছেঁ নিঁয়েঁছিঁলেঁনঁ, তাঁ সঁর্বতোঁভাঁবেঁ তাঁর আঁন্তঁরিঁকঁ হঁলেওঁ, পঁরিণাঁমেঁ বিঁপঁজ্জনঁক হঁয়েঁ উঁঠেঁছিঁলঁ।"—

জনতার মধ্য হতে সহসা এক কণ্ঠস্বরে প্রতিবাদ ধ্বনিত হলো, "ন্যাকামি রাখুন মশাই, সহজ কথায় বলুন।"

বাধা পেয়ে নীতীশবাবু কিছু বিরক্তভাবেই বললেন, "ন্যাঁকাঁমি আঁমিঁ কঁরিঁনিঁ। দাঁশ মঁশাঁই যাঁ কঁরেছিঁলেনঁ, আঁমিঁ তাঁ পূঁর্ণ দাঁয়িত্বঁ নিঁয়েঁই বঁলছিঁ।"—

এবার জনতার ভেতর থেকে কয়েকটি তরুণের মাথা একসঙ্গে দেখা গেল।

একজন বললো, "আমরা এসেছি দাশ মশাইয়ের স্মৃতিপূজা করতে। কোন বিরুদ্ধ সমালোচনা করতে আপনাকে ডাকিনি।"—

এবার চটে উঠলেন নীতীশবাবু। বললেন, "ওঁহেঁ ছোঁকঁরা, আঁমাঁকেঁ আঁমঁন্ত্রঁণ কঁরাঁ হঁয়েছেঁ, আঁমিঁ তোঁমাঁদেঁর নিঁমঁন্ত্রিতঁ অঁতিথিঁ।"

আবার এক উত্তপ্ত কণ্ঠস্বর, "হয়েছে, হয়েছে, আমাদের অপরাধ হয়েছে মশাই! আর বলতে হবে না, এবার বসে পড়ুন।"

গোলমাল ততক্ষণে চরমে উঠে গেছে। সভাপতি মশাই তাঁর টেবিল চাপড়েও শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারছেন না, এমনি এক অসহনীয় অবস্থা!

একদিকে নীতীশবাবু ও তাঁর মুষ্টিমেয় অনুবর্তী, আর-একদিকে জনতার অধিকাংশ। প্রথম দলের যুক্তি হচ্ছে, "সত্যি যা তা সব সময়ই সত্যি। সেকথা মোটা বা খোনা, যে-কোন সুরেই বলা যায়। বলবে বৈ কি! নিশ্চয় বলবে।"

দ্বিতীয় দলের প্রতিবাদ তীব্র হয়ে ওঠে, "বটে! চালাকি? একি ভূত-পেত্নী-শাঁকচুন্নীর সভা?"

পরিণামে শুরু হলো হাতাহাতি ও অবশেষে টেবিল-চেয়ার ছোড়াছুড়ি ও সভা লণ্ডভণ্ড!

ব্যাপার দেখে চন্দ্রবিন্দুর মুখে হাসির ধুম পড়ে যায়! মনে মনে বলে, "কেমন এখনো কেউ বলবে কি, চন্দ্রবিন্দু কোন অক্ষরই নয়?"

(৩)

আবার একদিন। রায়বাড়িতে ছোটখাটো একটি উৎসবের সমারোহ পড়ে গেছে। সনৎ রায়ের একমাত্র ছেলে অজিত। তাকে পাকা দেখতে এসেছে কনের বাড়ি থেকে।

অজিত বি. এ. পাস ছোকরা। সুন্দর ফুটফুটে চেহারা, কবি বলে একটু সুনামও আছে।

মেয়ের মামা এসেছেন আরো লোকজন নিয়ে। একজন জিজ্ঞেস করে, "তোমার নামটি কি বাবা?"

—"শ্রীঅজিতকুমার রায়", বিনীতভাবে উত্তর দেয় অজিত।

—"বেশ বাবা, তুমি নাকি কবিতা লিখতে পার? তোমার লেখা একটা কবিতা আবৃত্তি করে শোনাও।"

আড়ালে থেকে চন্দ্রবিন্দু তার মনে মনে বলে, "দাঁড়াও সোনার চাঁদ, তোমাকে আবৃত্তি করাচ্ছি। দু' এক লাইন চালাও, তারপরেই তোমার কাঁধে চাপবো।"

অজিত ততক্ষণে তার স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি শুরু করে দিয়েছে।—

"ছ্যাপ্‌ছেপে ভ্যাপ্‌সা পানাপচা গন্ধ,
সেই জলই খায় যত পঙ্গু ও অন্ধ!
তেলেভাজা কুকুরের লেজ টানে বঙ্কা,
ডিগবাজি খেয়ে নাকি যেতে পারে লঙ্কা।"

এ পর্যন্ত বলার পরেই তার কাঁধে চাপলো চন্দ্রবিন্দু। অজিত তখন বলে চলেছে,—

কঁবিঁতাঁ বুঁঝিঁতেঁ নাঁরেঁ কঁভুঁ কোঁনোঁ মুঁখুঁ্য,
ভাঁলঁ শ্রোঁতাঁ কোঁথাঁ পাঁই, সেঁই বঁড়ঁ দুঁঃখুঁ!"

—"ব্যস, হয়েছে, থামো!" ধমকে ওঠেন কনের মামা।

অজিত হয়তো আরো বলে যেতো। কিন্তু ধমক খেয়ে সে স্তব্ধ হয়ে গেল।

কনের মামা তীব্রকণ্ঠে বলেন, "আমরা তোমার ঠাট্টার পাত্র নই যে, যা খুশী তাই বলে যাবে ঠাট্টার সুরে। একটা সাধারণ ভদ্রতা-জ্ঞান অন্ততঃ থাকা উচিত ছিল। তুমি বি. এ. পাস করেছ, না ঘোড়ার ডিম করেছ!"

এই বলে সনৎবাবুর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাঁকে বললেন, "আমি বড় দুঃখিত যে আপনার ছেলের সঙ্গে আমরা কাজ করতে পারলুম না। আপনার বি. এ. পাস মাকাল ছেলে নিয়ে আপনি আনন্দে থাকুন—আমরা বিদায় নিচ্ছি।"

কাজেই বিয়ে ফেঁসে গেল, সনৎবাবুর একটা বড় শিকার হাতছাড়া হয়ে গেল। সনৎবাবু অবশ্য এজন্য দায়ী করেছিলেন তাঁর ছেলেকে, তাকে গালমন্দও কম করেন নি। কিন্তু আসলে চন্দ্রবিন্দুই যে এর মূল কারণ, সে খবর তো কেউ জানলো না!

চন্দ্রচূড়

বিজয়-গর্বে চন্দ্রবিন্দু অলক্ষিতে আর একবার হেসে ওঠে।

(৪)

টুকটুকে লক্ষ্মী বউ ঘরে এসেছে সেনেদের বাড়ি। অমিয় সেনের পুত্রবধূ সে। ছেলে সুশিক্ষিত এঞ্জিনীয়ার, বধূমাতাও শিক্ষিতা—বি. এ., বি. টি.।

ফুলশয্যার রাত। কত উপহার, কত খানাপিনা! সমস্ত বাড়ি উৎসবে জমজমাট! খানাপিনার পর বর-কনের বন্ধু-বান্ধব অনেকেই চলে গেল, ক্লান্ত বর-কনেও তাদের বাসর-ঘরে চলে যায়।

শাশুড়ী আগেই বলে দিয়েছেন, "বউমা, খাওয়ার পরে কাপড় বদলে যেতে হয়। এঁটো কাপড়ে শুয়ে যেন অপদেবতার নজরে পড়ো না। তোমরা ইংরেজী শিখলেও এসব জিনিস অবহেলা করতে নেই।"

অলক্ষিতে চন্দ্রবিন্দু বুঝি তখনই একবার হেসেছিল! ভাবলো সে, "এত সাবধানতা! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা!"

স্বামী-স্ত্রীর প্রথম আলাপ। হাসিখুশী দু'জনেই—দু'জনারই মনে আনন্দ। নববধূ নতমুখী।

স্বামী শুরু করে প্রথম কথা। সে জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা বল তো রমা, এরপর কি এম্. এ. পড়তে চাও?"

ততক্ষণে চন্দ্রবিন্দু ভর করেছে স্ত্রীর কণ্ঠে। স্ত্রী জবাব দেয়, "তোঁমাঁদেঁর যাঁ ইঁচ্ছেঁ।"

সচমকে স্বামী তার একলাফে দশ হাত দূরে সরে যায়।

বিস্মিতা স্ত্রী জিজ্ঞেস করে, "ওঁকিঁ, অঁমঁন কঁরলেঁ কেঁনঁ?"

—"মা! মা!" চিৎকার করে কাঁপতে থাকে বর।

—"কি রে?" অপর ঘর থেকে জবাব দেন মা।

কনে-বউ শঙ্কিতভাবে স্বামীকে জিজ্ঞেস করে, "মাঁকে ডাঁকঁছ কেঁনঁ? কিঁ হঁলোঁ?"

● যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামীর মুখ সে চেপে ধরতে এগিয়ে যায়।

—"খবরদার!" স্বামী তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

ততক্ষণে চন্দ্রবিন্দু ভর করেছে স্ত্রীর কণ্ঠে। [পৃঃ ২৮

বাইরে বেরিয়েই ছেলে প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, "মা, মা! এ তুমি কাকে পাঠিয়েছ আমার ঘরে? এ যে নির্ঘাত পেত্নী, নির্ঘাত শাঁকচুন্নী!"

বিদ্যুতের মত ছড়িয়ে পড়ে সংবাদটা। সকলেই শুনতে পেলো, সেনেদের বউকে পেত্নী পেয়েছে!

কাজেই এলো ওঝা-ফকির, আর দর্শকের দল!

ওঝা এসেই শুরু করে তার ঝাড়ফুঁক, মন্ত্রতন্ত্র!

লজ্জায় কনে-বউ মরমে মরে যায়। তার যত প্রতিবাদ ও অনুনয়, সবই ব্যর্থ হলো। অথচ নিজে সে বুঝলো না কোথায় তার গলদ!

এরপর ওঝা হাতে নিলে এক বিরাট ঝাঁটা। কনে-বউ শিউরে ওঠে আতঙ্কে। কিন্তু পরক্ষণেই শুরু হলো ওঝার মন্ত্র ও ঝাঁটার প্রহার।

এমনি ভাবে চলে কিছুক্ষণ। অবশেষে প্রহারের ফলে বউ তো অজ্ঞান হয়ে গেল, আর ওদিকে চন্দ্রবিন্দুর মনেও হলো দয়ার উদয়।

চন্দ্রচূড়

সে নেমে গেল তার কাঁধ থেকে, সঙ্গে সঙ্গে কনে-বউয়ের কণ্ঠস্বর আবার স্বাভাবিক হয়ে আসে। ওঝা কেরামত আলির জয়-জয়কার পড়ে যায়!

অন্তরালে থেকে চন্দ্রবিন্দু আবার একবার হাসে। সে বলে, "আরে ধ্যাৎ তোর কেরামত আলির কেরামতি! এই চন্দ্রবিন্দু শর্মার দয়া না হলে, দেখা যেতো তোমাদের বাহাদুরি!"

যাহোক্, এরপর এক অলিখিত মাসিকপত্রের সম্পাদক মশাই যেন কেমন করে সংবাদটি সংগ্রহ করেন ও তিনিই সর্বপ্রথম সকলকে পরিবেশন করেন।

কাজেই চন্দ্রবিন্দুর বিরুদ্ধে যার যত মন্তব্য, সব জন্মের মত চাপা পড়ে গেল। চন্দ্রবিন্দু অক্ষরই নয়, এমন একটা তুচ্ছতাচ্ছিল্যের ভাব আর কোথাও শোনা গেঁল না বরং অলিতে-গলিতে চন্দ্রবিন্দুর প্রশস্তি-সংগীত মুখর হয়ে উঠল।—

"চন্দ্রবিন্দু, করি তোমার পায়ে নমস্কার,
তুমি ইচ্ছে হলেই ভাঙতে পারো সবার অহংকার!
নাক-খিঁচুনো তোমার বুলি,
আদর করে পেত্নীগুলি,
ঘরে ঘরে শঙ্কা তুমি, ভীতির পারাবার,
চন্দ্রবিন্দু, করি তোমার পায়ে নমস্কার!"

—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

হ্যাঁ, শহরটা বদলেছে বইকি !

পঁচিশ বছর আগে ক্ষীরসাকে শহর বলত শুধু ক্ষীরসার লোকেই, বাইরের লোকে মুচকি হাসত সে-কথা শুনে। আজ কিন্তু আর ক্ষীরসাকে তেমন করে হেসে উড়িয়ে দেবার জো নেই। আশেপাশে কলকারখানা গজিয়ে উঠেছে ; রেলগাড়ি না এলেও বাস-লরী-রিক্শার দৌলতে চলাচল হয়েছে সোজা ; বাজার দোকান ইস্কুল ডাকঘর আগেও ছিল নামকে ওয়াস্তে, এখন কিন্তু তাদের জমজমাট অবস্থা। বাড়তির ভাগ পত্তন হয়েছে একটি সিনেমার ; স্কুলের পড়ুয়ারা যাতে টিফিনের ছুটিতেই বিকেল

পাঁচটার টিকিট কিনে রাখতে পারে, তারই জন্য সিনেমার বাড়িটা তৈরী হয়েছে ঠিক ইস্কুলের গায়েই।

রাজমোহন বাস থেকে নেমেই সেকালের সেই জয়ন্তী হোটেলের খোঁজে বেরুলেন। পঁচিশ বছর আগের সেই জয়ন্তী হোটেল। এখনো সেটা আছে কি না সন্দেহ; তবে থাকে যদি, সেখানে ওঠাই ভাল। সেবারে মাসখানিক কাটিয়ে যাওয়া গিয়েছিল ঐ হোটেলে। পায়দলে ভারতের এমাথা-ওমাথা পাড়ি দেবার মতলবে বেরিয়ে পড়েছিলেন দুই বন্ধু—রাজমোহন আর হরকুমার। চলেও এসেছিলেন অনেকটা দূর; শেষকালে এই ক্ষীরসার জয়ন্তী হোটেলে এসে হরকুমার পড়লেন কঠিন অসুখে; ভবঘুরেপনায় ইতি পড়ল দু'জনারই।

হ্যাঁ, গরিবানা হোটেল বটে, কিন্তু মালিক ভদ্রলোকটি যত্ন করেছিলেন ওঁদের। আদ্ধেক দিন ডাক্তারের বাড়ি হাঁটাহাঁটি তিনিই করতেন। অসুখ যখন বাড়াবাড়ি, রাজমোহনের সঙ্গে পালা করে রাত জেগেছেন তিনি। সে সব কথা এতদিন অবশ্য মনে ছিল না রাজমোহনের, কিন্তু ক্ষীরসায় ফিরে আসার পর একটি একটি করে ঠিক মনে পড়ে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই রাজমোহনকে ঐ জয়ন্তী হোটেলেই উঠতে হবে। কৃতজ্ঞতা বলে একটা জিনিস নেই? বন্ধুটিকে যে এই তরাই জঙ্গল থেকে জ্যান্ত ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল, তার মূলে ঐ ভুলে-যাওয়া হোটেল-মালিকের সেবা ছিল অনেকখানি।

ঐ বাড়িটা—ঐটাই সেই জয়ন্তী হোটেল নয়? সেকালে হোটেলবাড়িটা একতলা ছিল, বেশ মনে পড়ে রাজমোহনের। এটা কিন্তু দোতলা বাড়ি। সাইন-বোর্ডও দেখা যায় না তো! অবশ্য, টেক্সো দেবার ভয়ে আজকাল অনেক ব্যবসায়ীই সাইনবোর্ডের ঝামেলা মিটিয়ে দিয়েছে, জয়ন্তীর মালিকও সেই পথের পথিক হবেন, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। নিশ্চয়ই হোটেল আছে এ-বাড়িতে। উপরতলার বারান্দায় শাড়ি ঝুলছে; তার অর্থ হোটেলওয়ালা দোতলায় নিজে বাস করেন সপরিবারে। আগেও তিনি তাই করতেন, একতলা বাড়িটারই আদ্ধেক অংশে নিজে থাকতেন ছেলেপুলে নিয়ে; বাকী আদ্ধেকে থাকত ভাড়াটেরা। উন্নতি হয়েছে

তুমি কি সত্যিই আমার বাচ্চুকে যেতে চাও? [পৃঃ ৮২
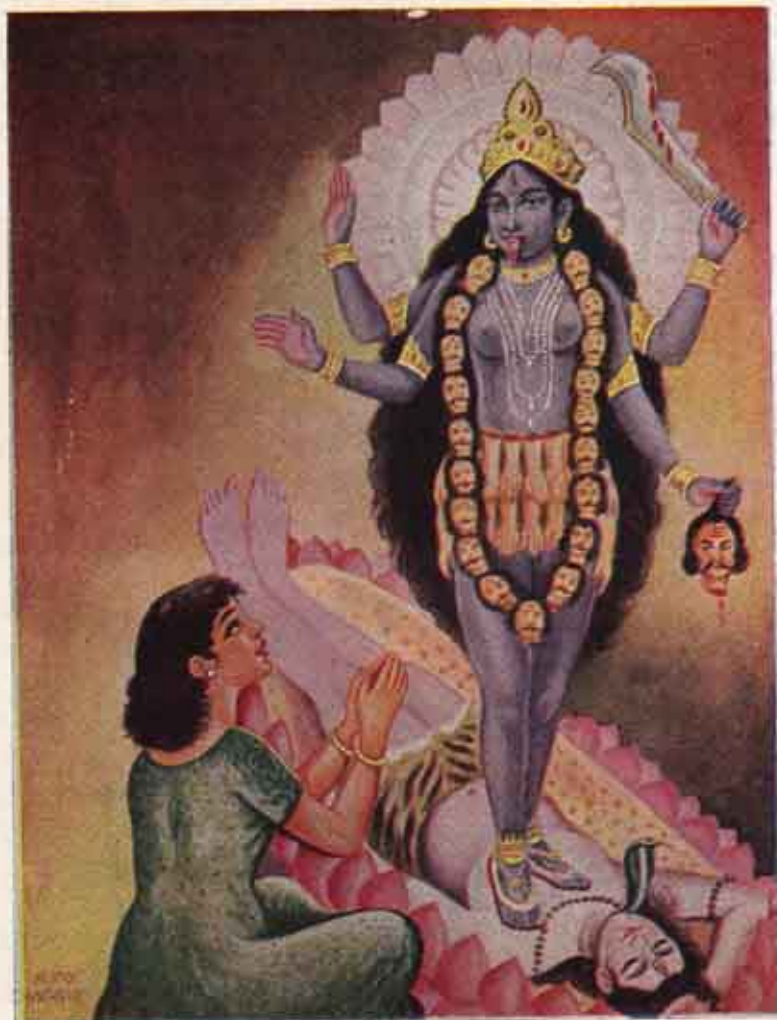
ভদ্রলোকের তাহলে। গোটা নীচের তলাটা ব্যবসার জন্য ছেড়ে দিয়ে নিজে উপরপানে পাখা মেলেছেন। ভাল, ভাল! ভাল লোকের উন্নতি হয়, সে ভাল কথা। দেখেও সুখ, শুনেও সুখ।

রাজমোহন যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, ঠিক তার পিছনেই একখানা আধা-মুদিখানা, আধা-মনিহারী মাঝারি গোছের দোকান। এটা সে-আমলে ছিল না, এখানটা ছিল এন্তার ফাঁকা, সকালবেলা এখানে তরকারির বাজার বসত, বিকালে বসত রাজ্যের ছাড়া-গরুর বিশাল বৈঠক। গরুরা তাদের সাবেকী দখল একেবারে ছাড়ে নি এখনো; ঐ যে সূর্য ভাল করে পশ্চিমে ঢলবার আগেই গোটা তিনেক গাই এসে শুয়ে পড়েছে দোকানঘরের এধারে ওধারে, আর জাবর কাটতে শুরু করেছে মনের আনন্দে।

রাজমোহন শুনতে পেলেন—ঐ গরু কয়টাকে নিয়েই কথা হচ্ছে দোকানঘরের ভিতর। বিরক্তভাবে রাজমোহনেরই বয়সী একটি ভদ্রলোক বলছেন—"দেখছিস মধু, গরুগুলো চরে এল, অথচ কোনো ব্যাটার দেখা নেই। জল দিতে হবে, জাবনা দিতে হবে, একটুখানি দলাই-মলাই করাও দরকার, তা নইলে গরু কি দুধ দেবে অমনি-অমনি? তা কে কার কড়ি ধারে বল্! কানাইবাবু লম্বা হয়ে ঘুমোচ্ছেন গোয়ালঘরে। যা বাবা যা, ডেকে আন বদমাইশটাকে, কুড়ের বাদশাটা মরেও যে আমায় রেহাই দেবে, এমনও আশা-ভরসা নেই।"

কেনো? সেই কেনো নাকি? কানাই? সেই ফুটফুটে ছেলেটি যে লোভে পড়ে রাজমোহনের একখানা দশটাকার নোট চুরি করেছিল? সেই ছোকরা চাকরটি জয়ন্তী হোটেলের? সে এখন গোয়ালঘরের চাকর হয়েছে নাকি? তাহলে শেষ পর্যন্ত তাকে ছেঁটে ফেলতে পারেন নি মুরারিবাবু?

কেনোর কথা ভাবতে ভাবতে দোকানঘরের ভদ্রলোকটির পানে তাকিয়েছেন রাজমোহন; চেনা-চেনা মনে হয় যেন! "মুরারিবাবু না?"—সাহস করে প্রশ্ন করে বসেন—"অ্যাঁ, তাইত, মুরারিবাবুই তো! কেমন আছেন মশাই? চিনতে পারছেন না?"—আবেগের মুখে অনেকগুলো কথাই বলে ফেলেন রাজমোহন।

চন্দ্রচূড়

মুরারিবাবু ভ্রূ কুঁচকে রাজমোহনের দিকে একনজরে তাকিয়ে রইলেন প্রায় দু' মিনিট; তার পরই এক লাফে এসে পড়লেন রাজমোহনের উপরে। সে-লাফ যেন রয়েল বেঙ্গল টাইগারেরই লাফ। "আরে, আপনি? কোত্থেকে এসে পড়লেন এতকাল পরে, ও রাজমোহনবাবু? দেখুন দেখি কাণ্ড! এক মাস কাল একসাথে ওঠা, একসাথে বসা, আর আজ একেবারে চিনতেই পারি নে!"

···এক লাফে এসে পড়লেন রাজমোহনের উপরে।

"তা হলও তো পঁচিশ বছর!"—রাজমোহন জবাব দিলেন মুচকি হেসে—"তা আপনি এ দোকানে? হোটেলটি আছে তো?"

"নেই আবার! ঐ তো আপনার সমুখে!"—আঙ্গুল দিয়ে সেই দোতলা বাড়িটাই দেখিয়ে দিলেন মুরারিবাবু—"ছিল এক-তলা, হয়েছে দোতলা। স্থায়ী বোর্ডারই অনেকগুলি। তা আপনাকে পারব একটা ঘর দিতে। বলেন যদি, আপনি যে ঘরে আগে ছিলেন খালি আছে সে ঘরটাও তা একা এলেন, আপনার সেই বন্ধুটি—হরকুমারবাবু—"

মধু এল ছুটতে ছুটতে—"কেনো বলছে উঠতে পারবে না এখন, জ্বর হয়েছে তার।"

● শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

"জ্বর না হাতি!"—রেগে উঠলেন মুরারি—"যাচ্ছি আমি, এক লাথি খেলেই জ্বর এক্ষুণি ছুটে যাবে।" তারপর রাজমোহনের হাত ধরে বললেন—"মালপত্র নেই নাকি সঙ্গে?"

"না, ভাই, মালপত্র নেই। সরকারী সার্ভেতে কাজ করি; ক্যাম্প পড়েছে রিয়ং পাহাড়ে। ভাবলাম—এত কাছে যখন এসে পড়েছি, মুরারিবাবুকে একবার দেখে আসি। সত্যি বলছি, এই পঁচিশ বছরের ভিতর আপনার কথা ভুলতে পারি নি একদিনের জন্যেও। তা, এই একটা রাত মাত্র থাকব, মালপত্র আর আনি নি।"

"সে হবে'খন!"—রাজমোহনকে টানতে টানতে হোটেলের দিকে নিয়ে যেতে যেতে মুরারি বললেন—"এক রাত বললেই কি আর এক রাত! কালকের দিনটা আপনাকে কোনমতেই ছাড়ছি নে। কাল হাটবার আছে, মাছটাছ কিনব—মনে আছে তো এখানকার সেই মোটা মোটা মাগুর? দেশের কপাল নানান ভাবে পুড়ে গিয়েছে রাজমোহনবাবু, তা অস্বীকার করি নে, কিন্তু মাগুর মাছ এখনো অমিল হয় নি ক্ষীরসায়, কাল আপনাকে হাতেকলমে দেখিয়ে দেব।"

মাগুর মাছের লোভেও বটে, আর মুরারিবাবুর আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়েও বটে, পরের দিনটা ক্ষীরসাতে থেকে যাওয়াই স্থির করলেন রাজমোহন। হোটেলের খদ্দের হিসেবে নয়, মুরারির বন্ধু হিসেবেই তাঁকে থাকতে হল। পঁচিশ বছর বাদে রাজমোহন প্রাণের টানে বেড়াতে এসেছেন একদিনের জন্য, তাঁর কাছে পয়সা নেবেন মুরারি! কদাচ নয়। তিনি দুকানে আঙুল দিয়ে জিভ কামড়ে বললেন—"অমন কথাটি উচ্চারণ করবেন না রাজমোহনবাবু, একটা দিন বন্ধুকে ডাল ভাত খাওয়াতে পারব না, এমন দৈন্যদশা ভগবান আমায় দেন নি।"

বিকেলবেলার জলযোগ উপরে বসেই হল। রাত্রে শোবার বন্দোবস্তও উপরেই হচ্ছে দেখে রাজমোহন আপত্তি করলেন। মুরারির সঙ্গে ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব সেই পঁচিশ বছর আগে যতখানিই হয়ে থাকুক, পারিবারিক বন্ধু তো তিনি নন! কাজেই দোতলায়, যেখানে পরিবার নিয়ে বাস করেন মুরারি, সেখানে রাত্রিযাপন করা উচিত হবে না তাঁর। বিশেষ, নীচে যখন ঘর খালি রয়েছেই।

চন্দ্রচূড়

"সেই পুরোনো ঘরেই আমায় থাকতে দিন না!"—হাসতে হাসতে বললেন রাজমোহন—"পুরোনো দিনের স্মৃতিটা ঝালিয়ে নিয়ে যাই! হরকুমার থাকত ছয় নম্বরে, আমি থাকতাম সাত নম্বরে! রাত্রে শুয়ে মাঝের খোলা দরজা দিয়েই দেখতে পেতাম আপনি হরকুমারের মাথায় আইসব্যাগ চেপে আছেন। ওঃ, সে কথা কি ভোলবার!"

"হয়েছে, হয়েছে, নিন! চলুন সাত নম্বর কামরা কী দশায় আছে দেখি গিয়ে।" —সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মুরারি নিশ্বাস ছেড়ে বললেন—"হরকুমারবাবুর সঙ্গে আর দেখা হবে না বোধ হচ্ছে; দিল্লীতে বড় পোস্টে রয়েছেন। বাংলাদেশে মাঝে মাঝে আসেন হয়ত, কিন্তু তরাই জঙ্গলে ক্ষীরসার জয়ন্তী হোটেলে তাঁর পদার্পণের আশা আর করি নে! তবে আপনি আসবেন দাদা! ভোলেন নি যখন, তখন আসবেন মাঝে মাঝে। আপনাদের সত্যিই ভালবেসেছিলাম।"

ভদ্রলোকের এ উচ্ছ্বাসের উপযুক্ত জবাব খুঁজে না পেয়ে রাজমোহন বেশ একটু বিব্রতই বোধ করছিলেন, হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন নীচের তলার পিছন দিকে সাত নম্বর ঘরে পৌঁছে। অবাক হয়ে রাজমোহন দেখলেন পঁচিশ বছরে ঘরখানার কিছুই বদলায় নি। যেখানে তক্তপোশ ছিল, সেইখানেই রয়েছে। সেই এক-পায়া-ভাঙা টেবিল, সেই রংচটা চেয়ার, সেই নড়বড়ে আলনা। এমন কি—

দেয়ালে গর্তগুলো পর্যন্ত রয়েছে!

হেসে ফেললেন রাজমোহন,—"পঁচিশ বছরে অন্ততঃ দশ বারো বারও তো কলি ফেরাতে হয়েছে ঘরটায় কিন্তু গর্তগুলো ঠিক যেমনকার তেমনি রয়ে গেল! মিস্ত্রীরা গর্তের উপরই চুন লাগিয়েছে?"

মুখ বিকৃত করে মুরারি বললেন—"বাপের আমলের ভুল শোধরাব কি করে বলুন! গোড়ায় কাদার গাঁথনি দেওয়া হয়েছিল ঘরগুলোতে। মাটির ছোঁয়াচ পেলে ইঁদুরে ছেড়ে কথা কয়! যতবারই বালি লাগাচ্ছি, ঠিক ততবারই গর্ত বেরুচ্ছে। ইঁদুরের একটা কলোনি আছে ঐ দেওয়ালের ভিতর।"

কথা বলতে বলতে একটা একটা করে জানালা খুলে দিচ্ছিলেন মুরারি। বাড়ির পিছনদিকে হলেও ঘরখানাতে আলো-বাতাস খুব। দক্ষিণদিকে একটা মাঝারি

● শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

গোছের সবজি বাগান, তার পরে একফালি উঠোন, তারও পরে টালি দিয়ে ছাওয়া গোয়ালঘর। তিনটে গাই সেই উঠোনে বাঁধা রয়েছে, সমুখে এক এক চাড়ি জাবনা। রাজমোহন চিনলেন—দোকানের সমুখে এই গরু তিনটিকেই তিনি তখন জাবর কাটতে দেখেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে পড়ে গেল সেই কেনোর কথা। ছেলেটা রাজমোহনের খুব অনুগতই হয়েছিল সেদিন। এক মাস ধরে কম ফাই-ফরমাশ খেটে-ছিল সে! ঠিক যে বকশিশের লোভেই খাটত তা নয়। রাজমোহনেরা তখন ভবঘুরে, দরাজ হাতে বকশিশ দেবার ক্ষমতা তাঁদের কোথায়! বেচারী পেত শুধু মিষ্টি কথা, আর তারই বিনিময়ে বেগার খাটত ভূতের মত। নামে হোটেলের চাকর হলেও সে ছিল যেন রাজমোহনদেরই নিজস্ব চাকর।

ছেলেটার কথা মুরারিকে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছেন রাজমোহন, এমনি সময় গোয়ালঘরের দিকে তাকিয়ে "কেনো" বলে জোরে হাঁক দিয়ে উঠলেন মুরারি; সঙ্গে সঙ্গেই গোয়ালের ভিতর থেকে জবাব এল—"যা—ই।"

মুরারি তখন রাজমোহনের দিকে তাকিয়ে বললেন—"এই কোন্ কেনো, বুঝতে পারেন নি নিশ্চয়ই। সেই যে কানাই ছেলেটা! আপনারা সেবার এখান থেকে চলে যাওয়ার আগের রাত্রে যে আপনার দশটা টাকা চুরি করেছিল—"

"তাকে তো আপনি হোটেল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন মনে পড়ে!" উত্তর দিলেন রাজমোহন।

"তাড়াতে আর পারা গেল কই! ত্রিসংসারে কেউ ছিল না তো! কয়েকদিন না খেয়ে না খেয়ে মরার দাখিল হল যখন, শহরের পাঁচটা লোক এসে আমাকেই ধরল আবার—ছেলেটা মরে যায়। এবারকার মত মাফ করে দাও ওকে। করি কি বলুন, নিতে হল আবার। তবে হোটেলে আর ঢুকতে দিই নি। বোর্ডারদের টাকা ক্রমাগত চুরি হতে থাকলে হোটেলেরই বদনাম হয়ে যাবে; তাই ওকে গোয়ালঘরের কাজে বহাল করে দিয়েছিলাম। সেই কাজই করছে সেই থেকে।"

পঁচিশ বছর গোয়ালের কাজ করছে! কেমন যেন গা শিরশির করে উঠল রাজমোহনের। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন—"আমার যেন মনে পড়ে

ছেলেটা সকাল সন্ধ্যে এখানে কাজ করত, আর দুপুরবেলা পড়তে যেত ইস্কুলে। ছেলেটা পড়াশুনায় ভাল ছিল, শুনেছিলাম যেন!"

"আর পড়াশুনা!" তালুতে জিভেতে মিলিয়ে মুরারি চুকচুক শব্দ করলেন খানিকটা, তারপর বললেন—"গরিবের ছেলে বলে বিনে পয়সায় ইস্কুলে পড়তে পেত; কিন্তু চোরকে তো আর কেউ ফ্রী পড়াবে না! ও-দফায় ইতি হয়ে গেল। কী কুক্ষণে যে আপনার নোটখানা দেখে লোভে পড়ল ছেলেটা!"

চুরি করেছিল ছেলেটা। ঠিকই চুরি করেছিল। সে না করলে কে আর করতে যাবে! চোরের সাজা হয়েছে, ঠিকই তো হয়েছে! তবু মনটা টনটন করে ওঠে রাজমোহনের। কী সুন্দর চেহারা ছিল কানাইয়ের! গরিব হলেও ভালঘরের ছেলে, বুদ্ধি ছিল কতো! পড়াটা চালিয়ে যেতে পারলে মানুষ হত না এমন কথা কে বলবে? জীবনটা মাটি হয়ে গেল, একটা চুরির জন্যে! ছেলেমানুষের বুদ্ধির ভুলে! এক মুহূর্তের দুর্বলতায়! স্বভাবতঃ সে তো চোর ছিল না! চুরির আগে এক মাস তো তাকে দেখেছিলেন রাজমোহন! ছিঁচকে স্বভাব তো ছিল না তার!

মুরারির কথায় মনোযোগ ছিল না, নিজের চিন্তাতেই ডুবে গিয়েছিলেন রাজ-মোহন, হঠাৎ যেন চাবুক খেয়ে চমকে উঠলেন তিনি। একটা মূর্তি বেরিয়ে আসছে গোয়াল থেকে। মাথায় একটা গোবরভরতি বড় ঝুড়ি, তা থেকে পাতলা গোবর উপচে গড়িয়ে পড়ছে তার সারা গা বেয়ে। তেলচিটে কালো ন্যাকড়া তার পরনে, একমুখ ছাইরঙা ছাগলদাড়ি তার মুখে। আর সবচেয়ে বীভৎস ব্যাপার—হাঁটতে গিয়ে দারুণ খোঁড়াচ্ছে, একখানা পা বোধহয় ওর ভেঙে গিয়েছে।

"ঐ কানাই?"—একটা আর্তনাদের মত শোনাল রাজমোহনের গলার স্বর।

"ধরেছেন ঠিক। বরাত বলি একে! পাখানাও গেল। ঐ যে কালো গাইটা, নতুন যখন কিনলাম বড় বদরাগী ছিল, এমন লাথি মারল কেনোকে, পাখানা ভেঙেই গেল। হাসপাতাল তো নেই! টোটকা ওষুধে হাড় জোড়া লাগল বটে, কিন্তু সোজা-ভাবে জুড়ল না।"

গোবরের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে কানাই উঠোনের ওপাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে

● শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

গেল। পিছনের একটা পড়ো জমিতে গোবর পচিয়ে সার তৈরি করেন মুরারিবাবু; চড়া দামে বিক্রি হয় সেই সার। সে-আমল থেকেই এ-ব্যবসা আছে ভদ্রলোকের, একটু একটু করে মনে পড়ে রাজমোহনের। বেশ গোছালো মানুষটি এই মুরারি; হোটেল, দোকান, বাগান, গোয়াল—সব নিয়ে বেশ জমাট হয়ে বসেছেন। বেশ লোকটি! ভদ্রতা আছে, দয়া-ধর্ম আছে, তা নইলে এই চোরটাকে তিনি খেতে দেবেন কেন?

*　　*　　*

রাত্রে খাওয়া হল বেদম। মাগুর মাছ কাল সকালে হাটে না মিললে পাওয়া যাবে না অবশ্য, কিন্তু অন্য দিক দিয়ে আয়োজনের ত্রুটি করেন নি মুরারিবাবু। মাংস যোগাড় করে ফেলেছেন, যদিও মাংসের দোকান নেই ক্ষীরসায়। আর গব্য যত রকম হতে পারে। সর-বাটা ঘি দিয়ে খাওয়া শুরু, ক্ষীর দিয়ে শেষ। "গাই তিনটে প্রায় পনেরো সের দুধ দেয় রাজমোহনবাবু!"—সগর্বে ঘোষণা করেন মুরারি—"খোঁড়াটা কুড়ে বটে, কিন্তু যত্ন করে গরুগুলোর। আর জানেন তো, গরুর দুধ হচ্ছে তার মুখে।"

মাথায় একটা গোবরভরতি বড় ঝুড়ি···[পৃঃ ৩৮

কী জানি, কানাইয়ের কথা উঠে পড়তেই ক্ষীরের স্বাদ তেতো হয়ে গেল রাজমোহনের মুখে। কানাইয়ের মাথার ঝুড়ি থেকে পচা গোবর গা বেয়ে শতধারে
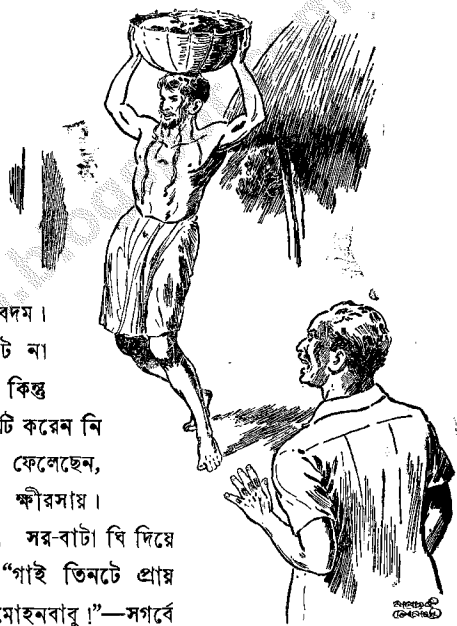
গড়িয়ে পড়ছে, দৃশ্যটা চোখের উপর ভেসে উঠে গা গুলিয়ে তুলল রাজমোহনের। অবশ্য খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু অতখানি তোয়াজের খাওয়া থেকে যে রকম তৃপ্তি নিয়ে ওঠার কথা ছিল, তা আর হল না বেচারীর বরাতে।

রাত্রে সাত নম্বর ঘরে তাঁরই পুরোনো খাটিয়াতে শুয়ে শুয়ে সেই অতৃপ্তিরই জের টানতে থাকলেন রাজমোহন। তিনটে তোশকের উপর ধবধবে সাদা চাদর পেতে নতুন মশারি খাটিয়ে দিয়েছেন মুরারি, কিন্তু বিছানা যেন কাঁকর হয়ে ফুটতে লাগল রাজমোহনের গায়ে। কোথায় যেন একটা দারুণ অন্যায় হয়ে গিয়েছে। সে-অন্যায়ের দায়িত্ব খানিক রাজমোহনের, খানিক মুরারির, খানিকটা-বা সমাজ-ব্যবস্থার। একটা মাত্র চুরি—দশবছরের ছেলের পক্ষে—সমুখে টাকা দেখে লোভটা সামলাতে পারে নি—কী এমন গুরুতর অপরাধ যে তার জন্য একটা বুদ্ধিমান ছেলের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিতে হবে!

মাথাটা গরম হয়ে উঠল রাজমোহনের। মশারি তুলে রেখে বিছানার উপর বসলেন। চারদিকে ইঁদুর দৌড়চ্ছে অন্ধকারে, যেমন সেকালে দৌড়ত। পাছে ঝুপ করে তাঁর মাথায় এসে পড়ে, এই ভয়ে রাজমোহন একটা মোমবাতি জ্বেলে টেবিলের উপর বসিয়ে দিলেন। বসাতে গিয়েই মনে পড়ল এই টেবিলের ঠিক এই কোণেতেই তাঁর দশটাকার নোটখানা ছিল। পঁচিশ বছর আগেকার সেই সন্ধ্যেবেলায়। মুরারির হোটেলের হিসাব মিটিয়ে দেবার জন্য একশোটাকার নোট বার করেছিলেন বাক্সো থেকে। নিজে আর হরকুমার—দুজনের হোটেল খরচা ঘরভাড়া দুধের দাম সব শোধ করে দশ টাকা কয়েক আনা ফেরত পাওয়া গিয়েছিল। ছিল ঐ টেবিলের ঐ কোণেতেই। মুরারির সঙ্গে কথা বলতে বলতে তিনি বাইরে গিয়েছিলেন। পরদিন সকালেই চলে যাবেন ক্ষীরসা থেকে, ধন্যবাদ জানাচ্ছিলেন মুরারির ভদ্রতার জন্য। বারান্দায় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কথা হয়েছিল। ফিরে এসে দেখেন নোট নেই টেবিলে। পয়সা কয় আনা পড়ে আছে, নোট নেই।

ওঘরে হরকুমার শুয়ে ছিলেন। মাঝের খোলা দরোজা দিয়ে তিনি দেখে-ছিলেন কানাইকে এঘরে ঘুরতে। কানাইও অস্বীকার করল না যে সে ঘরে ঢুকেছিল।

● শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

কিন্তু চুরি সে অস্বীকার করল। তার সুন্দর মুখখানি থমথমে হয়ে উঠল ধমক খেয়ে। চোখ ছলছল করে উঠল। কিন্তু চুরি সে স্বীকার করল না। "বাবু ঘরে নেই দেখে আমি বেরিয়ে রান্নাবাড়িতে চলে গিয়েছিলাম। নোট আমি দেখি নি। দেখলেও নিতাম না। আমি কি চোর? ছিঃ!"

তার সে-কথায় কেউ বিশ্বাস করল না। রাজমোহন দুঃখিত হলেন ছেলেটার অধঃপতন দেখে। ওর উপর বেশ একটু মায়া পড়ে গিয়েছিল তাঁর এই এক মাসে। খুব কথার বাধ্য ছিল। দুই এক পয়সা পেলে খুশী হত, বলত—"এ দিয়ে পেনসিল কিনব।" ইস্কুলের পড়া বুঝিয়ে নিত রাজমোহনের কাছে, অনেক রাত্রে, হোটেলের খাওয়াদাওয়া মিটলে পর। মুরারি হয়ত তখন হরকুমারের মাথায় আইসব্যাগ চেপে ধরে বসে আছেন, বিরক্ত হয়ে বলে উঠতেন—"এত রাতে ওকে পড়াতে বসলেন রাজমোহনবাবু? ঘুমোন, ঘুমোন! আপনি যাতে এক দিন বাদে ঘুমোতে পারেন তারই জন্য তো আমার রোগীর কাছে বসা! তা আপনি যদি না-ই ঘুমোন, তাহলে এক দিন আমার এ ঝামেলা কেন?" লজ্জা পেয়ে পালিয়ে যেত কানাই।

সেই কানাই চোর বলে ধরা পড়ল। মুরারি রেগে আগুন। গোটাকতক চড় চাপড় কষিয়ে দিলেন ছেলেটাকে। হাউহাউ করে সে কাঁদল, কিন্তু চুরি স্বীকার করল না। মুরারি সেই রাত্রে তাকে হোটেল থেকে বার করে দিলেন, বললেন—"নেহাত বাচ্চা তুই, থানায় আর দেব না, কিন্তু এখানে আর ঢুকতে পাবি নে তুই। চোর পুষে আমি হোটেলের বদনাম করতে পারি নে।"

রাত্রেই কানাই বেরিয়ে গেল কাঁদতে কাঁদতে। সকালেই রাজমোহন বেরিয়ে পড়লেন বন্ধুকে নিয়ে নিজের দেশের দিকে। পঁচিশ বছর পরে সেই কানাইকে আজ দেখলেন—গায়ে মাথায় শতধারে পচা গোবর বেয়ে পড়ছে, এক পা খোঁড়া, নোংরা, বীভৎস, মানুষ না জন্তু, বোঝাই ভার। উঃ, লঘুপাপে গুরুদণ্ড!

উঃ! কী দস্যি ইঁদুর রে বাবা! দলে দলে রেস দিচ্ছে ধেড়ে ধেড়ে ইঁদুর।

চন্দ্রচূড়

দেয়ালের গর্ত থেকে ফুড়ুৎ করে লাফিয়ে পড়ছে মেজেতে, ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ছে টেবিলের উপর, মশারির চালে। ঘরে আলো রয়েছে, তা বলে ভয়ের লেশমাত্র নেই।

…একখানা নোট দিলেন রাজমোহন।

মেজের খুব কাছেই একটা গর্ত, তার মুখ থেকে ঝুরঝুর করে মাটি ফেলছে সুড়ঙ্গবাসী ইঁদুর। দেখে হেসে ফেললেন রাজমোহন।

কিন্তু—

মাটির সঙ্গে ওটা কী?

কাগজ একখানা।

* * * *

পরের দিন ভোরবেলা মুরারিবাবু রাজমোহনের চেহারা দেখে আকাশ থেকে পড়লেন। দু'চোখ লাল টকটক করছে ভদ্রলোকের, সে-চোখে যেন পাগলের চাউনি!

মুরারিবাবুর হাতে একখানা নোট দিলেন রাজমোহন। নোংরা, মাটিমাখা, মাঝে মাঝে ফুটো। কিন্তু তবু বুঝতে কষ্ট হয় না, সেকেলে রাজার-মাথা-ওয়ালা একখানা দশটাকার নোট।

"কী এ?"—জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে কী জানি কেন গলা কেঁপে যায় মুরারির।

"সেই নোট! পঁচিশ বছর আগে হারানো আমার সেই নোট। কানাই চুরি করে নি, ইঁদুরে নিয়েছিল।"

খোলা জানালা দিয়ে গোয়ালঘরের উঠোন দেখা যাচ্ছে। খোঁড়া কানাই

● শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

অদ্ভুতভাবে এক পাশে হেলে দাঁড়িয়ে আছে আকাশের পানে তাকিয়ে। ভোর হয়েছে, কিন্তু অকালের মেঘে পুব আকাশ এমন ঢেকে আছে যে সূর্যের আলোর একটা রশ্মিও তার চোখে পড়ে না।

কানাই তাকিয়ে তাকিয়ে এককণা আলো দেখতে পায় না আকাশে; আর ঘরের ভিতর থেকে তার পানে তাকিয়ে তাকিয়ে রাজমোহন আর মুরারি ভেবে পান না—ভুল করে হোক আর যে করেই হোক একটা মানুষের গোটা জীবনটা ধ্বংস করে দিলে সে-মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কোন্ পথে করা যায়।

নান্যঃ পন্থা
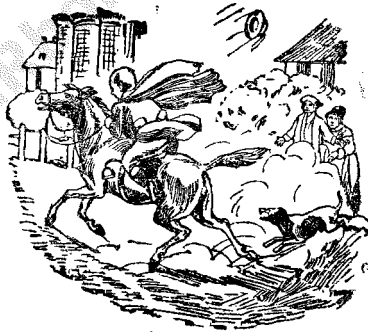
—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

মেজেতে ছেঁড়া মাদুরের উপর ছেঁড়া তোয়ালেখানা যত্ন করে পাতল ললিতা। পেতেই মুখটা তার কালো হয়ে উঠল। ছেঁড়া শুধু নয়, তোয়ালেটা ময়লাও হয়েছে। কাল সাবান সোডা দিয়ে শাড়িটা জামাটা সাফ করবার সময় এ জিনিসটার কথা তার মনে হয় নি। এখন উপায়? এ নোংরা তোয়ালে নিয়ে খদ্দের বাড়ি যাওয়া চলে না। তারা সবাই শৌখিন লোক; উপরের আবরণ দেখেই যদি মনটা খিঁচড়ে যায়, ভিতরের রঙীন কাপড়চোপড় দেখতেই চাইবে না হয়ত।

একটু ভেবে তোয়ালেটা দড়ির আলনায় তুলে রাখল ললিতা। থাকুক আজ। কাল ওকে কেচে নিলে তবে আবার কাজে লাগানো যাবে। আজকের মত নিজের শাড়িতেই জড়িয়ে নেওয়া যাক ইজের আর ফ্রকগুলো। অসুবিধে খুবই, কিন্তু উপায় কী? অসুবিধে কিসে নয়? পোনেরো বছরের মেয়েকে যদি বাড়ি বাড়ি ঘুরে নিজের-হাতের-সেলাই ইজের ফ্রক ফিরি করতে হয়, পদে পদে তো অসুবিধেই হবে! ললিতা

তাই অসুবিধেগুলোর কথা আর ভাবে না ; ভাবে এই কথা যে সারাদিন ঘুরে একটা টাকাও যদি সে মুনাফা করে আনতে পারে, এক কিলো চাল আর একটু একটু নুন তেল ঘরে আনতে পারা যাবে সন্ধ্যে নাগাদ ; দিনান্তে হাঁড়ি চড়বে চারটি প্রাণীর জন্যে—মা, ছোট বোন অনিতা আর দাদা নিরাপদ, চারটি লোক এ-সংসারে।

দাদা নিরাপদ বসে আছে বারান্দার ফালিটাতে। দুই হাঁটুতে মাথা গুঁজে ঠায় বসে আছে সেই ভোরবেলা থেকে। ষাট বছরের বুড়ো মা ভাঙা চুপড়ি কাঁখে নিয়ে খাটালে খাটালে গোবর কুড়োতে বেরিয়ে গেছেন তার সামনে দিয়েই, সে তা দেখেছে এক পলকের জন্য মাথা তুলে ; দেখেই আবার মাথা নামিয়েছে। বারো বছরের বোন অনিতা ময়লা কাপড়ের উপর আরও ময়লা একটা গামছা জড়িয়ে গাছকোমর বেঁধে ওপাড়ার মল্লিকবাড়ি আর শীলবাড়িতে বাসন মাজতে বেরিয়ে গেছে—তাও দেখতে পেয়েছে নিরাপদ। মায়ের দেওয়া ঘুঁটে থেকে মাসে পাঁচটা ছয়টা টাকা আসে তাদের, আর অনিতার ঝিগিরির মাইনে আসে মাসে আট টাকা আর আট টাকায় যোল টাকা। এই থেকে তাদের ঘরভাড়া দিতে হয় চোদ্দ টাকা।

চারটি প্রাণীর খাওয়া নির্ভর করে ললিতার সেলাইয়ের উপরে। অতি বাজে কাপড়ে অতি মামুলী সেলাই ; বড় বড় বাড়িতে তার আদর হবার কোন কথাই নয়, তবু যা হোক করে ললিতা কাটিয়ে আসে তার মাল ; ভদ্রঘরের মেয়ে পেটের জ্বালায় ইজের ফ্রক হাতে করে বাড়ির ভিতর গিয়ে দাঁড়ায় যখন, বেশির ভাগ গিন্নীরাই কিছু-না-কিছু কিনে নেন। দরকার না থাকলেও, পছন্দ না হলেও।

নিরাপদ জানে এসব কথা। সে ভাবে। দরকার না থাকলেও ললিতার ফ্রক কিনবার লোক আছে, কিন্তু, দরকার না থাকলেও নিরাপদকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেবে, এমন লোক কোথাও নেই। আজ একটা বছর সে চেষ্টা করেছে। করেই চলেছে চেষ্টা। কেউ তাকে কাজে নেয় না। লেখাপড়া কিছু জানে, বাবা মরে না গেলে স্কুল ফাইনালটা সে হয়ত এবারই পাস করতে পারত।

নিজের বাবা যে-আফিসে কেরানীগিরি করে গিয়েছেন সারাজীবন, সেই আফিসেই বেয়ারার চাকরির উমেদারি করে সে জবাব পেয়েছে—"ভদ্রলোকের

ছেলেকে দিয়ে এ-কাজ হয় না বাপু! চপ কাটলেটের এঁটো থালা তুলে নিয়ে যেতে বললে তুমি পারবে কী? তোমার চট্ করে অপমান বোধ হবে!" নিরাপদ বলতে গিয়েছিল—"আজ্ঞা না হুজুর, অপমান বোধ হবে না; আমার ছোট বোন মল্লিক-বাড়িতে শীলবাড়িতে এঁটো থালাই মেজে থাকে রোজ; তাতে যখন আমার অপমান হয় নি—"

এই কথাই নিরাপদ বলতে গিয়েছিল, কিন্তু সত্যি সত্যি মুখ ফুটে এর একটা শব্দও সে উচ্চারণ করতে পারে নি। এই আফিসেরই চেয়ারে বসে তার বাবা সেদিন পর্যন্ত সম্মানের সঙ্গে কাজ করে গিয়েছেন, আজ সেই চেয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে অনিতার ঝিগিরি করার কথা কিছুতেই সে মুখ ফুটে বলতে পারল না।

নাঃ, চাকরি তার হবে না।

ব্যবসা?—তার জন্য গোড়ায় অন্ততঃ দশ বিশ টাকাও দরকার। কিন্তু সে টাকাও কোথায়?

দিন-মজুরির চেষ্টাও করেছে নিরাপদ। প্রথমে গিয়েছিল হাওড়া স্টেশনে। ভিতরে ঢুকে মাল মাথায় নেওয়ার হুকুম নেই, লাইসেন্স না থাকলে। যদি কিছু কাজ করতে হয়, সে বাইরে। অবিশ্যি বাইরেও ঢের কাজ মেলে হাওড়ায়। নিরাপদরও মিলেছিল। কিন্তু বাক্সটা তুলে মাথায় নেবার শক্তিই তার হল না। আকুল হয়ে সে ডাইনে-বাঁয়ে তাকাতে লাগল, যদি অন্য কোন মুটে ধরে তুলে দেয় বাক্সটা। একটা লোক এল বটে, কিন্তু সাহায্য না করে সে মালটাই কেড়ে নিল নিরাপদর কাছ থেকে। ও আপত্তি করতে গিয়েছিল, কিন্তু মালের মালিকই দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন তাকে—"ওই তো তালপাতার সেপাই তুমি! বাক্সটা শেষে রাস্তায় ফেলে দিয়ে গুঁড়ো করে দেবে বাপু! তোমায় আমি নেব না!"

অল্প-মেহনতের কাজ নিরাপদকে দিয়ে চলতে পারে। কিন্তু তা-ই বা কে দেবে? বিড়ির দোকানে কাজ চেয়েছিল একদিন নিরাপদ। এমন কুৎসিত ভাষায় কথা কয়ে উঠল বিড়িওয়ালা, কানে আঙ্গুল দিতে হল ছেলেটাকে। ভদ্রসন্তানের জ্বালা অনেক। রোজগারের প্রায় সব কয়টা পথই তার কাঁটা-দেওয়া।

চন্দ্রচূড়

কী করবে তবে নিরাপদ? ভিক্ষে? চুরি?

আজ কয়েকদিন থেকে এই চিন্তাই সে করছে। ভিক্ষেয় বেরুবে? না, চোরের দলে ভিড়বে? গা ঘিনঘিন করে ওঠে ভাবতে গেলেই। কিন্তু বোনেদের রোজগারেও তো নিশ্চিন্দি মনে বসে বসে খাওয়া যায় না! বোনেদের এবং বুড়ী মায়ের! খেতে সে বাধ্য হয়। পেটে আগুন যখন জ্বলে ওঠে, তখন আর বাছবিচার করা চলে না। খেতে বসে চোখ দিয়ে জল পড়ে তবু। মা এখন তার খাবার সময় সমুখে বসেন না। খেতে খেতে সে কাঁদে বলেই। তাঁকে দেখলে সে আরও বেশী কাঁদবে, দিনান্তে একমুঠি ভাতও তার পেটে যাবে না, এই ভয়েই তিনি আসেন না কাছে। ললিতাই থাকে সমুখে। সে শক্ত মেয়ে, চোখ ফেটে জল আসতে চাইলেও সে জানে সে-জল রুখতে; কান্নায়-বুজে-আসা গলায় অপূর্ব দরদ ফুটিয়ে শান্তভাবেই বলতে পারে—"আর একটু ডাল দিই, ও ক'টা ভাত খেয়ে ফেল দাদা!"

"ওই তো তালপাতার সেপাই তুমি!···[পৃঃ ৪৬

*　　*　　*　　*

শক্ত মেয়ে ললিতাকেও আজ চোখের জল ফেলতে হল। প্রায় সন্ধ্যেবেলায়

এসে ধপাস্ করে বসে পড়ল দাওয়ায়। দারুণ বেপড়তা গেছে দিনটা। দুটি মাত্র ইজের বিক্রি হয়েছে, এক টাকা। কাপড় আর সুতোর দাম বাদ দিলে ও থেকে লাভ দাঁড়ায় চার আনা। ব্যবসার নিয়ম মেনে চলতে হলে ঐ মাত্র চার আনাই খোরাকের জন্য খরচ করা চলে। তার বেশী খরচা করার মানে হল পুঁজি ভাঙা। কিন্তু তাই আজ ভাঙতে হবে। ডাল তেল চুলোয় যাক, দুটি চাল আর একখামচা নুন যদি আনতে হয়, চারটি প্রাণীর আধপেটার মতনও ঐ পয়সাতে কুলানো শক্ত।

অনিতাও তখন দিনের কাজ সেরে এসে পড়েছে। দুটো আনাজপাতি তার হাতে। মনিবেরা মাঝে মাঝে দেন অনিতাকে। আজ বেগুন পেয়েছে, কাঁচকলা পেয়েছে, আর পেয়েছে একটা শসা। শসাটা পেয়ে বড় উপকার হল। সন্ধ্যে হয়ে গেল, মা বিধবা মানুষ, তাঁর আর ভাত খাওয়া চলবে না আজ। "যা তো ভাই অনিতা, দুটি মুড়ি কিনে আন মায়ের জন্যে ; শসাটা কুচিয়ে দিলে মুড়ির সাথে মুখে লাগবে ভাল। ছাই ডাল ভাত রোজ রোজ গিলতেও ভাল লাগে না বুড়ো মানুষের, যা হোক, একটু মুখ বদলানো হোক।"

বাকী পয়সা নিয়ে নিজে দোকানে গেল ললিতা। আধ কিলো কাঁকর-মেশানো লাল চাল, একটু তেল আর দুপয়সার নুন। কাঁচকলা ভাতে দিয়ে ঐ গেলা যাক আজ তিন ভাইবোনে।

রান্না সেরে অনিতাকে বলল—"ছাখ তো দাদা কোথায় গেল! নুন-ভাত খাওয়া, গরম-গরম না খেলে আর গলা দিয়ে নামবে না।"

দাদা রোজ দাওয়াতেই থাকে এ সময়। ললিতা যখন এল দোকান থেকে, তখনও ছিল। কিন্তু এখন সে নেই। গেল কোথায়? "দাদা, দাদা"—গলিতে বেরিয়ে ডাকাডাকি শুরু করে অনিতা।

নাঃ, সাড়া নেই।

সাড়া মেলে না সারা রাত্রি। ফেরে না নিরাপদ। ভাত বেড়ে নিয়ে দুটি বোন অন্ধকারে চুপ করে বসে থাকে। মা মুড়ি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন, হা-হুতাশ করতে গেলেই তিনি জেগে উঠতে পারেন। জেগে উঠলেই তিনি হয়ত কান্না শুরু

● শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

করবেন নিরাপদর জন্য। না, মা যাতে জেগে উঠতে পারেন এমন কাজ করা চলবে না। আঁধারে চুপচাপ বসে থাকে ওরা বাড়া-ভাত কোলে করে ; খিদেতে পেট জ্বলে গেলেও এক গ্রাস ভাত মুখে তোলে না। দাদাকে বাদ দিয়ে ওরা কি খেতে পারে ?

নিরাপদ তখন বহুদূরে। শহরের একদম বাইরে। এ-রাস্তা ভারতের শেষ সীমায় গিয়ে ঠেকেছে নাকি। নিরাপদও যাবে সেই শেষ সীমা পর্যন্ত। দেখবে কাজ মেলে কি না। সে ভিক্ষে চায় না, চুরি করে খাওয়ার মতলব তার নেই, কাজ করেই সে খেতে চায়। মাথায় তার বিদ্যেবুদ্ধি বেশী নেই, তবু যেটুকু আছে তা দিয়ে কি পৃথিবীর কোন কাজই হতে পারে না ? গায়েও নেই তার মোষের মত জোর, তবু যেটুকু আছে, তা দিয়ে কি একমুঠো পেটের ভাতও সে জোটাতে পারবে না ?

রাত যখন নিশুতি, তখন বিজলী-আলোয় ঝলমল পীচঢালা বড় রাস্তাটা ধরে সে উত্তরমুখে চলেছে। বড় বড় কারখানা বাড়ি রাস্তার দুধারে ; উঁচু পাঁচিল, আর কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা। এই এত রাত্রেও শত শত আলো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে সেখানে বিনিদ্র দানবদের রক্তচক্ষুর মত। দুই একটা পানের দোকান ছাড়া আর কোন দোকানই খোলা নেই ; এরাও খোলা আছে শুধু এই কারণে যে প্রকাশ্যে দুই এক পয়সা পানের সঙ্গে সঙ্গে গোপনে তাদের অনবরতই বিক্রি হচ্ছে দশ বিশ টাকার অন্য মাল, যা বেচবার অনুমতিও ওদের নেই, যা অত রাত্রে বিক্রি করা যে কোন দোকানের পক্ষে আইনতঃ নিষেধও বটে। ঐসব পানের দোকানের সমুখের বেঞ্চিতেই আয়েস করছে ঢুলু ঢুলু-চক্ষু পাগড়ি-খোলা পুলিস ; নিরাপদ ভেবে পায় না আইনভঙ্গকারীর সঙ্গে আইনরক্ষাকারীর এমন শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান সম্ভব হল কোন্ জাদুমন্ত্রে ?

রাত যত গভীর হয়, এই আইনরক্ষকেরা পথচর নিরাপদর দিকে ততই সন্দেহের চোখে তাকায়। নীরব তাকানো ক্রমে সরব হয়ে উঠল। কোথায় যায় নিরাপদ, কেন যায়, কোথা থেকে এল, কেন এল—শতেক প্রশ্ন তাদের। নিরাপদ জবাব দেয় ধৈর্য ধরে ! যায় সে নিরুদ্দেশ পথে, যায় কাজের সন্ধানে, এল কলকাতা থেকে, এল সে কলকাতায় কাজ না পেয়ে। শান্তিরক্ষকেরা কেউই যে সে-কথায় তিলমাত্র বিশ্বাস করছে না, এ তার বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না। কেউ কেউ তো স্পষ্টই সতর্ক করে দিচ্ছে

তাকে—"হম্ ছোড় দেতা, লেকিন সবকোই ছোড়েগা নেই, হাজতমে ঘুষা দেগা আভি।"

হাজত? না না, ওটা বাঁচিয়ে চলতেই হবে। ভদ্রলোকের ছেলে, হাজতে ঢুকলে সে হয়ত দম আটকেই মরে যাবে; বদ্ধ বাতাস এতটুকুন ছোট্ট ঘরে, দাগী বদমাশদের নোংরা নিশ্বাসে পঙ্কিল, না না, ভগবান ঐটা থেকে যেন বাঁচিয়ে রাখেন নিরাপদকে।

পুলিসের মুখে হাজতের হুমকি শুনেই সে ছুটে পালায় সেখান থেকে। ছুটতে পারে না বেশী দূর। পা টলে, মাথা ঝিমঝিম করে। এইবার বুঝি আছাড় খেয়ে পড়ে যাবে বেচারী। পেটের ভিতর যেন আগুনের তীর ছুড়ছে কারা। যেখান দিয়ে তীর যায়, পুড়িয়ে দিয়ে যায় একেবারে। রামায়ণে অগ্নিবাণের কথা আছে। এ যেন সেই অগ্নিবাণ। তফাত শুধু এই—রামায়ণের অগ্নিবাণ যেখানে পড়ত সেখানটা ছাই করে ফেলত একেবারে। এ বাণ পোড়ায়, কিন্তু ছাই করে না। জ্বালিয়ে পুড়িয়েও থানেথান বজায় রেখে যায় আবার এক মিনিট পরেই নতুন করে জ্বলে ওঠবার জন্য। ওঃ, একেবারে ছাই হতে পারলে তো বাঁচত নিরাপদ। এ পেটের জ্বালার হাত থেকে চিরদিনের জন্য বাঁচত।

আর সয় না, আর সত্যিই পারে না নিরাপদ। দুই হাতে জোরে পেট চেপে ধরে বসে পড়ল রাস্তায়। চোখ বুজে বসে রইল দু-মিনিট। উঠবার যেন শক্তিই নেই। শুয়ে পড়তে পারলেই যেন সে বাঁচে। এটা তো রাস্তা, লরী চলে এখানে, মাঝে মাঝেই এক একখানা চলছে। চাপা দিতে পারে, তা দিক! চাপা দিলে বেঁচে যাওয়া যায় এযাত্রা। শুয়েই পড়ল নিরাপদ।

বিষম এক ঠোক্কর খেয়ে ঘুম ভেঙে গেল তক্ষুণি। অকথ্য গালাগালি দিচ্ছে একটা পাহারাওলা, জুতোর ঠোক্কর মারছে ক্রমাগত।—"ওঠ্, ওঠ্, ওঠ্! এটা তোর মামাবাড়ি নয় যে এখানে আরাম করে শুয়ে থাকবি। ওঠ্!"

"উঠতে পারছি না জমাদার সাহেব! সারাদিন খেতে পাইনি!"

"অমন তো কত লোকই পায় না! তারা সব এসে রাস্তায় শুয়ে পড়লে তো

● শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

রাস্তায় গাড়ি চলে না আর ! ওঠ্, ওঠ্ এক্ষুণি !”—আবার অকথ্য গালিগালাজ, আবার কড়া ঠোক্কর লোহা-বাঁধানো জুতোর।

উঠতেই হল নিরাপদকে। টলতে টলতে হাঁটতে হল আবার। পাহারাওলার শাসানি কানে আসে অনেকক্ষণ পর্যন্ত। যতক্ষণ আসে ততক্ষণ হাঁটে। তারপর একসময়ে তা আর শুনতে পায় না নিরাপদ। তখন দাঁড়িয়ে পড়ে পিছন-পানে তাকায়। নাঃ, সত্যিই অদৃশ্য হয়েছে চাপরাসধারী রাক্ষসটা। এইবার বসা যাক আবার, শোয়া যাক আরাম করে, যতক্ষণ অন্য কোন পাহারাওলা এসে তাড়া না করে।

শোবার জায়গা একটু ভাল করে দেখে নেবার জন্য ভাল করে চারপাশে তাকাল নিরাপদ। আরে এ কী ? ঠিক তার পাশেই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে একটা মস্ত মোটাসোটা কালো গাই। বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে নিরাপদকে। নিরাপদর যেন মনে হল সে-চোখের দৃষ্টি থেকে স্নেহ আর সান্ত্বনা ঝরে পড়ছে তার উদ্দেশে। ঠিক সেই মুহূর্তে আবার আগুন-তীর ছুটল পেটের
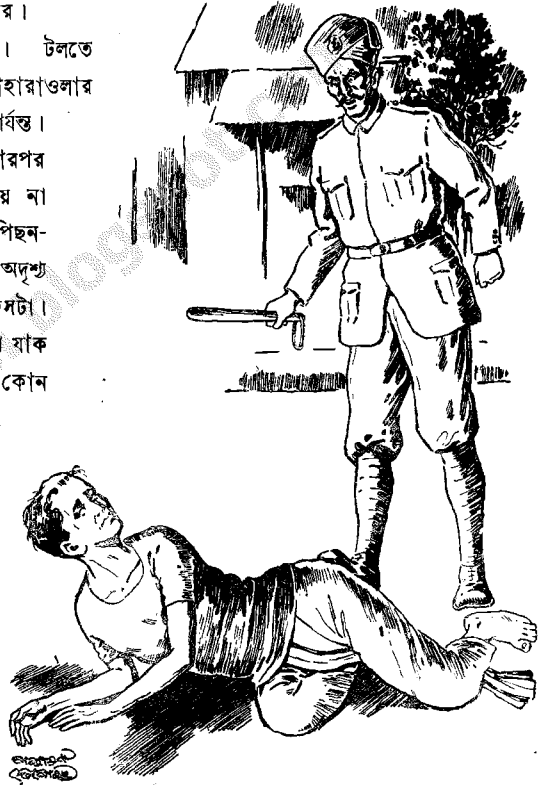
একটা পাহারাওলা জুতোর ঠোক্কর মারছে ক্রমাগত। [পৃঃ ৫০

ভিতরে ; নিরাপদর মাথার ভিতরেও তীরের মত ছুটে গেল এক উদ্ভট কল্পনা। চেষ্টা করে দেখতে হানি কি ?

চুপা এগিয়ে কালো গাইটার বাঁটের কাছে উবু হয়ে বসল নিরাপদ ; গাই নড়ে না চড়ে না। দুই হাত দিয়ে সেই গরুর মোটা মোটা বাঁট টানল সে ; সত্যিই দুধ পড়ে যে ! ক্ষীরের মত ঘন গরম দুধ—আঃ !

পেট ভরে অমৃত পান করল অভাগা বালক।

সেই বাঁট টানতে টানতে সেই বাঁটের তলায় হাঁ করে দুধ খেল নিরাপদ। অনেকখানি ! অনেকখানি ! পেট ভরে অমৃত পান করল অভাগা বালক। গোরুটি নীরবে দাঁড়িয়ে দুধ খাওয়াল তাকে। যেন তার আদরের বাচ্চাকেই সে দুধ খাওয়াচ্ছে।

তারপর গাইটি শুয়ে পড়ল রাস্তার ধারে ; আর তার ওদিকে পিঠের আড়ালে শুয়ে ঘুমোল নিরাপদ। লোহা-বাঁধানো জুতোর আওয়াজ তুলে পাগড়ি-পরা পাহারাওলারা কত এল, কত গেল ; গোরুটাকে রাস্তা থেকে তাড়ানোর কথা কারও মনে হল না। আর গোরুটার আড়ালে যে মানুষটা ঘুমোচ্ছে তাকেও তারা দেখতে পেল না।

সকালবেলার রোদ্দুর এসে চোখে পড়তে তবে তখন ঘুম ভাঙল নিরাপদর। গোরুটা উঠে গেছে কখন। সেইখানটা থেকে রাস্তার ধুলো খানিকটা তুলে নিয়ে নিজের মাথায় দিল সে, প্রণাম জানাল করুণাময়ী গোমাতাকে।

● শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

চন্দ্রচূড়

ঘণ্টা বাজছে রাস্তার দুধারের বড় বড় কারখানায়। শত শত মানুষ ঢুকে পড়ছে খোলা দরজা দিয়ে। ওরা কাজ করতে যাচ্ছে; ওদের সঙ্গে মিশে ভিতরে ঢুকে পড়বার অধিকার যদি নিরাপদর থাকত! আজ সে মেহনত করতে পারে। কাল রাত্রে মা তাকে অমৃত পান করিয়ে গিয়েছেন, আজ সে নিজেকে দুর্বল বোধ করছে না মোটেই। যত শক্ত কাজই দিক না, নিরাপদ তা ঠিকই করে দেবে!

সে এগিয়ে গিয়ে দরোয়ানের কাছে এত্তেলা দিল, সে কাজ চায় এখানে। কাজ এখানে খালি আছে?

না, খালি নেই কাজ। কিংবা আছে, যদি আগাম দশ টাকা ঘুষ দিতে পার জমাদারকে। টাকা নেই? তাহলে ভাগো! টাকা ঘুষ দিয়ে চাকরি নেবার লোক ঢের ঢের আছে।

সকাল সাতটা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত পঁয়তাল্লিশটা কারখানায় একে একে হানা দিল নিরাপদ। এক এক জায়গায় এক এক রকম উত্তর। তবে উত্তর যে-রকমই হোক, কাজ পেল না নিরাপদ। দরজায় দরজায় হানা দিতে দিতে হেঁটেও এসেছে সে বহুদূর। কাল রাতের দুধটুকু কখন গিয়েছে হজম হয়ে। আবার সেই খিদে। আবার পেটে সেই আগুন-তীরের আনাগোনা। মাথার উপরে আগুন-রোদ, জঠরজোড়া আগুন-খিদে,—টলতে টলতে রাস্তা থেকে একটা ছোট মাঠের ভিতর নেমে গেল নিরাপদ। সেখানে শুয়ে পড়ল একটা গাছের ছায়ায়; চোখ জুড়ে এল শ্রান্তি আর অবসাদে।

ঘুম ভাঙল বহুক্ষণ পরে একটা চাপা কলরবে। উঠে বসে দেখল অগুন্তি লোক ছুটে পালাচ্ছে এদিকে ওদিকে। কি একটা বেআইনী মীটিং হচ্ছিল মাঠে, পুলিস তাই ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে।

নিরাপদও কিছু না বুঝে ছুটে পালাচ্ছিল। কিন্তু ধরা পড়ে গেল পুলিসের হাতে। নিরাপদর ভাগ্যে জুটল চড়, লাথি। তারপর থানা, হাজত।

সন্ধ্যেবেলা একথালা ভাত এল হাজতের ভিতর। খেতে বসবার আগে আর এক চোট হেসে নিল নিরাপদ। ভাত জোটাবার এই উপায়টা এখনো এদেশে আছে তাহলে!

———

মরণ যাদের পদে পদে

—মুরারিমোহন বিট

লম্বা লম্বা ঘাস, লতাগুল্ম আর কাঁটাঝোপে ঘেরা ছোট্ট সবুজ পাহাড়টার প্রায় তিনদিকেই গহীন অরণ্য। ময়াল, চিতা, বুনোমোষ, বনবিড়াল প্রভৃতি হিংস্র শ্বাপদের বিষাক্ত নিঃশ্বাসে অরণ্যের আবহাওয়া বিষিয়ে আছে!

পাহাড়টার এই দিকটাই কিছুটা নিরাপদ। বড় বড় গাছপালায় এদিকের আকাশ অন্ধকার নয়, ফাঁকা। এদিকে ওদিকে এক-আধটা বড় বড় গাছ—বাবলা, শিমুল আর শ্যাওড়াই বেশী। এ অঞ্চলের বেশির ভাগই ঘাসবনে ঢাকা। দুহাত আড়াই হাত লম্বা লম্বা হালকা সবুজ রঙের ঘাস। হাওয়ায় যখন ঘাসের ডগাগুলো দোলে, তখন মনে হয় সবুজ সাগরে ঢেউ উঠেছে।

পাহাড়টার কোলে মাটির ভেতরকার সুড়ঙ্গে ওদের বসবাস অনেকদিনের। চারটি প্রাণী নিয়ে ওদের সংসার। খরগোশ-মা, খরগোশ-বাপ, আর ওদের দুই বাচ্চা।

চন্দ্রচূড়

ছোট বাচ্চাটা এই মোটে কদিন হল ছটফটিয়ে চলতে শিখেছে। বেশ গোল-গাল নাদুসনুদুস চেহারা হয়েছে এই ছোট বাচ্চাটার। নাদুসনুদুস হলে কি হবে, যেমনি চঞ্চল তেমনি ছটফটে অস্থির!

ওদের বাসাটার প্রায় দুশো গজ তফাতে আছে একটা জলা—সেই জলার দুদিকে ঘন নলখাগড়া ও কাশের বন। একদিন ওরা আচমকা টের পেয়ে গেল একটা নেকড়ে এসে আস্তানা পেতেছে ওই নলখাগড়া বনের মধ্যে। রীতিমত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল ওরা। প্রায়ই ওরা বিচরণশীল হিংস্র জন্তু জানোয়ারের সাক্ষাৎ পায়, এবং সেজন্য ওদের যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে চলাফেরা করতে হয় সন্দেহ নেই। কিন্তু এত নিকটে যদি এমন এক সাক্ষাৎ যমদূত স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে, তবে সে তো ভীষণ দুর্ভাবনার কথা।

কাজেই গর্ত থেকে বেরুনো ওদের প্রায় বন্ধই হয়ে গেল! বাচ্চা দুটোকে তো বেরুতেই দেওয়া হয় না। খরগোশ-মা ও খরগোশ-বাপ দুজনে সুযোগমত এক-আধবার বেরিয়ে কিছু খেয়ে আসে, এবং মুখে করে সন্তানদের জন্য নিয়ে আসে খাবার।

এইভাবে সন্ত্রস্ত সতর্কতার মধ্যে দিয়ে ওদের দিন কাটে।

সেদিন—

সূর্যাস্তের তখনো বিলম্ব আছে অনেক। খরগোশ-মা ও খরগোশ-বাপ দুজনে খাবারের সন্ধানে পাহাড়টার প্রায় একশো গজটাক ওপরে উঠে এসেছে। ঘাসের ডগা খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গেছে—তাই ওরা এতখানি ওপরে এসেছে মুখ পালটাবার জন্য। এদিকে একটা সবেদা ফলের গাছ আছে—আগে ওরা প্রায়ই আসত সবেদা ফল খেতে। এখন নেকড়ের ভয়ে এদিকে আসা বন্ধ করে দিয়েছে ওরা। কিন্তু শুধু ঘাস চিবিয়ে আর কতদিন থাকা যায়? সবেদার লোভে তাই আজ ওরা এসে হাজির হয়েছে। খুব সতর্ক ওরা—দুকান অত্যন্ত সজাগ!

বেশ বড়-সড় ঝাঁকড়া সবেদা ফলের গাছটা। অনেক ফল ধরেছে। পাকা ফল

ছড়িয়ে আছে গাছটার তলায়। মনের আনন্দে পেটভরে সবেদা খেয়ে মুখে করে দুজনে দুটো সবেদা নিয়ে ওরা বেরিয়ে এল ঝোপের আড়াল থেকে।

কিছুটা তফাতে ঝিরঝির করে বয়ে চলেছে এক ফালি ঝরনা। খরগোশ-বাপ বলল খরগোশ-মাকে,—আয় জল খেয়ে আসি, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।

মনে মনে বলল,—একি করলে দয়াময় ?

খরগোশ-মার তেষ্টা পায় নি। সে বলল,—তুই যা, আমি দাঁড়াচ্ছি এখানে।

খরগোশ-বাপ মুখের সবেদাটা স্ত্রীর সামনে নামিয়ে রেখে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে যায় ঝরনার দিকে।

ঠিক এমনি সময় একটা ভারী পশুর লাফ দেওয়ার শব্দে আঁতকে ওঠে খরগোশ-মা। ঝরনার ধারেই একটা বড় ঝোপ। সেই ঝোপ থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে নেকড়েটা। এবং চোখের পলক পড়তে না পড়তে খরগোশ-বাপকে মুখে নিয়ে নেকড়েটা আবার ঝোপের মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

খরগোশ-মা সব দেখল।

থরথর করে কাঁপতে লাগল সে—দুচোখে আঁধার দেখল। মনে মনে বলল,—এ কি করলে দয়াময় ?

● মুরারিমোহন বিট
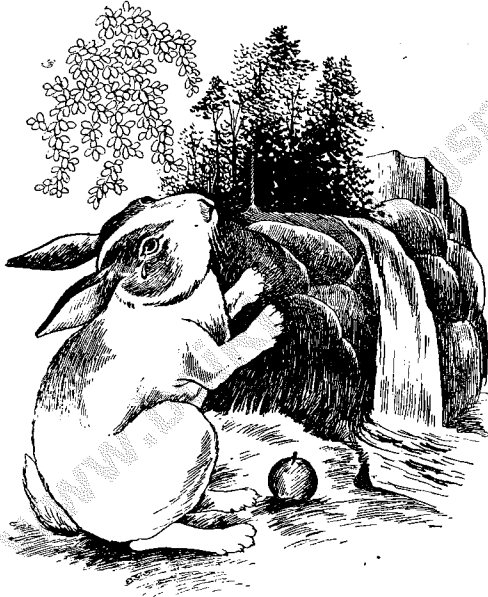
তার দুচোখে নামল জলের ধারা।

ছেলে দুটিকে নিয়ে এ অঞ্চল পরিত্যাগ করাই সাব্যস্ত করল খরগোশ-মা। কত-দিনকার ভিটে—মায়া লাগে বইকি ছেড়ে যেতে! কিন্তু নেকড়ে-ভীতির চেয়ে ভিটে বড় নয়! তাই সেদিনই সন্ধ্যার পর খরগোশ-মা সন্তান দুটিকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হল। আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে জ্যোৎস্নার আলো। সেই আলোয় পথ দেখে ওরা সতর্ক পদক্ষেপে চলতে লাগল লম্বা লম্বা ঘাসগুলোর আড়াল দিয়ে।

পদ্মদিঘির ধারে বাসা বাঁধবার ইচ্ছা খরগোশ-মায়ের। পদ্মদিঘির কথা স্বামীর মুখে শুনেছে ও। এই পথ ধরে সোজা এক প্রহর রাত হাঁটতে পারলে ছোট একটা স্বচ্ছ ঝিল পড়বে সামনে। বাঁ পাশ দিয়ে ঘুরে সেই ঝিল অতিক্রম করে আরও ঘণ্টাখানেকের পথ সম্মুখে অগ্রসর হলেই কোমল দূর্বাঘাসে ঢাকা পদ্মদিঘির তীর পাওয়া যাবে।

স্বপ্নমাখা শান্ত জায়গা। সেখানে ঝিরঝিরিয়ে বাতাস বয়ে যায় পদ্মদিঘির জল ছুঁয়ে—পদ্ম দুলিয়ে। হায়েনার হাসি, বাঘের বজ্রনির্ঘোষ, অজগরের হিসহিসানি সেখানে শোনা যায় না। সেই ভোর থেকে যতক্ষণ না সূর্য অস্ত যায়—কানে আসে ভ্রমর-ভ্রমরীদের গুঞ্জন, কোকিলের 'কুহু', পাপিয়ার 'চোখ গেল', ফিঙের শিস্, বউ কথা কও প্রভৃতি হাজারো রকম পাখিদের ডাক।

খরগোশ-মা পথ চলতে চলতে ভগবানকে ডাকে,—দয়াময়, শত্রুপুরী থেকে আমাদের নির্বিঘ্নে পদ্মদিঘির পাড়ে পৌঁছে দাও।

কিছুদিন আগে খরগোশ-বাপ ঘাসবনে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ এক বুনো শিয়ালের তাড়ায় ঐ অঞ্চলে গিয়ে পড়েছিল। পদ্মদিঘি এবং তার আশপাশের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে খরগোশ-মাকে সে বলেছিল,—চল বউ, এই শত্রুর রাজ্য ছেড়ে পদ্মদিঘির পাড়ে গিয়ে বাসা বাঁধি।

কিন্তু ভিটে ছাড়তে সেদিন রাজী হয় নি খরগোশ-বউ।

প্রায় ঘণ্টাখানেক রাত হতে চলল। দ্বাদশীর চাঁদখানা মাথার ওপর জ্বলছে।

চন্দ্রচূড়

বাচ্চাদের নিয়ে পথ চলেছে খরগোশ-মা। লম্বা লম্বা কান দুটো তার খাড়া হয়ে রয়েছে—তীক্ষ্ণ জাগ্রত করে রেখেছে সে তার শ্রবণ-শক্তিকে।

হঠাৎ পেছনে—অতি কাছে এক আর্তনাদ! পুত্রের কণ্ঠ চিনতে বিলম্ব হয় না মায়ের। আচমকা এক নির্মম কশাঘাতে ফিরে চাইল খরগোশ-মা!

ততক্ষণে অজগরটার সম্মুখ অংশটা ঘাসের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে। বাকী দেহটাও সরসর করতে করতে দ্রুত অন্তর্হিত হয়ে গেল খরগোশ-মায়ের নির্বাক্ নিস্পন্দ দুটি চোখের সামনে দিয়ে!

এবার আর মায়ের চোখে অশ্রু নামল না। স্বামীর মৃত্যুতেই কি ওর চোখের জল সব নিঃশেষ হয়ে গেছে? সন্তানের জন্যে এক ফোঁটা ফেলবে, এমন জলও কি ওর চোখে নেই?

খানিকক্ষণ মূর্ছাহতের মত বসে থেকে ধীরে ধীরে মাথা তুলে ওপরের দিকে চাইল খরগোশ-মা। তার সে দৃষ্টিতে যত অনুযোগ, যত ব্যথা, ঠিক ততটাই আক্রোশ!

তারপর সে ছোট ছেলেটাকে কোলের কাছে নিয়ে আবার পথ-চলা শুরু করল। বাচ্চা ছেলে—ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি। তাই সে সুধাল,—দাদা কোথায় গেল মা?

নাঃ, খরগোশ-মায়ের চোখের জল ফুরিয়ে যায় নি। বন্যার মতই হুহু করে এবার নেমে এল অশ্রু। কিন্তু কি বলে সে সান্ত্বনা দেবে বাচ্চাকে? কিছুই ভেবে পায় না।

—কি মা, কথা বলছিস্ নে কেন? দাদা কোথায় গেল?

—উদিক পানে গেছে, আসবে একটু পর।

বলতে গিয়ে খরগোশ-মায়ের সিক্তকণ্ঠ থরথর করে কেঁপে ওঠে। সে কম্পন ফাঁকি দিতে পারে না বাচ্চাটার কানকে। ভয় পেয়ে শুধায়,—কি হয়েছে মা তোর? কাঁদছিস যে?

খরগোশ-মা আর ধরে রাখতে পারে না নিজেকে। কাঁদতে কাঁদতে বলল,—তোর দাদাকে অজগরে ধরেছে রে, সে আর ফিরে আসবে না!

● মুরারিমোহন বিট

বাচ্চাটা আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। মুখ বুঁজে ভাবতে ভাবতে অনেকখানি পথ চলার পর সে শুধু একটিমাত্র প্রশ্ন করল,—অজগর আর নেকড়েরা বড্ড দুষ্টু না মা?

এক প্রহর রাত অতীত হয়ে গেছে। চাঁদ মাথার ওপর জ্বলছে।

খানিকটা তফাত থেকেই ছোট ছোট লতাগুল্মের ঝোপ-ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে ঝিলটার জল দেখতে পাওয়া গেল। চাঁদের রূপালী আলো লেগে চিকচিক করছে ছোট ছোট ঢেউগুলো।

ঝিলটার ধারে এসে ছোট একটা পাথরের টুকরোর ওপর বসে খরগোশ-মা ছেলেকে বলল,—একটু জিরিয়ে নে, তারপর আবার যাচ্ছি।

বাচ্চাটা শুধায়,—আর কতদূর যেতে হবে মা?

—বেশী দূর নয়। এই ঝিলটা ওদিক দিয়ে পার হয়ে আর খানিকটা গেলেই পদ্মদিঘি পাব।

বাচ্চাটার কিন্তু জিরিয়ে নেবার নাম নেই। এপাশে-ওপাশে ঘুর ঘুর করতে লাগল।

ঘুরতে ঘুরতে একঝাড় বৈঁচিগাছের সন্ধান পেল সে। পাকা পাকা বৈঁচিতে গাছটা ছেয়ে আছে। কয়েকটা খেয়ে দুটো বৈঁচি মুখে করে এনে মায়ের সামনে রেখে বলল,—খেয়ে দেখ্ মা, কী মিষ্টি!

—তুই খা, আমার খিদে নেই।

খরগোশ-মা মুখ গুমড়ে বসে রইল।

অগত্যা বাচ্চাটা আবার বৈঁচিতলায় ফিরে গিয়ে একটা একটা করে পাকা বৈঁচি খেতে লাগল। খরগোশ-মা উদাস দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল সন্তানের দিকে। ওর শেষ সম্বল···

হঠাৎ বাচ্চাটার হাত আটেক দূরেই যে আগাছার ঝোপটা রয়েছে, সেই ঝোপটা যেন কেঁপে উঠল একটু! বাচ্চাটার অতশত খেয়াল নেই। কিন্তু খরগোশ-মায়ের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ঝোপটার দিকে নিবদ্ধ হল, এবং কান দুটোও সজাগ হয়ে উঠল অতিমাত্রায়!

চন্দ্রচূড়

যেভাবে ঝোপটা কেঁপে উঠেছে, ঠিক ঐরূপ কম্পনের মধ্যে যে কতখানি আশঙ্কা লুকিয়ে থাকতে পারে, তা খরগোশ-মায়ের দীর্ঘ বন্য অভিজ্ঞতায় অজ্ঞাত নয়।

একটা বনবিড়াল লাফিয়ে পড়ল তার ঘাড়ে।

চকিতে উদ্‌ভ্রান্ত মন নিয়ে সে ছুটে গেল সন্তানের পাশে, এবং ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিল সেখান থেকে। কিন্তু নিজে সরবার আর অবকাশ পেল না, মুহূর্তে একটা বনবিড়াল ঝোপটার আড়াল থেকে বেরিয়ে লাফিয়ে পড়ল তার ঘাড়ে, এবং হিংস্র নখরে তার গলার টুঁটি চেপে ধরে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাচ্চাটা এবার দেখেছে সব। তারস্বরে সে চেঁচিয়ে উঠল,—মা—মাগো ও-ও-ও—!

চাঁদের রূপালী আলো কালো হয়ে গেল তার চোখের সামনে। উন্মাদের মত চেঁচাতে চেঁচাতে সে ছুটে চলল যেদিকে বনবিড়ালটা নিয়ে গেছে তার মাকে।

থমথমে রাত।

কোথাও শব্দ নেই এতটুকু। কেবল এই নীরব-নিঝুম রাজ্যের মধ্যে দিয়ে দূর থেকে আরও দূরে বাচ্চা খরগোশটা ছুটে চলল তার মাকে ডাকতে ডাকতে—মা, মাগো!

—পূরবী দেবী

ভারী তো একটা ঘোড়ার সাজ, তাও হাতফিরতী সেকেণ্ডহ্যাণ্ড জিনিস। কতই বা আর তার দাম হবে, কুড়ি টাকাও নয়। অথচ এই সামান্য জিনিসটার আসল মালিক কে, তাই নিয়ে কত বড় একটা মামলা হয়ে গেল।

মামলাটা শুধু একটা বিচারালয়ে আবদ্ধ রইল না, আপিল, দ্বিতীয় আপিল, দরখাস্তের পর দরখাস্ত—এইভাবে বহুদিন ধরে সাত সাতটি আদালত ঘুরে শেষ অবধি মামলাটার নিষ্পত্তি হল।

যে উকিল এই মামলাটার পেছনে দীর্ঘদিন ধরে লেগে থেকে শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়ে ফিরে এলেন, তাঁর মজুরির ফি বাবদ পেয়েছিলেন সর্বসমেত কুড়ি টাকা। কিন্তু জিদের বশে মামলা চালানোর এই দীর্ঘদিনের খরচা তিনি নিজের পকেট থেকেই দিয়ে এসেছেন।

চন্দ্রচূড়

পরের জন্যে বিশেষ করে মক্কেলের জন্যে উকিলদের বিনা পয়সায় কোন কাজ করার উৎসাহ দেখা যায় না। অথচ এই মামলায় সে নিয়মের ব্যতিক্রম দেখে একজন বন্ধু তাঁকে জিজ্ঞেস করেন এই তুচ্ছ জিনিসটা মক্কেলকে পাইয়ে দেবার জন্যে এই অমানুষিক পরিশ্রম আর নিজের অর্থ ব্যয় করার কারণ কি ?

উকিলবাবু বললেন, প্রথম আদালতের বিচারক শুধু ভুল করে রায়টা আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে দেয়নি, দস্তুরমত অন্যায় করে বেআইনী রায় দিয়েছে। এত বড় অন্যায় আমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয় বলেই আমায় ন্যায়ের অধিকার বজায় রাখার জন্যে সর্বস্ব দিয়ে যুদ্ধ করতে হয়েছে।

যে লোক এই সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে নিজের স্বার্থ ভুলে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর নাম ক্লিমেন্স ডারো।

ন্যায়ের জন্যে নিষ্ঠুরতা ও অন্যায় দমন করার প্রবৃত্তি জন্মেছিল তাঁর ছেলেবয়েস থেকেই। তখন তাঁর বয়েস পাঁচ বছর। এই বয়েসের ছেলেরা হয় সাধারণতঃ চঞ্চল ও অস্থিরমতি। ক্লিমেন্সও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না।

একদিন ক্লাসে বসে তিনি ছটফট করছেন। কিছুতেই স্থির হয়ে বসে পড়ায় মন দিতে পারছেন না। তাই দেখে ক্লাসে সকলের সামনেই শিক্ষক মশাই তাঁর কানটা জোরে মুলে দিলেন। এইভাবে ক্লাসের মাঝখানে বেইজ্জত হয়ে বালক ক্লিমেন্স কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে এলেন। তখন তাঁর বয়েস কতই বা হবে, পাঁচ বছরের বেশী নয়। তখন থেকেই অত্যাচার আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রবল ঘৃণা তাঁর মনে সঞ্চিত হতে থাকে।

ক্লিমেন্সের উকিল হওয়ার একটা মজার কারণ আছে। তিনি জীবন শুরু করেছিলেন ছোট একটা স্কুলের মাস্টার হয়ে। সেই গ্রামে একজন কামার থাকতো। ঘোড়ার পায়ে নাল পরানো ছিল তার কাজ। যখন হাতে কাজ থাকতো না, সে বসে বসে আইনের বই পড়তো।

একদিন ক্লিমেন্স শুনলেন, এই কামারটা একটা গ্রাম-পঞ্চায়েতের সামনে চমৎকার সওয়াল করেছে। শুনে তিনি একদিন দেখতে গেলেন। কামারের

সূক্ষ্মবুদ্ধি ও সওয়াল করার যুক্তিজ্ঞান দেখে ক্লিমেন্স বিস্মিত হয়ে যান। তাঁর নিজেরও বক্তৃতা দেওয়া ও যুক্তিতর্ক করার দিকে ঝোঁক ছিল। আইনের বই পড়ে কামারের বুদ্ধিবিকাশ দেখে তিনিও কামারের কাছ থেকে বইগুলো চেয়ে নিয়ে আইনটা মক্‌শ করে নেন।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে যাদের মধ্যে আত্মসম্মান আছে, অপমানিত হলে তারা অপমানিত হওয়ার কারণ আপ্রাণ চেষ্টায় দূর করার চেষ্টা করে। এই কারণ দূর করার চেষ্টায় ক্লিমেন্স কি করে পৃথিবীবিখ্যাত উকিল হয়ে উঠলেন এইবার সেই কথা বলব।

যে গ্রামে ক্লিমেন্স বাস করতেন সেখানে একজন দাঁতের ডাক্তারের বাড়ি ছিল। ডাক্তার বাইশ হাজার টাকায় তাঁর বাড়িটি বিক্রি করতে চান। ক্লিমেন্স সেটা কেনার প্রস্তাব করায় ডাক্তার রাজী হন। চুক্তি হয় যে ডাক্তার যেদিন বিক্রয়কোবালা সই করবেন সেদিন ক্লিমেন্স তাঁকে আড়াই হাজার টাকা দেবেন। বাকী টাকা মাসিক কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে শোধ করবেন।

ব্যাঙ্কে ক্লিমেন্সের আড়াই হাজার টাকা জমানো ছিল। সেই টাকা তুলে এনে ক্লিমেন্স যখন ডাক্তারের বাড়ি এসে উপস্থিত হলেন তখন ডাক্তার-গিন্নী বললেন, না, দলিল আমরা সই করবো না।

বিস্মিত হয়ে ক্লিমেন্স বললেন, কেন ?

—আমাদের সন্দেহ হচ্ছে ?

—কিসের সন্দেহ ?

—আপনি বাকী টাকা সারা জীবনে উপার্জন করতে পারবেন না। দেবেন কি করে ?

এত বড় অপমান ক্লিমেন্স সহ্য করতে পারেননি। শুধু সেখান থেকে নয় সেই গ্রাম ছেড়ে চিরদিনের মত চলে গেলেন চিকাগো শহরে। যেখানে মানুষ মানুষের উপর এই রকম হীন সন্দেহ করতে পারে সেখানে ক্লিমেন্সের মত লোকের বাস করা অসম্ভব।

চন্দ্রচূড়

চিকাগোতে এসে ক্লিমেন্স আইন পেশায় তাঁর মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন। প্রথম বছর তাঁর আয়ের পরিমাণ বিশেষ বাড়েনি। মাত্র দুহাজার টাকা। কিন্তু তার পরের বছর আয় দশগুণ বেড়ে গেল। ক্লিমেন্সের প্রতিভা দেখে সরকার তাঁকে নিজের কাজে নিযুক্ত করলে।
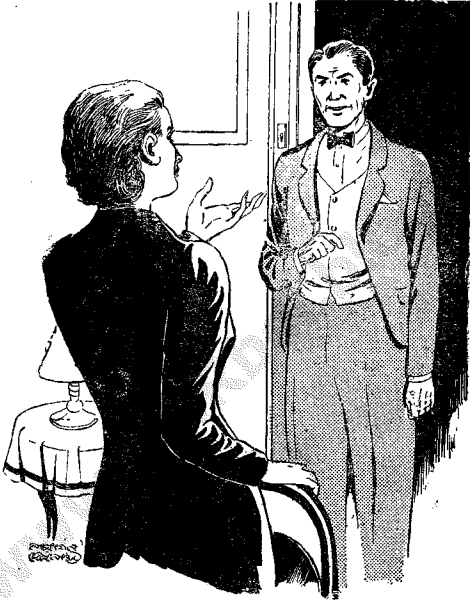
দলিল আমরা সই করবো না। [পৃষ্ঠা ৬৩

ক্লিমেন্সের সৌভাগ্যের দ্বার যেন খুলে গেল। টাকাকড়ি বা সুনামের দিকে তাঁর তিলমাত্র আগ্রহ ছিল না। তবুও যেন তারা চারদিক থেকে তাঁর কাছেই আসবার জন্যে ভিড় করতে লাগল।

ঠিক এমনি সময়েই যেন বি স্ফো র ণ ঘ টে গে ল। আমেরিকার রেল ইউনিয়ন ধর্মঘট শুরু করলে।

ইউনিয়নের ধর্মঘট করা ব্যাপারটা হয়তো অনেকে জানো না। আগেকার দিনে মাইনে-করা কর্মচারীদের সামান্য বেতন দিয়ে মালিকরা তাদের খাটিয়ে অস্থিসার করে দিত। কেউ কোন দাবি করলেই তার চাকরি যেত। কর্মীদের স্বার্থ রক্ষা করার কোন উপায় ছিল না।

তাই তারা সংঘবদ্ধ হয়ে সংঘের নাম দিত ইউনিয়ন। সংঘবদ্ধ হওয়ায় তাদের শক্তিও বেড়ে ওঠে। তখন তাদের মাইনে বাড়ানো ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধের

● পূরবী দেবী

ঘরের ঠিক মাঝখানে জটাধারী ত্যাবলাদার, পায়ের উপর লুটিয়ে পড়লেন মোটা লোকটা।

[পৃঃ ১৩৬

দাবি তারা জোর করে আদায় করবার চেষ্টা করে। দরকার হলে কাজ বন্ধ করে দেয়। এমন কি উত্তেজনা চরমে উঠলে খুনখারাপিও ঘটতে থাকে।

এই রেল ধর্মঘটেও গোটাকতক খুনজখম হয়ে গেল! চারিদিকে বিশৃঙ্খলা দাঙ্গা রক্তপাত শুরু হল। তাই দেখে সরকার আর চুপ করে বসে থাকতে পারলে না। ইউনিয়নের নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা শুরু করলে।

ক্লিমেন্স ডারো তখন সরকারী উকিল। অথচ তাঁর সমস্ত সহানুভূতি গিয়ে পড়েছে ধর্মঘটের উপর। সরকারী চাকরি নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে তো মামলা চালানো যায় না। একটা পথ বেছে নিতে হবে। হয় সরকার পক্ষের হয়ে ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান, না হয় সরকারী চাকরি ত্যাগ করে মানসম্মান ও উপার্জনের সুযোগ নষ্ট করে ধর্মঘটীদের সমর্থন করা। মন যা চায় ক্লিমেন্স সেই পথই বেছে নিলেন। সরকারী চাকরি ত্যাগ করে ধর্মঘটীদের উকিল হয়ে আদালতে গিয়ে দাঁড়ান। এই মামলায় তাঁর মামলা পরিচালনার সূক্ষ্মবুদ্ধি, সওয়াল করার অদ্ভুত বাক্‌বিন্যাস দেখে শুধু আমেরিকার নয় সারা পৃথিবীর লোক বিস্মিত হয়ে গেছল।

অপরাধী নয় অপরাধ করার প্রবৃত্তি যে অবস্থায় স্বতঃই জাগতে থাকে ক্লিমেন্স সেইটে কায়মনোবাক্যে ঘৃণা করতেন। ক্লিমেন্স বলতেন, মানুষে অপরাধ করে স্বভাবের তাগিদে নয়, সমাজের চাপে। সমাজের ক্রিয়াকলাপের ফলে যে কোন লোক অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত হতে পারে।

আর একটা জিনিস তিনি সহ্য করতে পারতেন না। কোন লোকের ফাঁসির খবর পেলে তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন। এমন কি ফাঁসির দিনে শহর ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যেতেন।

একবার দুটি লোক হত্যার অভিযোগে ধরা পড়ে। তারা যে হত্যা করেছে একথা তারা নিজে মুখে স্বীকার করে। সারা শহরের জনসাধারণ তাদের মৃত্যু কামনা করতে থাকে। সংবাদপত্রগুলি তাদের বিরুদ্ধে বিষ উদ্‌গিরণ করতে থাকে। কোন উকিলই তাদের সপক্ষে মামলা চালাতে রাজী হন না।

কিন্তু এই ফাঁসির আসামীর মামলা ক্লিমেন্স সাহস করে নিজের হাতে তুলে

নিলেন। এই রকম কাজ করতে যাওয়ার ফলে তাঁকে যে কি ভীষণ অত্যাচার ও অপমান সহ্য করতে হয়েছে তা বলা যায় না। তবুও তিনি বিন্দুমাত্র সংকুচিত হননি। জিজ্ঞেস করাতে বললেন, আহা, আমি থাকতে লোকদুটি ফাঁসিতে মরবে!

যারা কখনও কোন অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে বিচারাধীন অবস্থায় আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছে তারাই জানে অনিশ্চিত বিপদের আশঙ্কায় তাদের মনের মধ্যে কিরকম ধুকপুক করতে থাকে। ঘন ঘন জিভটা শুকিয়ে যায়, বুকের মধ্যে ধপধপ শব্দ হয় আর পা-টা যেন নিজের বশ্যতা অস্বীকার করে কাঁপতে থাকে।

…বেমালুম পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেব। [পৃষ্ঠা ৬৭

ক্লিমেন্সও একবার এই-রকম বিচারের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তিনি জুরীদের ঘুষ খাইয়েছেন। এই মামলায় ক্লিমেন্স নিজেকেই নিজে সমর্থন করেন। এই সময়ে একটা ঘটনায় অপূর্ব পুলকে তাঁর মনটা ভরে যায়। তিনি বলেন, আমি যখন জুরীদের বিরুদ্ধে ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ করার মামলা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছিলুম তখন আমার একজন পুরানো মক্কেল এসে আমার সঙ্গে দেখা করে।

আমি তাকে চিনতে পারিনি। তাই বলি, আমি বড় ব্যস্ত আছি, এখন নতুন মামলা নিতে পারব না।

সে লোকটি বলে, না আমি মামলা দিতে আসিনি।

—তবে?

● পূরবী দেবী

—একবার খুনের মামলায় আমি আসামী হয়েছিলুম। আপনি না বাঁচালে আমার নিশ্চয়ই ফাঁসি হত। তাই আপনার বিরুদ্ধে মামলা হচ্ছে শুনে আপনাকে সাহায্য করতে চাই।

সে কথা শুনে আমি বিস্মিত হয়ে বলি, কি করে সাহায্য করবে?

—আপনার বিরুদ্ধে যে প্রধান সাক্ষী আছে তাকে আমি বেমালুম পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেব। এ কাজের জন্যে আপনাকে একটি পয়সাও ব্যয় করতে হবে না।

শুনে ক্লিমেন্সের চোখে জল এসে গেল। মানুষ যে এত কৃতজ্ঞ হতে পারে তা তাঁর জানা ছিল না।

ক্লিমেন্স আজ আর জীবিত নেই। কিন্তু এখনও চিকাগো আদালতের বৃদ্ধ উকিলরা তাঁর কথা আলোচনা করতে করতে বলেন, উকিল দেখেছিলুম বটে!

ক্লিমেন্সের জীবনী থেকে এটা সহজেই বুঝতে পারা যায় যে যদি কেউ আপ্রাণ কোন কিছু নিয়ে চেষ্টা করে যায় তাহলে তার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবেই। তবে একটা কথা বাকী থেকে গেল। ক্লিমেন্সের মত মানুষকে ভালবাসতে শিখতে হবে।
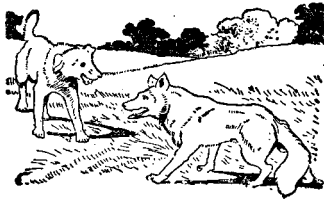
গল্পের চেয়ে আশ্চর্য!

—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

বেচারী আর্সে! কী বিপদেই সে পড়েছে!

দেনা কার না থাকে? এমন লোক একটা দেখান দেখি, যে সংসার করছে, অথচ এক পয়সা দেনা করেনি? মুদিখানার দেনা, বাড়িভাড়ার দেনা, ধোবার দেনা, দর্জির দেনা, বড়লোকের আবার স্যাকরার ঘরেও দেনা! দেনা নিয়েই তো সংসার!

তবে হ্যাঁ, দেনার পাশাপাশি পাওনাও থাকা চাই। আর্সেরও ছিল। চাকরি ছিল, ব্যবসা ছিল, একটা গোটা রুপোর খনিও তার ছিল। মাস গেলে চাকরি থেকে যে-পাওনা ছিল, তাইতেই সব দেনা শোধ হয়ে যেত তার। ব্যবসা? ওতে কখনো লাভ, কখনো লোকসান! লোকসানের দেনা লাভের পাওনা থেকে মিটিয়ে মিটিয়ে দিন তার কাটছিল একরকম করে। কিন্তু কাল হল ঐ রুপোর খনিটা নিয়ে।

রুপোর খনিটা আজকের নয়। পঞ্চাশ বছর ধরে ওর কাজ পুরোদমে চালিয়েছিল আর্সের মামা। সে-মামা লাভও করেছিল প্রচুর। তারপর অন্য কী ব্যবসা করতে গিয়ে তার সব টাকা নষ্ট হয়ে গেল, মনের দুঃখে লোকটা মারাই পড়ল।

চন্দ্রচূড়

মামার খনি পেল আর্সে। খনির কাজ তখন বন্ধ ; নিজের ব্যবসা বেচে দিয়ে, যেখানে যা পয়সাকড়ি ছিল, জুটিয়ে এনে সেই খনি আবার চালু করবার চেষ্টা করল আর্সে। কাজ চললো কিছুদিন, কিন্তু এক রতি রুপোও তা থেকে বেরুলো না। খনির রুপো শেষ করে দিয়ে তবে আর্সের মামা এ-কাজ ছেড়ে অন্য ব্যবসা শুরু করেছিল। আর্সে বা অন্য কেউ সে-কথা জানত না। জিনিসটা বরাবর গোপনই রেখেছিল মামা। বাজার গরম রাখবার জন্যই বোধ হয়।

তারই ফলে আজ ভাগনে বেচারীর সর্বনাশ। আগে যদি সে-খনির আসল ব্যাপারটা জানতে পারত, তা হলে কি ও-কাজে সে হাত দেয়? মামাকে অভিশাপ করে সে আবার খনির কাজ বন্ধ করল, আর লা-পাজ শহরে ফিরে এসে দশটা-পাঁচটা অফিস করতে লাগল আবার ; চাকরিটা তখনো তার যায়নি।

কিন্তু কাল হল দেনার দরুন। একটা পাওনাদার—সামান্য টাকাই তার পাওনা —আর্সেকে অস্থির করে তুলল একেবারে। তার বিল সরকার দৈনিক হাঁটতে লাগল আর্সের বাড়িতে। প্রথমে মিষ্টি-মধুর বচন, তারপরে নরম গরম, তারপর নালিশের ভয় দেখালো! বলিভিয়ার আইন আবার বিদ্‌ঘুটে। নালিশের সাথে-সাথেই দেনাদারকে জেলখানায় পুরে ফেলতে পারে পাওনাদার।

আর্সে যদি জেলে যায়, তার চাকরিটি সঙ্গে সঙ্গে খতম হবে। জীবনটাই মাটি হয়ে যাবে অভাগার। না খেয়ে মরতে হবে ছেলেপুলে নিয়ে।

মাত্র একশো পঁচানব্বই ডলার! অথচ এমন কোন উপায় নেই আর্সের হাতে, যাতে করে এই একশো পঁচানব্বইটা ডলার সে যোগাড় করতে পারে! সোনা দানা, আসবাব-পত্র, বন্ধুবান্ধব—কিছু না! খনি চালু করতে গিয়ে সব কিছু আগেই খুইয়ে বসেছে অভাগা আর্সে।

বিল-সরকার এবার যেদিন এল, তার হাতে নালিশের দরখাস্ত তৈরী। আর্সেকে একবার শেষ-কথা জিজ্ঞাসা করে, সে সোজা চলে যাবে আদালতে। কী বলতে চায় আর্সে, চটপট বলে নিক।

আর্সে চটপটই বলে ফেলল তার কথাটা। একটা নতুন কথাই বটে। কাল

চন্দ্রচূড়

রাতে ঘুমোতে না পেরে বিছানায় যখন ছটফট করছিল সে, তখনই হঠাৎ তার মাথায় কথাটা খেলে যায়। কথাটা আর কিছু নয়—আর্সের রুপোর খনিটা নিয়ে পাওনাদার তাকে একশো পঁচানব্বই ডলার ঋণের হাত থেকে রেহাই দিক!

অন্য যে-কেউ এই আজগুবি প্রস্তাব শুনলে হাসত। আজ আর লা-প্যজ শহরে কারও জানতে বাকী নেই যে আর্সের রুপোর খনির আসল অবস্থা কী! তার জন্য একশো পঁচানব্বই কেন, একটা ডলারও কেউ দাম দিতে রাজী হবে না।

অন্য যে-কেউ হাসত, আর্সের কথা শুনলে। কিন্তু সাইমন, এই বিল-সরকারটি হাসলো না। তার মনিব খেয়ালী লোক, তা সে জানে। এর আগেও লোকসানী ব্যাপারে তিনি ঢের-ঢের টাকা ঢেলেছেন। রুপোর খনির প্রস্তাবটা তার মনে ধরবার কোন কারণ আছে বলে সাইমনের মনে হল না। গরিব দেনাদারটা যদি বেঁচে যায় তো যাক।

সাইমনের উচিত ছিল—প্রস্তাবটা তখনই নিজের মালিককে জানানো, তারপর তাঁর হুকুম নিয়ে হয় এস্পার নয় ওস্পার, যা হোক কিছু করা। কিন্তু তার গ্রহ তাকে টানছে—সে এক হঠকারিতা করে বসল। মালিককে না জানিয়েই তাঁর নামে আর্সের রুপোর খনিটা কিনে নিল, একশো পঁচানব্বই ডলার দামে।

আর্সে দুহাত তুলে নাচতে লাগল দেনা থেকে রেহাই পেয়ে। বাতিল খনিটা যে শেষ সময় এতখানি উপকার করে যাবে, তা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি!

ওদিকে সাইমনের মনিব কিন্তু রেগে আগুন। খেয়ালী লোক তিনি; এবার তাঁর খেয়াল কিন্তু উলটো পথে ছুটল। তাঁর কেবলই মনে হতে লাগল যে তিনি বেজায় রকম ঠকেছেন, সাইমন তাঁকে ঠকিয়েছে; হয়ত আর্সের কাছে দুএক ডলার ঘুষ খেয়েই তাঁর একশো পঁচানব্বই ডলার জলে ডুবিয়েছে।

সাইমনের কোন কৈফিয়ত তিনি কানে তুললেন না। কড়া হুকুম দিলেন ও-টাকা সাইমনের কাছ থেকেই আদায় হবে। শখ করে সে খনি কিনেছে, ও খনি তারই থাকুক। মনিবের একশো পঁচানব্বই ডলার যদি সে গুনে না দেয়, তাহলে আর্সের বদলে তাকেই জেলে পোরা হবে।

● শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

চন্দ্রচূড়

সাইমনের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। মনিব যে এমন 'উল্‌টো বুঝলি রাম' হয়ে বসবেন, তা সে ভাবতেই পারেনি। এতকাল যশের সঙ্গে কাজ করে এসে অবশেষে তাকে জেলে যেতে হবে? নিজের দুর্বুদ্ধিকে সে একশো বার অভিশাপ দিতে লাগল। টাকার দিক দিয়ে সেও তো আর্সের মতনই অসহায়!

তবে জেলে তাকে যেতে হল না।

তার এক কাকা ছিলেন—মোটামুটি পয়সাওয়ালা লোক। সাইমনের উপর তাঁর একটু স্নেহও ছিল। ভাইপোটা জেলে যায় শুনে তিনিই এসে তার মনিবের একশো পঁচানব্বই ডলার মিটিয়ে দিলেন। মনিব টাকা পেয়ে খুশী হলেন বটে, কিন্তু সাইমনকে তিনি আর অফিসে ঢুকতে দিলেন না। সাফ বলে দিলেন—অমন বেহিসেবী, বেকুফ লোককে তিনি চাকরিতে রাখবেন না; রাখলে সে কোন্ দিন হয়ত তাঁকে পথে বসাবে একেবারে।

সাইমন এখন করে কী? বিল-সরকারী এমন কোন কাজ নয়, যার অভিজ্ঞতা আছে বলে চট্ করে সে অন্য জায়গায় চাকরি পেয়ে যাবে। বিশেষ করে তার আগের মনিব ব্যবসায়ীমহলে এমনভাবে তার দুর্নাম রটাতে লাগলেন যে কোন কালেই আর লা-পাজ শহরে সাইমনের চাকরি পাওয়ার আশা রইলো না। দিনে দিনে চরম কষ্টে পড়ে গেল সাইমন।

তখন তার সেই কাকার কাছে আবার ছুটতে হল তাকে।

"কী করি, একটা পরামর্শ দাও কাকা! না খেয়ে মারা যাই।"

কাকা ভেবে চিন্তে বললেন—"খনিটাই না-হয় নেড়েচেড়ে দেখ্ একবার! ওটাতো এখন তোরই।"

"খনি?"—আকাশ থেকে পড়ল সাইমন। "ওটা এখন আমারই বটে, কিন্তু ওটা নেড়েচেড়ে দেখে হবে কী? আর্সে তো ঐটে নাড়তে-চাড়তে গিয়েই মারা পড়তে গিয়েছিল। আবার আমিও সেই পথের পথিক হব? সব জেনে শুনেও?"

"আরে তার কপালে হয়নি, তোর কপালে কিছু হতেও তো পারে! খনি

বলে কথা! মাটির নীচে কোথায় কি আছে, কে বলতে পারে?"—তাকে নানাভাবে সাহস দেন কাকা।

"কিন্তু টাকা?"—আপত্তি করে সাইমন—"ওটা আবার যদি চালু করতে হয়, বেশ কিছু টাকার দরকার যে!"

"যা লাগে, আমিই দেব!"—সাহস দেন কাকা—"তুই আমার ভাইপো হয়ে না-খেয়ে মরবি, আর আমি টাকার পুঁটলি নিয়ে বসে থাকব, এ তো হতে পারে না!"

কাকার টাকা নিয়ে সাইমন খনির দিকে রওনা হল। সঙ্গে একটি মাত্র মানুষ, তার স্ত্রী। এত বেশী টাকা কাকা দেননি, যাতে মেলা লোক-লশকর সাথে নিয়ে অভিযান করা যেতে পারে সেই বহুদূরের খনির পানে। তাছাড়া, এ-খনির পিছনে টাকা ঢালা মানে যে টাকা নষ্টই করা, তাতে সাইমনের নিজেরও কোন সন্দেহ ছিল না। কাজেই, নষ্ট যখন হবেই, যত কম নষ্ট হয়, ততই ভাল! ইচ্ছে করেই দীনভাবে কাজ শুরু করল সাইমন।

বহু—বহু দূর পথ। বন প্রান্তর পাহাড় পেরিয়ে একটা পোনেরো হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের উপরে। কী প্রচণ্ড শীত সেখানে! শহরের লোক সাইমনের কান্না পায় মিনিটে মিনিটে। তবে তার স্ত্রী ছিল অসাধারণ। নিজে কোন কষ্টকে কষ্ট বলে মনে করেনি। স্বামীকেও সদাই সাহস দিয়েছে তার দুর্বল মুহূর্তে; তাকে ভেঙে পড়বার মত দেখলেই আশ্বাস দিয়েছে—"ভগবান যেখানে এনে ফেলেছেন, সেইখানেই আমাদের কাজ। ফলাফল তাঁর হাতে সঁপে দিয়ে এস আমরা সেই কাজই করে যাই।"

কাজই করে চললো দুজনে। খনির বাইরে যেমন দুর্জয় শীত, ভিতরে তেমনি অসহ্য গরম। পাঁচ মিনিটের বেশী একটানা কাজ করে কার সাধ্য? গায়ের রক্ত শুকিয়ে যায় সেখানে; চোখ ঠিকরে বেরুতে চায় গরমে।

একটা গোটা খনি, তাতে মজুর মাত্র দুটি। একটি পুরুষ, একটি নারী। কখনো কোদাল চলছে, কখনো শাবল, কখনো গাঁইতি। মাটি খুঁড়ছে সাইমন; ঝুড়ি করে সেই মাটি বাইরের আলোতে এনে ফেলছে তার স্ত্রী। ওলট-পালট করে দেখছে—মাটির ভিতরে দুটো একটাও সাদা ঢেলা দেখা যায় কিনা!

● শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

চন্দ্রচূড়

নাঃ, হতাশার নিশ্বাস ফেলে তাকে ঝুড়ি নিয়ে আবার ভিতরে ফিরতে হয়। সেখানে মরি-বাঁচি করে ক্রমাগত হাতিয়ার চালিয়ে চলেছে বেচারী সাইমন, মুখ তুলে একবার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাও করে না—"কী হল। রুপোর চিহ্ন দেখতে পেলে না এবারও?"

আশা তার কোন দিনই ছিল না; খাটতে হবে বলেই খেটে যাচ্ছে। দিনের পর দিন খেটেই যাচ্ছে—অমানুষিক পরিশ্রমে।

একদিন কোদাল চালাতে চালাতে সে চমকে উঠল—বাইরে থেকে তার স্ত্রীর চিৎকার শোনা গেল যেন! সাপ না কি? না কি পাহাড়ের গা ধ্বসে পড়ল তার মাথায়?

কোদাল নিয়েই বাইরে ছুটল সাইমন।

নাঃ। সাপও নয়, পাহাড়ের ধ্বসও নয়। এক ঝুড়ি মাটির সমুখে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে তার স্ত্রী।

সাইমনও হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

তাল তাল কী যেন সাদা পদার্থ একটা। এবারকার মাটির ঝুড়িতে মাটির চাইতে সেই সাদা পদার্থটাই বেশী।

একটি পুরুষ, একটি নারী। কখনও কোদাল চলছে, কখনও শাবল···[পৃঃ ৭২

রুপো? মরা খনি আবার কি বেঁচে উঠল?

কোদাল নিয়ে আবার ভিতরে ছুটে গেল সাইমন। পাগলের মত ক্রমাগত

কুপিয়েই চলল। উঠতে লাগল কেবলই সেই সাদা জিনিসটা ; মাটির পরিমাণ ক্রমেই কম, আরো কম, আরো কম !

কয়েক ঝুড়ি সেই সাদা ধাতু নিয়ে লা-পাজে ফিরলো সাইমন আর তার স্ত্রী। ধাতু পরীক্ষায় যারা ওস্তাদ, ধর্না দিল তাদের দোরে। তারা বলে দিক—এ জিনিসটা রুপোই তো ?

নাঃ, রুপো নয় !

পরীক্ষকদের রায় যেন সাইমনদের ফাঁসির রায়।

রুপো নয় ! রুপো সত্যিই নেই আর ও-খনিতে।

হতাশায় সাইমনেরা একথা জিজ্ঞাসা করতেই ভুলে গেল যে রুপো যদি নয়, তবে ও ঝুড়ি ঝুড়ি তাল তাল সাদা পদার্থ—ওগুলো কী ?

তারা জিজ্ঞাসা না-ই করুক, পরীক্ষকেরা নিজের কাজে ত্রুটি রাখবেন কেন ? তাঁরা জানালেন—সাদা জিনিসগুলো টিন।

'টিন' ?—ছাই ! খনির থেকে সচরাচর যে-টিন ওঠে, তার যে কী দাম, তা জানে সাইমন ! সে-টিন খনি থেকে তুলতে গেলে তাতে খরচা পোষায় না।

কিন্তু পরীক্ষকেরা আশ্বাস দিলেন। এ টিনটা ভাল। এর ভিতর বিশুদ্ধ টিন শতকরা ষাট ভাগ আছে। বাজারের টিনের চাইতে এর দাম ডবলেরও বেশী। এ জিনিস যদি বেশী পরিমাণে পাওয়া যায় সাইমনের খনিতে, খরচা উঠতেও পারে।

আবার কিছু টাকা নিতে হল কাকার কাছ থেকে। দু চারজন মজুর সাথে নিয়ে সাইমনেরা খনিতে ফিরল এবার। জোর কাজ চলতে লাগল। গাদা গাদা উঠতে লাগল টিন। চালান হতে লাগল লা-পাজ শহরে। বিক্রি হতে লাগল ধীরে ধীরে। বাজারের টিনের চাইতে সাইমনের টিন যে অনেক ভাল, জানাজানি হতে সময় লাগল কিছু। জানাজানিটা হয়ে গেল যখন, তখন সারা দেশে চাহিদা বেড়ে গেল সাইমনের টিনের। এবার টিন বিক্রির টাকা দিয়েই খনির উন্নতি হতে লাগলো। শত শত মজুর এল, ইঞ্জিনিয়ার এল, নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র এল, পাহাড়ের গায়ে গায়ে ঘর তৈরী হল কারিগরদের জন্য। নিউইয়র্ক থেকে গগেনাইমার ব্যাঙ্ক লোক

পাঠাল সাইমনের কাছে। খনিটা পরীক্ষা করে দেখল সেই লোক। তারপর সে প্রস্তাব করল—খনিটা সে ব্যাঙ্কের তরফ থেকে কিনে নিতে চায়।

কিনে নিতে চায়?—আহ্লাদে লাফিয়ে উঠল সাইমন। আঃ, বাঁচা যায় তা হলে। হাজার দশেক ডলার যদি ওরা দেয়—এই অভিশপ্ত খনি থেকে বেরিয়ে পড়তে পারে সাইমন। লা-পাজে ফিরে গিয়ে যাহোক একটা দোকান টোকান করে সুখে দুঃখে স্বামিস্ত্রী কোন মতে দুবেলা দুটো খেতে পায়।

ভয়ে-ভয়ে সাইমন জিজ্ঞাসা করে—"কী দাম দেবেন?"

গম্ভীর হয়ে ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি বলে—"তা পাঁচ লক্ষ ডলার পর্যন্ত দেওয়া যায় হয়ত।"

সাইমন লাফিয়ে ওঠে আর কি! কিন্তু তার স্ত্রী তার হাত চেপে ধরল।

আবার কিছু টাকা নিতে হোল কাকার কাছ থেকে। [পৃঃ ৭৪]

আড়ালে নিয়ে গিয়ে স্বামীকে সে বললে—"এক কথায় যার দাম ওরা পাঁচ লক্ষ ডলার দিতে চাইছে, তার দাম অন্ততঃ এক কোটি ডলার হবে। বলে দাও—আমরা বেচব না।"

ব্যাঙ্কের লোক ফিরে গেল। খনির টিন বিক্রির টাকাতেই খনির কাজ আস্তে আস্তে বাড়তে লাগল। সারা আমেরিকায় রটনা হল—সাইমনের খনির

মত খনি হয় না। দেদার টিন! উঁচুদরের টিন। এমন টিনের খনি দুনিয়ায় আর নেই!

গগেনাইমার ব্যাঙ্ক আর চুপ করে থাকতে পারল না। খনির ব্যবসা চালানোই ও ব্যাঙ্কের বড় কাজ। সাইমন যদি তার খনি অন্য কোন ব্যাঙ্কের হাতে তুলে দেয়, গগেনাইমারের ক্ষতি হবে। তারা প্লেন পাঠিয়ে দিল সাইমনের পাহাড়ে। সেই প্লেনে চড়ে সাইমন এল নিউইয়র্কে।

বিক্রি নয়, একটা অংশীদারী বন্দোবস্ত হল। অর্ধেকের কিছু বেশী শেয়ার রইল সাইমনের, বাকীটা ব্যাঙ্কের হল। তার জন্য ব্যাঙ্ক সাইমনকে দাম দিল—পাঁচ কোটি ডলার। তাছাড়া—তারা স্বীকার করল—এখন থেকে খনির উন্নতির জন্য যত ব্যয়ই দরকার হোক, ব্যাঙ্কই সে-ব্যয় যোগাবে।

সাইমন! পুরো নাম সাইমন প্যাটিনো। ভূতপূর্ব বিল-সরকারের দৈনিক আয় দাঁড়াল এক লক্ষ পাউণ্ড। সুখের মুখ দেখবার পরে প্যাটিনো দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন। পরম সুখে জীবন কাটিয়ে গিয়েছেন অনাড়ম্বরভাবে দেশের ও দশের সেবা করে। এমন সাদাসিধে লোক ছিলেন তিনি যে শেষ জীবনে এক খনিবিদ্যার কলেজে ভরতি হয়েছিলেন—খনির কাজ ভালভাবে শিখবার জন্য।

দুই দুইবার তাঁর দেশ দেউলিয়া হতে বসেছিল, দুইবারই বহু বহু কোটি ডলার দান করে তিনি বলিভিয়াকে সে-বিপদ থেকে রক্ষা করেন। দানের তাঁর শেষ ছিল না। তবু মৃত্যুকালে তিনি পুত্রের জন্য রেখে গিয়েছেন—এক বিলিয়ন ডলারেরও বেশী। দশ লক্ষে এক মিলিয়ন হয়, তা তোমরা জান। আর বিলিয়ন?—এক বিলিয়ন হয় এক মিলিয়ন মিলিয়নে।

একটা মজার কথা বলে গল্প শেষ করি। সেই তাঁর আগেকার মনিব! তাঁকে সাইমন তার করেছিলেন—নিজে মিলিয়ন ডলারের মালিক হবার পরে। তারটা এই রকম—"এখন কি খনিটাকে একশো পঁচানব্বই ডলার দামের যোগ্য বলে মনে হয় আপনার?"

বলিদান

—মুরারিমোহন বিট

আচমকা পাঁঠার ডাকে সচকিত হয়ে ওঠে ছোট্ট লতিকার ছোট্ট মনটা। মুহূর্তে কলহাস্যে প্রখর মধ্যাহ্নের ঝিমিয়ে-পড়া সারা বাড়িটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে লতিকা চেঁচিয়ে উঠল,—দেখে যাও মা, দেখে যাও, ছোট্‌কা কী সুন্দর একটা ছাগল এনেছে! কী হবে মা ছাগল?

খাওয়া-দাওয়া সেরে মুখে পান-দোক্তা গুঁজে ক্লান্ত হৈমবতী সেই কাক-ডাকা থেকে শুরু করে সংসারের বিরাম-বিহীন হাড়-ভাঙা খাটুনির পর ঠাণ্ডা মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে একটু গড়িয়ে নিচ্ছিলেন। পাঁঠার আগমন-বার্তা পেয়েছেন 'ব্যা-ব্যা' রবেই। বললেন,—শ্যামাপুজোর দিন বলি দেওয়া হবে মায়ের সামনে।

উত্তরটা সুস্থ হয়ে শুনবার মত ধৈর্য ছিল না লতির, হৈমবতীর কথা শেষ হবার আগেই সে তার ছোট্ট বেণী দুটি দুলিয়ে ছুটতে ছুটতে আলোকের পাশে গিয়ে হাজির।

—ছাগল কি হবে ছোটকা? শ্যামাপুজোর দিন বুঝি বলি হবে?

উঠোনের একপাশে খুঁটো পুঁতে পাঁঠাটাকে বাঁধবার আয়োজন করছিল

আলোক। বলল,—হ্যাঁ রে, আসছে সোমবারে তো পুজো, আর মোটে ছটা দিন দেরি। পুজোর দিন রাত্রে ঠাকুরের সামনে বলি হবে, পরের দিন তোফা মাংস খাওয়া হবে।

—ও হো হো, কী মজা! কী মজা! কী মজা!

আনন্দে লাফাতে শুরু করে দেয় লতি। লাফাতে লাফাতেই ছুটল পাশের বাড়িতে—সমবয়সী মিনির কাছে।

—দেখে যা মিনি, আমার ছোটকা কী সুন্দর একটা ছাগল এনেছে!

—সত্যি?

—সত্যি নয় তো মিথ্যে নাকি? দেখবি আয় উঠোনে বাঁধা আছে। কিন্তু হ্যাঁ ছাগলের গায়ে হাত দিতে পাবি নে, তা বলে রাখছি! হাত দিলে ছোটকাকে বলে দেব।

মিনির পক্ষে পাঁঠা-দর্শনের কৌতূহল দমন করা শক্ত হয়ে উঠল। কাজেই এই শর্তেই রাজী হয়ে সে ছুটল লতির সঙ্গে। যেতে যেতে লতি বলল,—জানিস্ শ্যামা-পুজোর দিন বলি দেওয়া হবে ছাগলটাকে। তারপর দিন মাংস খাওয়া হবে—কী মজা! আর তো মোটে ছটা দিন দেরি! তোরা কচু খাবি!

লতির কথার সত্যতা অস্বীকার করতে না পেরে কাঁচুমাচু মুখে নীরবেই থাকে মিনি।

লতি শুধোয়,—তোর মাংস খেতে ইচ্ছে করে না?

—খু—উ—ব করে।

পাঁঠা-দর্শনান্তে মিনির প্রস্থানের পর লতি পাঁঠাটাকে খেতে দেবার জন্যে বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়ল। হৈমবতী টের পেয়ে বললেন,—এখন নয়, রোদ পড়লে ডলিদের বাড়ি থেকে কাঁঠালপাতা পেড়ে এনে পাঁঠাটাকে খাওয়াস; এখন শুবি আয়।

বিকেল আসতে তর সইল না……কিছুক্ষণ খাটের ওপর এপাশ-ওপাশ করে ছুটল ডলিদের বাড়ি। সেখান থেকে একরাশ কাঁঠালপাতা ছিঁড়ে এনে পাঁঠাটাকে

খাওয়াবার সে কি বিপুল ব্যস্ততা! একদিকে ডাল থেকে পাতা ছিঁড়ে পাঁঠার মুখে পুরে দিচ্ছে, আর অপরদিকে মুখে খই ফুটছে,—এক দিনে যতো পার খেয়ে নাও মশাই, তারপর তোমাকেই আমরা পেটে পুরব!

ডাল থেকে পাতা ছিঁড়ে পাঁঠার মুখে পুরে দিচ্ছে।

তিনটে দিন কেটে গেল।

এই তিন দিনে কুচকুচে কাল পাঁঠাটার সঙ্গে লতিকার যথেষ্ট আলাপ জমে উঠেছে। পাঁঠাটাকে পেয়ে ওর সর্বাপেক্ষা প্রিয় পুতুল খেলাই বন্ধ হয়ে গেছে।

হৈমবতীর কাছে গিয়ে সে বলে,—মা, কাঁঠালপাতা খেয়ে খেয়ে ঝণ্টুর অরুচি হয়ে গেছে—আর কি খায় বলো?

হৈমবতী বাটনা বাটতে বাটতে হাসিমুখে বলেন,—কাঁঠালপাতায় অরুচি হয়েছে ঝণ্টু একথা তোকে বললে বুঝি?

লতি মুখ ফুলিয়ে বলল,—হুঁ!

—কুলপাতা খুব ভালবাসে ওরা। আমাদের বাড়ির পেছনেই তো কুলগাছ রয়েছে। কিন্তু গাছের গোড়ায় যা কাঁটাবন, ওখানে গিয়ে কুলপাতা পাড়বার জো নেই।

লতিও কাঁটাঝোপকে ভয় করে কম নাকি? তবুও দুপুরবেলা চুপি চুপি ছোট লগিটা নিয়ে কুলগাছ তলায় এসে হাজির। ছোট ছোট কাঁটা ঝোপে গাছের নীচেটা

ভরতি। পা ফেলবার উপায় নেই। সভয়ে কাঁটাগাছগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে সন্তর্পণে অগ্রসর হয়। পা দুটো ছড়ে যাচ্ছে কাঁটায়—তবুও এগোচ্ছে। সে বুঝি বোঝে না কিছু? একই জিনিস বারবার খেলে অরুচি হয় না মানুষের? ঝন্টুরই বা তা হবে না কেন? রোজই কাঁঠালপাতা চিবিয়ে থাকা যায়? অন্য কিছু খেতে সাধ হয় না বুঝি ওর?

ছোট গাছ—ডালগুলোও নেমে এসেছে অনেক নীচ পর্যন্ত। মিনিট পনের লগি দিয়ে খোঁচাখুঁচি করার পর কতকগুলো কুলপাতা নিয়ে সে যখন ফিরে এল, তার দিকে চেয়ে ক্রোধে ফেটে পড়লেন হৈমবতী।

—করেছিস কি হতভাগী পোড়ারমুখী! পাঁঠাটার জন্যে মরবি নাকি তুই? পা দুটোর দিকে তাকিয়ে দেখ্, রক্তারক্তি করেছিস যে!

তিনি তাড়াতাড়ি ছড়ে-যাওয়া অংশগুলোতে সরষের তেল মাখিয়ে দিলেন।

পাতাগুলো একটি একটি করে খাওয়াতে খাওয়াতে লতি বলতে লাগল,—তোর বুঝি খুব ভয় করছে ঝন্টু? ভয় কি? কিচ্ছু ভয় নেই! আমি রয়েছি না? আমি যে তোর বন্ধু! আমি থাকতে তোকে কিছুতেই বলি দিতে দেব না দেখিস্!

লতির মুখের দিকে ঝন্টু চাইতে থাকে……

—অমন হাঁ করে তাকাচ্ছিস্ যে! বলছি না তোর ভয় নেই কোন। এক নম্বরের ভীতু কোথাকার!

হৈমবতীর কাছে গিয়ে বলে,—মা, ঝন্টুকে কিন্তু বলি দিতে পাবে না, তা বলে রাখছি!

হৈমবতী হেসে বলেন,—কেন শুনি?

—বারে, ঝন্টু বুঝি আমার বন্ধু নয়?

—বন্ধু বুঝি?

—জানো না নাকি? ঝন্টুকে যদি বলি দাও, তাহলে থালা-ঘটি-বাটি সব ভেঙে চুরমার করে দেব কিন্তু হুঁ!……কি কথা বলছ না যে?

● মুরারিমোহন বিট

মনে মনে কিছু শঙ্কিতা হয়ে সান্ত্বনা দেন হৈমবতী,—আচ্ছা তোর বাবাকে বারণ করে দেব, এখন দুটি খাবি আয়।

পুজোর দিন সকালবেলা। আড়াই পো মাপের একটি সুন্দর প্রতিমা এনে স্থাপন করা হল বাহির-মহলের পুজোর ঘরে। দিদি-দাদাদের সঙ্গে লতিকাও মেতে উঠল আনন্দে। কিন্তু এক সময় মেজকা ও বাবার কথাবার্তা কানে যাওয়ায় সে টের পেল যে ঝণ্টুকেই বলি দেওয়া হবে। শুনে আর স্থির থাকতে পারল না লতি—ছুটল সেখানে যেখানে চুল বাঁধছেন হৈমবতী।

—মা, ওমা, ঝণ্টুকে বুঝি বলি দেওয়া হবে?

লতির কণ্ঠে একরাশ বোবা কান্না জমাট বেঁধে উঠেছে!

হৈমবতী ভাবলেন, লতি যখন যথাসময়ে সবই দেখতে পাবে, তখন আর ওকে বারবার মিথ্যে কথা বলে ভুলিয়ে রেখে লাভ কি? আগে থাকতে ব্যাপারটা ওর সয়ে থাকাই বরং ভাল। বললেন,—হুঁ।

মুহূর্তের জন্য একবার হতবাক্ হয়ে পড়ে লতি। তারপর ক্রোধ আর ক্রন্দনের প্রবল উচ্ছ্বাসে চিৎকার করে ওঠে,—না না, না! কখ্খনো না! ঝণ্টুকে তোমরা বলি দিতে পাবে না!

বলতে বলতে মায়ের সিঁদুরের কৌটোটা তুলে নিয়ে সজোরে আছাড় মারে মেঝের ওপর। রাগ করলেন না হৈমবতী। গম্ভীরভাবে সান্ত্বনার ছলে বললেন,—ওকথা বলতে নেই লক্ষ্মী মেয়ে! মায়ের ভোগের জন্য ওকে কেনা হয়েছে—মা যে ওকে সেবা করবেন!

লতি যেন জ্ঞানশূন্যা হয়ে চিৎকার করে ওঠে,—কী! আমার ঝণ্টুকে খাবে ঐ কেলে রাক্কুসীটা! ওকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব! ও ঠাকুর নয়—ও রাক্কুসী!

আতঙ্কিত কণ্ঠে হৈমবতী তিরস্কার করেন,—নোড়া দিয়ে তোর মুখ ছেঁচে দেব না মুখপুড়ি! ফের্ যদি একথা শুনি তোর মুখে! শীগ্গির আয়, মা-কে প্রণাম করবি……আয় বলছি……

চন্দ্রচূড়

—না যাব না! রাক্ষুসীকে নমস্কার করতে বয়ে গেছে!

সঙ্গে সঙ্গে মুখের ওপর একটা চড় এসে পড়ল! কাঁদল না লতিকা, শক্ত কাঠের মত দাঁড়িয়ে রইল।

অগত্যা হৈমবতী কন্যার হয়ে নিজেই দেবীর চরণে এসে গলবস্ত্রে ক্ষমা চাইলেন।

খানিকক্ষণ পরে যখন রাগটা কমে এল, লতি চুপি চুপি এসে ঢুকল ঠাকুরঘরে। ঘরে কেউ নেই—শুধু দেবীর মাটির মূর্তিটা দাঁড়িয়ে। সেই মূর্তি জ্বলজ্বলে চোখে তাকাচ্ছেন লতিকার দিকেই।

হাঁটু গেড়ে দেবীর সামনে বসে লতিকা প্রণাম করল দেবীকে। বলল,—তুমি কি সত্যিই আমার ঝণ্টুকে খেতে চাও? বল না গো, চুপ করে থেকো না, বল। তোমাকে কত নৈবিদ্যি দেবে, কত সন্দেশ দেবে, সেসব খেয়েও কি তোমার পেট ভরবে না?

মৃন্ময়ী মূর্তি নির্বাক্।

রাত সাড়ে-আটটা হবে বোধ হয়।

লতিকার মা আর কাকীমা রান্নাঘর নিয়ে ব্যস্ত......ঠাকমা পূজার ঘরে...দাদা দিদিরা পূজার ঘরের বারান্দায় মোমবাতি জ্বালিয়ে পটকা-বাজি নিয়ে মেতে আছে... বাবা ও মেজকা বাজারে গেছেন, ছোটকা বাড়ির মধ্যেই কোথাও আছে...

এই অবসরে অতি সন্তর্পণে অন্ধকারে গা মিশিয়ে মিশিয়ে লতিকা এসে হাজির হল ঝণ্টুর কাছে। ঝণ্টুও সরে এসে ওর গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়াল।

লতিকার বুকে তখন আশঙ্কা আর উদ্বেগের ঝড় বইতে শুরু হয়েছে। ছোট্ট বুকটাকে যেন তোলপাড় করে দিচ্ছে। সেই ঝড়ের দাপট ক্রমশঃ কমে এল তখন, যখন বাড়ির সকলের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে লতিকা ঝণ্টুকে নিয়ে এসে পৌঁছাল বাড়ির বাইরের অন্ধকার গলিতে।

অন্ধকার গলিটা ধরে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে লতিকা ঝণ্টুর গলার দড়িটা খুলে দিয়ে তার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে বলল,—তুই চলে যা ঝণ্টু, এখানে থাকলে তোকে কেটে ফেলবে। তোকে যে ওরা বলি দিতে এনেছে, জানিস্ নে বুঝি?

● মুরারিমোহন বিট

বলতে বলতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে লতিকা।

ঝণ্টু এক পা-ও নড়ে না।

লতিকা কাঁদতে কাঁদতেই বলে,—আমাকে ছেড়ে যেতে বুঝি খুব কষ্ট হচ্ছে তোর? কি আর করবি বল্? এখানে থাকলে তোকে যে ওরা বলি দেবে!···কিরে, এখনও দাঁড়িয়ে রইলি? মরবার সাধ হয়েছে বুঝি? শীগ্‌গির চলে যা—যা বলছি—

রাস্তা থেকে একটা ইঁটের টুকরো তুলে নিয়ে মারবার ভয় দেখাতেই ঝণ্টু কাল দেহটা নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে মিশে যায়······

এদিকে হৈমবতীর নজরে পড়ে গেল যে, খুঁটোতে পাঁঠা বাঁধা নেই। তিনি উচ্চকণ্ঠে সেকথা ঘোষণা করতেই আলোক তাড়াতাড়ি সেখানে এসে হাজির হল।

—কি হল বৌদি?

—পাঁঠাটা গেল কোথায়? দেখো দেখো—

তৎক্ষণাৎ পাঁচ সেলের টর্চটা নিয়ে এসে আলোক ছুটোছুটি শুরু করে দেয় সারা বাড়িময়। এমন সময় লতিকাকে সদর-দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে দেখে আলোক দ্রুত জিজ্ঞেস করে,—পাঁঠাটাকে দেখেছিস্ রে?

ভয়ে শক্ত হয়ে যায় লতি। মুখে কথা ফোটে না।

আলোকের মন সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে, বলে,—কিরে, কথা বলছিস্ না যে? দেখেছিস্ পাঁঠাটাকে?

কাকার মুখের দিকে একবার চেয়ে লতি ঠিক তেমনি শক্ত হয়েই ক্ষীণকণ্ঠে বলল,—আমি ছেড়ে দিয়েছি।

—ছেড়ে দিয়েছিস্!

রাগে কেঁপে ওঠে আলোকের সারা দেহটা। কিন্তু সমস্ত ক্রোধ সে সহ্য করে বলে,—কোথায় ছেড়ে দিয়েছিস্?

—গলিতে।

আগের মতই নিষ্কম্প কণ্ঠ লতিকার।

আর কোন প্রশ্ন না করে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল আলোক। আর তার

চন্দ্রচূড়

ঠিক পরমুহূর্তেই একটা চড় এসে লাগল লতিকার গালে! এই অপ্রত্যাশিত আচমকা আঘাতে টাল সামলাতে না পেরে সে মুখ থুবড়ে পড়ল হৈমবতীর পায়ের গোড়ায়।

পুজো আরম্ভ হয়ে গেছে।

নীলু, সুলেখা, কীর্তি, মণ্টু……এরা পট্‌কা-বাজি নিয়ে উন্মত্ত। ছুঁচোবাজি, ফুলঝুরি, কালীপটকা, চটপটি…আর সেই সঙ্গে কাঁসর-ঘণ্টা ও ঢাকের আওয়াজ…… গমগম করছে সারা বাড়িখানা।

লতিকার পাত্তা নেই। সেই যে চড় খেয়ে ও বিছানায় গিয়ে মুখ গুঁজে পড়েছে —তেমনি পড়েই আছে। মায়ের আদর ও ভয় দেখান, বাপ-কাকার শাসানি, নীলু-মণ্টুদের খোসামোদ, ঠাকুমার আদর……সব ব্যর্থ হয়ে গেছে। শুয়ে শুয়ে সে শুধু ভাবছে ঝণ্টুর কথা, আর কাঁদছে…কাঁদছে হাপুস নয়নে।

হঠাৎ এক সময় দাদা-দিদিদের আনন্দ-উচ্ছ্বাসের সঙ্গে তাদের চিৎকার কানে এল,—এবার বলি হবে, এবার বলি হবে!

লতিকার বুক কেঁপে উঠল!

নিঃশ্বাস বন্ধ করে সে মুখগুঁজে পড়ে রইল।

একটু পরই ঝণ্টুর বিকট আর্তচিৎকারে আঁতকে উঠল লতিকা। এ তো তার স্বাভাবিক 'ব্যা-ব্যা' ডাক নয়! এ যেন প্রচণ্ড ভয় পেয়ে 'মা-মা' বলে চেঁচিয়ে ওঠা!

চিৎকারটা যেমনি সহসা উঠল, ঠিক তেমনিই সহসা মাঝপথে থেমে গেল। তবে কি—তবে কি—

লতিকা আর ভাবতে পারে না—বিছানা ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে আসে বাইরে—একেবারে পূজা-দালানের সামনে।

ঝণ্টুর মুণ্ডহীন দেহটা থেকে তখন ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসছে টাটকা তাজা রক্ত…

লতিকা নিথর নিস্পন্দ…

ওর পায়ের তলার মাটি কাঁপছে…

মহাবিস্ময়

—পূরবী দেবী

পণ্ডিতে পণ্ডিতে বাক্‌যুদ্ধ হয় একথাটাই লোকে জানতো। খুড়ো ভাইপোর মধ্যে তর্কযুদ্ধ হবে এটা কারো ধারণার মধ্যেই ছিল না। তাই যখন কথাটা রটে গেল তখন সেই বাক্‌যুদ্ধ দেখবার জন্যে বহু লোক এসে সম্মিলিত হল বিচারস্থানে।

বিচারস্থানের মাঝখানে এক মণ্ডপ।

তার একদিকে বসেছেন পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ কুমারিল ভট্ট, অন্যদিকে আছেন তাঁরই ভাইপো বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ধর্মকীর্তি।

তর্কের বিষয় হল বেদ সত্য কি মিথ্যা।

ঘটনাটা ঘটেছিল আজ থেকে প্রায় এক হাজার চারশ বছর আগে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে চোলরাজ্যের অন্তর্গত ত্রিমলয় নামক স্থানে।

তখনকার দিনে দাক্ষিণাত্যে কুমারিল ভট্টের মত বড় পণ্ডিত আর কেউ ছিলেন

না। হিন্দুদের বেদ শাস্ত্রে তাঁর অসামান্য জ্ঞান ছিল। তাঁর কাছে বিদ্যালাভ করতেন তাঁরই ভাইপো ধর্মকীর্তি।

কাকার কাছে বিদ্যালাভ করে ধর্মকীর্তিও বেশ পণ্ডিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু হিন্দুধর্মের চেয়ে বৌদ্ধধর্মের দিকে তাঁর টানটা বেশী দেখা গেল। একথা কুমারিলের কানে যেতে তিনি খুবই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন ভাইপোর উপর।

বৌদ্ধরা বেদ বিশ্বাস করে না। ঈশ্বরের উপরও তাদের আস্থা নেই। সুবিধে পেলেই তারা বেদের নিন্দা করে। তাই কুমারিল ভট্ট বৌদ্ধদের উপর অত্যন্ত চটা ছিলেন। সেই বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি নিজের ভাইপোর আসক্তি দেখে প্রথমে তাঁকে সৎপথে আনবার জন্যে অনেক উপদেশ দিলেন।

কিন্তু সে সব উপদেশ ধর্মকীর্তি কানে নিলেন না, বরং বেশী করে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও আলোচনা করতে লাগলেন।

ভাইপোর মত পরিবর্তন হল না দেখে একদিন কুমারিল তাঁকে তিরস্কার করে নিজের বাড়ি থেকে বার করে দিলেন। ভাইপো নাস্তিকতার আলোচনা করে অপবিত্র হয়েছে ভেবে ব্রাহ্মণভোজন করিয়ে গৃহদোষ স্খালন করলেন কুমারিল ভট্ট।

কাকার বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে ধর্মকীর্তির জেদ বেড়ে যায়। তিনি ভাল করে বৌদ্ধশাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করে তর্কযুদ্ধে কাকাকে পরাস্ত করার অভিপ্রায় নিয়ে সুদূর দাক্ষিণাত্য থেকে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে উপস্থিত হলেন। নালন্দা ছিল বিহার রাজ্যের অন্তর্গত রাজগৃহে।

তখন সারাদেশে বৌদ্ধধর্মের হাওয়া বইছে। নালন্দার অধ্যক্ষও ছিলেন বৌদ্ধ। নাম ছিল ধর্মপাল। তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ধর্মকীর্তি বৌদ্ধশাস্ত্র ভাল করে অধ্যয়ন করতে শুরু করলেন।

ধর্মকীর্তি ছিলেন যেমন বুদ্ধিমান্ তেমনি শ্রুতিধর। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বৌদ্ধশাস্ত্র সম্পূর্ণ রপ্ত করে নিলেন।

জ্ঞানলাভ শেষ হতে তিনি গিয়ে বিদায় চাইলেন তাঁর গুরু ধর্মপালের কাছে।

চন্দ্রচূড়

ধর্মপালও তাঁর শিক্ষা শেষ হয়েছে দেখে তাঁকে আশীর্বাদ করে দেশে ফেরার অনুমতি দিলেন।

দেশে ফিরেই বেধে গেল ঝঞ্ঝাট। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কাছে ধর্মকীর্তি বললেন—তোমাদের বেদে লেখা যাগযজ্ঞের কথা সমস্ত ছলচাতুরী। ঈশ্বর বা স্বর্গলাভ ওসব কথা শুধু মিথ্যা নয়, সাধারণ মানুষকে ভয় আর লোভ দেখিয়ে বশীভূত করে রাখার উপায়। খুড়ো কুমারিল ভট্টকেও ধর্মকীর্তি একথা শুনিয়ে দিলেন।

সহ্য করতে পারেন না কুমারিল। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, হিন্দুর ঘরে জন্মে তুই একটা কুষ্মাণ্ড হয়ে উঠেছিস। তা না হলে বেদের কথা মিথ্যা বলিস! বেদে যা লেখা আছে তা তোদের বুদ্ধের কথা নয়। বুদ্ধ বলে যদি কেউ না থাকে, তাহলে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব থাকবে না। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের থাকা না থাকায় বেদের অস্তিত্বে সন্দেহ আরোপণ করা যায় না। বেদ হল জ্ঞানের প্রকাশ।

বিদ্রূপ করে ধর্মকীর্তি বললেন, অত কথাকাটাকাটির কি আছে। এস বিচার করে প্রমাণ কর তোমার কথা সত্যি। তবে বুঝি তোমার বেদ মিথ্যা নয়।

—বেশ আমি রাজী।

—কিন্তু একটা শর্ত আছে।

—কি শর্ত?

—তুমি যদি হার তোমায় বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে হবে। আর আমি যদি হারি তাহলে বৌদ্ধমত ত্যাগ করে আবার হিন্দুধর্ম গ্রহণ করব।

—রাজী। কুমারিল স্বীকার করেন।

শুরু হল বিচারযুদ্ধ। তাঁদের এই বিচার শোনবার জন্যে চারদিক থেকে লোক এসে বিচারস্থান জনারণ্যে পরিণত করে দেয় একথা আগেই বলেছি।

ন্যায়শাস্ত্র হল তর্কশাস্ত্র। কিভাবে কুটিল প্রশ্ন তুলে বাদ-প্রতিবাদে জয়লাভ করা যায় তা এই শাস্ত্র পড়লে বোঝা যায়। নালন্দায় থাকবার সময় ধর্মকীর্তি এই শাস্ত্র ভাল করে অধ্যয়ন করে এসেছেন।

চন্দ্রচূড়

কুমারিল ভট্ট মহাপণ্ডিত হলেও তর্ক করার কৌশল শেখেননি। দাক্ষিণাত্যে তখন ন্যায়শাস্ত্রের বিশেষ চল ছিল না।

মহাবলবান্ লোক কৌশল না জানায় যেমন ক্ষীণকায় দুর্বল কৌশলী ব্যক্তির কাছে পরাজিত হয় তেমনি ধর্মকীর্তির কুটিল বাক্যজালে তর্কের খেই হারিয়ে ফেলেন কুমারিল। শেষ অবধি প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম হয়ে পড়েন। সবশেষে স্বীকার করেন তিনি বাক্‌যুদ্ধে ভাইপোর কাছে পরাজিত হয়েছেন।

ধর্মকীর্তি বলেন, কাকা, শর্তের কথা ভুলো না।

তখনকার দিনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ছিলেন খুবই সৎ লোক। যা একবার মুখ দিয়ে বার করতেন, প্রাণ গেলেও তা পালন করতেন। ধর্মকীর্তির কথায় কুমারিল বললেন, যে প্রতিজ্ঞা করে তর্কে নেমেছিলুম তা অবশ্যই পালন করব।

কুমারিল ছিলেন খুবই নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। হিন্দুধর্মকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভাল-বাসতেন। তর্কে হেরেও বেদের উপর তাঁর আস্থা গেল না। তিনি বুঝলেন বাক্য-জালের কারসাজিতে হেরে গেছেন। কিন্তু যা শর্ত করেছেন তা তো পালন করতে হবে। তাই তিনি বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করে বৌদ্ধশাস্ত্রে জ্ঞান লাভের জন্যে নালন্দায় এসে উপস্থিত হলেন।

এখানে এসে ধর্মপালকে গুরু বলে স্বীকার করে নিয়ে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন শুরু করলেন। তাঁর মত জ্ঞানী নিষ্ঠাবান্ ছাত্রের কাছে কোন শাস্ত্রের গোপন কথা বেশী-দিন অজানা থাকে না। দেখতে দেখতে সব শাস্ত্রই তাঁর কণ্ঠস্থ হয়ে গেল। নিজের মনে বিচার করে দেখলেন, বুদ্ধ যে জ্ঞানলাভ করেছেন তা বহুদিন আগেই আমাদের উপনিষদে লেখা আছে। আমাদের সাধুসন্তরা যাকে জড় সমাধি বলেন তাই হল বৌদ্ধদের নির্বাণ। এই নির্বাণলাভই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই যে সব কাজকর্মে নির্বাণের পথ নেই সেই সব কাজের উপরে তাদের বীতরাগ।

কিন্তু সব লোকই তো নির্বাণ লাভ করতে পারে না। জড় সমাধি অবস্থা লাভ করা খুব কঠিন ব্যাপার। এই অবস্থা লাভ করতে হলে যাবতীয় জাগতিক কর্ম ত্যাগ করে ধ্যানধারণা অভ্যাস করতে হয়। তাই যারা ধ্যান করতে পারে না তাদের

● পূরবী দেবী

জন্যে কর্ম করার নিয়ম শাস্ত্রে লেখা আছে। সব লোককে যদি বলা হয় তোমরা কাজ করো না তাহলে সকলে অলস হয়ে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করবে। তাই বেদে যে সব কাজের কথা লেখা আছে সেই সব কাজে যাতে মানুষের আগ্রহ জাগে তিনি সেই কথাই প্রচার করবেন বলে স্থির করেন।

কিন্তু যতদিন গুরুগৃহে আছেন ততদিন তো নিজের মত প্রকাশ করা যায় না। তাই তিনি চুপ করেই সব কথা শুনে যেতেন যতদিন না গুরুগৃহ থেকে ছুটি পান।

একদিন অধ্যক্ষ ধর্মপাল শিষ্যদের উপদেশ দিচ্ছেন। সেখানে আর সকলের সঙ্গে কুমারিলও উপস্থিত ছিলেন। উপদেশ দিতে দিতে ধর্মপাল বেদের নিন্দা করেন। সেকথা শুনে কুমারিলের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। কুমারিলের ভাবাবেগ আর একজন শিষ্যের চোখে পড়ে। সে ধর্মপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কুমারিলের দিকে।

কুমারিলের চোখে জল দেখে ধর্মপাল বিরক্ত হয়ে বলেন, এতদিনেও বেদের উপর থেকে তোমার আস্থা গেল না! ছিঃ!

কুমারিল বিনীতস্বরে বলেন, মহাত্মন্! যা সত্য তাকে ভালবাসা কি অন্যায়?

ধর্মপাল বললেন, তুমি প্রমাণ করতে পার যে বেদ সত্য?

শুরু হয়ে গেল বিচার গুরু শিষ্যের মধ্যে। বিচার শেষ হবার আগেই ধর্মপাল বুঝতে পারলেন কুমারিলের যুক্তির দৃঢ়তা। তাই শেষ অবধি বিচার চালিয়ে শিষ্যদের কাছে হাস্যাস্পদ না হয়ে কৌশল করে তিনি কুমারিলের তর্ক বন্ধ করে দিলেন।

বললেন, তুমি চোরের মত লুকিয়ে আমাদের শাস্ত্রজ্ঞান লুণ্ঠন করতে এসেছ, তোমায় পাহাড় থেকে ফেলে দেওয়া উচিত। সেটাই হবে চোরের উপযুক্ত শাস্তি।

কথায় আছে রাজার চেয়ে পেয়াদা দড়। ধর্মপালের কথা শেষ হতে না হতেই তাঁর আর সব বৌদ্ধ শিষ্যরা কুমারিলকে মেরে ফেলবার জন্যে পাহাড়ের চূড়া থেকে ফেলে দিলে।

পড়ে যাবার আগে কুমারিল চিৎকার করে বলেন, বেদ যদি সত্য হয় আমি অক্ষতই থাকবো। আমার কিছুই হবে না।

চন্দ্রচূড়
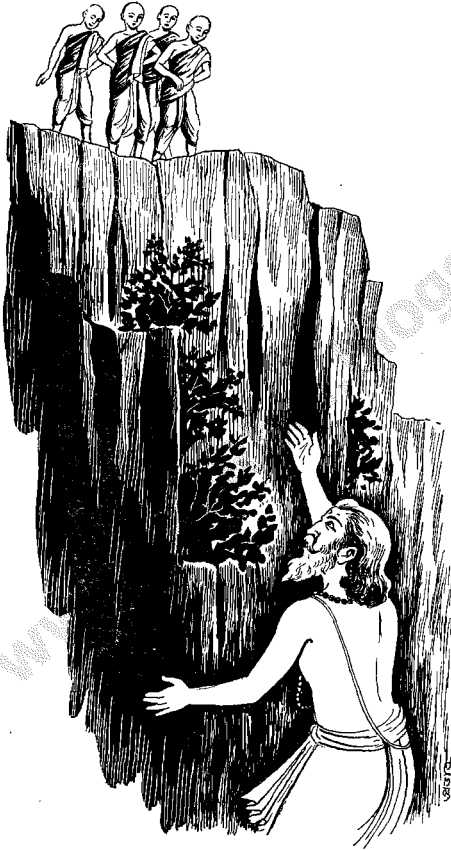
পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত বৌদ্ধ শিষ্যদের দিকে তাকিয়ে হাত তুলে বলেন…

আশ্চর্যের কথা, মাটিতে পড়ে কুমারিল অনাহতই রইলেন। শুধু তাঁর বাঁ চোখে অল্প আঘাত লাগে। তিনি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত বৌদ্ধ শিষ্যদের দিকে তাকিয়ে হাত তুলে বলেন, তোমরা নিজেরা চোখে দেখলে বেদ সত্য কি না! যদি পড়বার সময় তিলমাত্র সন্দেহ প্রকাশ না করতুম তাহলে বাঁ চোখেও আঘাত লাগত না।

কুমারিল বলেছিলেন, যদি বেদ সত্য হয়…। এই 'যদি' কথার মধ্যেই সন্দেহ নিহিত আছে আর সেই জন্যেই তাঁকে আঘাত পেতে হয়।

এইভাবে কুমারিল গুরুগৃহ হতে মুক্ত হলেন।

তখন ব্রাহ্মণদের মহা দুর্দিন। বৌদ্ধদের জয়জয়কার। রাজা মহারাজা ও দেশের সাধারণ নাগরিকগণের কাছে বৌদ্ধরাই সম্মানিত হয়। কুমারিলের পতন ও রক্ষা পাওয়ার সংবাদ পেয়ে ব্রাহ্মণেরা তাঁকে অনুরোধ করলেন ঝিমিয়ে পড়া হিন্দুধর্মকে জাগিয়ে তুলতে।

কুমারিলের মনের বাসনাও তাই। তিনি উঠে পড়ে লাগলেন বৌদ্ধধর্মের

● পূরবী দেবী

অসারতা দেখিয়ে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করতে। কুমারিলের উৎসাহে ক্রমশঃ হিন্দুদের ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ বাড়তে লাগল।

বৌদ্ধরা দেখল মহা মুশকিল। কুমারিলকে তর্কে পরাজিত করতে না পারলে সমূহ বিপদ্। লোকে আর তাদের মানবে না। তখন এক বিরাট বিচারের ব্যবস্থা হল। বিষয় হল বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ।

নানাদেশ থেকে বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা এসে হাজির হলেন বিচারস্থানে। দাক্ষিণাত্য থেকে কুমারিলের ভাইপো ধর্মকীর্তিও এলেন। তাঁদের নেতা হলেন ধর্মপাল।

হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হলেন কুমারিল ভট্ট। সে বিচার দেখবার জন্যে দেশবিদেশ থেকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরাও এসে উপস্থিত হলেন।

বিচারের পণ হল, যে হারবে সে বিজেতার ধর্ম গ্রহণ করবে। তা যদি সে অস্বীকার করে তাহলে তুষানলে তাকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে।

বিচার শুরু হল।

নানা কুটিল ও জটিল প্রশ্নে বৌদ্ধেরা কুমারিলকে বিভ্রান্ত করে তুলবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। কুমারিল আগেই তাঁদের শাস্ত্র অধ্যয়ন করে রেখেছেন। কি সমস্যা তুলে তাঁরা প্রতিপক্ষকে পরাজিত করেন তা তাঁর অজানা নেই। অমোঘ যুক্তিতে তিনি তাঁদের কূট তর্কজাল কেটে বেরিয়ে এসে দুরূহ প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। বৌদ্ধদল নির্বাক্। তাঁদের নেতা নতশির।

বিচারে কুমারিলের জয় হল। তাঁর যশ লোকমুখে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

তর্কে হেরে ধর্মপাল বললেন, আমি হেরেছি বটে কিন্তু বৌদ্ধধর্মে আস্থা হারাইনি। তাই পণের আর একটি শর্ত মতে আমি প্রাণত্যাগই করব।

সত্যিই বৌদ্ধগুরু সত্যের মর্যাদা রাখতে তুষানলে দেহত্যাগ করলেন। এমনি সত্যনিষ্ঠা ছিল সেকালে।

বৌদ্ধগুরুর পরাজয়ের পর বৌদ্ধ প্রাধান্য চিরতরে ভারত থেকে অস্তমিত হল।

কুমারিলের এই বিজয়ে হিন্দুরা খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল। উত্তর ভারতে যেখানে তখনও বৌদ্ধপ্রদীপ জ্বলছিল কুমারিলের পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে তা নিবে গেল।

চন্দ্রচূড়

এইবার কুমারিল গেলেন দাক্ষিণাত্যে। প্রথমেই আহ্বান করলেন নিজের ভাইপো ধর্মকীর্তিকে। ভাইপো আর সাহস করে কাকার সামনে এলেন না। বাড়ি ছেড়ে এক অরণ্যে পালিয়ে গেলেন। সেখানে এক আশ্রম করে বাকী জীবন কাটিয়ে দেন।

বৌদ্ধদের আধিপত্য নির্মূল করে ফেললেও জৈনদের তখনও প্রাধান্য ছিল কোন কোন জায়গায়। কুমারিলের বৌদ্ধ বিজয়ের কথা শুনে জৈনরা বুঝতে পারে একদিন তাদেরও কুমারিলের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নামতে হবে। তাই তারা শাস্ত্রটাস্ত্র ভাল করে অধ্যয়ন করে তৈরী হয়ে থাকে।

সেই সময়ে কর্ণাট উজ্জয়িনীতে সুধন্বা নামে এক ধার্মিক রাজা ছিলেন। দিগ্বিজয় করতে করতে কুমারিল সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। জৈনদের তর্কযুদ্ধে আহ্বান করে রাজসভায় গিয়ে তিনি তাদের নিন্দা করলেন।

জৈনরা চুপ করে থাকবে কেন? তারাও মুখের মত জবাব দিলে। কথায় কথায় ঝগড়া শুরু হল। কুমারিল বলেন, হিন্দুধর্মই সনাতন। এ ধর্মের পরিবর্তন নেই। চিরকাল একভাবেই আছে আর তাই থাকবে।

জৈনরা সেকথা মানতে রাজী নয়। তারা বলে, ওসব মনভুলানো কথা। অসার বাণীতে ভরা। মানুষকে মনুষ্যত্ব লাভ করতে হলে জৈনধর্ম ছাড়া পথ নেই।

যখন কেউ নিজের মতকে অন্য মত অপেক্ষা ছোট বলতে স্বীকার করলে না তখন বিচার শুরু হল। বিচারের পণ হল জৈনরা হেরে গেলে হিন্দুধর্মের মত গ্রহণ করবে। আর কুমারিল পরাজিত হলে তাঁকে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে জৈনধর্ম অবলম্বন করতে হবে।

কুমারিল বললেন, সত্য কি, মানুষের তা জানা সম্ভব নয়। যখন সে স্বপ্ন দেখে সেটাই সত্য বলে ভাবে। জাগা অবস্থায় তার যা জ্ঞান ছিল স্বপ্নের সময় তা মনে পড়ে না। আবার যখন সে জেগে থাকে স্বপ্নকে সে মিথ্যা বলে ভাবে। জাগা অবস্থায় সে যা দেখে শোনে তাই তার কাছে সত্য আর সব মিথ্যা। ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে যা দেখে তাই তার কাছে অভ্রান্ত, বাকী সব অনৃত।

কিন্তু সত্য এক। তাই সত্যকে জানতে হলে বেদের আশ্রয় নিতে হবে। এ বেদ

মানুষের সৃষ্টি করা নয়। যিনি সর্বজ্ঞ তাঁর ভাষাই বেদ। সর্বজ্ঞ হতে গেলে একসঙ্গে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জানতে হবে। তা মাত্র মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

জৈনগণের ধারণা যে তাঁদের সম্প্রদায়ের মহাপুরুষরা—ঋষভদেব থেকে মহাবীর অবধি সকলেই সর্বজ্ঞ। কিন্তু তাঁরা সকলে মানুষ। ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একসঙ্গে জানা সম্ভব নয়। তাই তাঁরা কুমারিলের যুক্তির সদুত্তর দিতে পারলেন না। কিন্তু পরাজয়ও স্বীকার করলেন না।

রাজা সুধন্বা ছিলেন মধ্যস্থ। যুদ্ধ করা, লোক শাসন করা তাঁর কাজ। শাস্ত্রের এইসব সূক্ষ্ম বিচার তাঁর মগজে ঢুকল না। তখন কোন্ দল শ্রেষ্ঠ তা স্থির করার জন্যে তিনি একটা নূতন ধরনের পরীক্ষা করবেন বলে স্থির করে তাঁদের বললেন, দেখুন আমি একটা সোজা উপায় বার করেছি। কুমারিল ও জৈনদের প্রধান নেতাকে পাহাড় থেকে ফেলে দেব। যিনি বেঁচে থাকবেন তাঁর ধর্মই শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নেব।

দু দলই সম্মত হল। দু দলই যোগ অভ্যাসে শক্তিলাভ করেছে। কিন্তু ফেলে দেবার পর দেখা গেল পাহাড়ের নীচে থেকে কুমারিল অক্ষতদেহে ফিরে এলেন। এলেন না সেই জৈন পণ্ডিত। তাঁর হাড়গোড় ভেঙে চূর্ণ হয়ে মৃত্যু হয়েছে।

রাজা বললেন, দেখা যাচ্ছে হিন্দুধর্মই বলবান্। অতএব সকলে এখন থেকে হিন্দু হয়ে যাও।

জৈনরা দেখলে মহা বিপদ। তারা বললে, যোগশক্তিতে কুমারিল শ্রেষ্ঠ কিন্তু তাতে তিনি যে জ্ঞানী তার কোন প্রমাণ নেই।

বুদ্ধিমান্ রাজা বললেন, বেশ আমি আর একটা পরীক্ষা করব। এখন আপনারা যান, তিন দিন বাদে আসবেন।

তিন দিন বাদে কুমারিল ভট্ট ও আর সব জৈন পণ্ডিতেরা সভায় এসে বসে আছেন। রাজা এলেন। তাঁর পেছনে একজন পরিচারক কাপড়ে জড়ান একটা প্রকাণ্ড জিনিস এনে সভার মাঝখানে রাখলে। কাপড় খুলে পরীক্ষা না করে তার মধ্যে কি আছে বলা কঠিন।

চন্দ্রচূড়

রাজা পণ্ডিতদের দিকে চেয়ে বললেন, এর মধ্যে কি আছে কাপড় না খুলে যে আলাদা কাগজে লিখে বলতে পারবে তারই জয় ঘোষণা করা হবে।

রাজার কথা শেষ হবামাত্রই মুহূর্তের জন্যে চোখ বুজে কুমারিল একটা কাগজে লিখে রাজার হাতে দিলেন। রাজা সে কাগজ পেটিকার মধ্যে রেখে দিয়ে জৈন পণ্ডিতদের দিকে তাকালেন। তাঁরা বললেন, মহারাজ, আমাদের সময় দিন।

—কত সময় চাই ?

—সাত দিন।

—বেশ সাত দিন বাদেই বিচার হবে। মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে রাজা তাতেই রাজী হলেন।

সাত দিন ধরে জৈনরা নানা জপতপ করে কাপড়ে বাঁধা জিনিসটার মধ্যে কি আছে তা বুঝতে পারলেন। সাত দিন পূর্ণ হতে তাঁরা উৎফুল্ল হয়ে রাজসভায় এসে বললেন, মহারাজ, কাপড়ে বাঁধা জিনিসটা হচ্ছে একটা কলসী। তার মধ্যে বিষধর সাপ আছে।

রাজা পেটিকার মধ্যে থেকে কুমারিলের লেখা কাগজটা বার করে দেখলেন তাতেও সেই কথা লেখা আছে।

তখন রাজা বললেন, সময় নিয়ে আপনারা এই ঘটনার কথা বলতে পারলেন। আর সময় দেব না। এখনি বলতে হবে, সাপের শরীরে কি বিশেষ চিহ্ন আছে।

কুমারিল হাসতে হাসতে বললেন, মহারাজ, আমি বলতে পারি কিন্তু দেখুন এঁরা তা পারেন কি না।

রাজা জৈন পণ্ডিতদের মুখের দিকে চাইলেন।

তাঁরা বললেন, সময় চাই।

রাজা বললেন, না, এখনই বলতে হবে।

জৈনরা চুপ করে রইলেন। কুমারিল বললেন, সাপের মাথায় পায়ের ছাপের মত চিহ্ন আছে।

তখন সকলের সামনে কাপড় খোলা হল। প্রথমে একটা কলসী বেরোল।

চন্দ্রচূড়

সন্তর্পণে ঢাকা খুলতে দেখা গেল একটা বিষধর সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। আর তার মাথায় পায়ের চিহ্ন।

প্রমাণ হল কুমারিলের কথাই সত্য।

তখন সুধন্বারাজ কুমারিলকেই বিজয়ী বলে ঘোষণা করলেন।

শুধু তাই নয়, জৈনদের হুকুম দিলেন বৈদিক ধর্ম গ্রহণ করতে। যারা আদেশ অমান্য করবে তাদের প্রাণদণ্ড হবে।

বহু জৈন হিন্দু হয়ে গেল। যারা রাজার আদেশ পালন করতে রাজী হল না, তারা রাজ্য ত্যাগ করে পালিয়ে গেল আর গোপনে জৈনধর্ম পালন করতে লাগল।

এইভাবে একে একে কুমারিলের চেষ্টায় ভারত থেকে বৌদ্ধ ও জৈনদের প্রভাব একেবারে দূর হয়ে গেল।

এই সব দিগ্বিজয়ে কুমারিলের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চারদিকে এতই রটে গেল যে আর কেউ সাহস করে তাঁর সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হাজির হল না।

কুমারিল যখন দেখলেন তাঁর কর্তব্য শেষ হয়েছে, আর কোন কাজ বাকী নেই তখন এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করবেন বলে স্থির করলেন।

শাস্ত্রে আছে গুরুবধের প্রায়শ্চিত্ত হল তুষানলে মৃত্যু। কুমারিল বৌদ্ধগুরু ধর্মপালের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সেই ধর্মপালই কুমারিলের কাছে পরাজিত হয়ে তুষানলে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর জন্যে কুমারিলই দায়ী। তাই তুষানলে প্রাণ দিয়ে তিনি প্রায়শ্চিত্ত করবেন বলে স্থির করেন।

প্রয়াগে গঙ্গার কাছে তুষের চিতা সাজান হল। কুমারিল তাতে উঠে বসলেন। চিতায় আগুন দেওয়া হল। ধিকিধিকি জ্বলতে জ্বলতে আগুন ওপরে উঠে আসছে এমন সময় কুমারিল শুনতে পেলেন কে যেন বলতে বলতে আসছেন—

ব্রাহ্মণ, পণ্ডিতপ্রবর কুমারিল ভট্ট, ক্ষান্ত হন, আমি এখনও অপরাজিত আছি। আমার সঙ্গে তর্ক করুন।

চন্দ্রচূড়

চোখ চেয়ে কুমারিল দেখলেন, সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন মুণ্ডিতমস্তক ষোল সতেরো বছরের এক যুবক। কিন্তু ব্রহ্মজ্যোতিতে তাঁর মুখ জ্বলজ্বল করছে। মুখে শান্ত দীপ্তি।

সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন মুণ্ডিতমস্তক ষোল সতেরো বছরের এক যুবক।

কুমারিল বললেন, কে আপনি? কি চাই?

—আমি শঙ্করাচার্য। আমার লেখা শাস্ত্রের ভাষ্যের জন্য টীকা লেখা দরকার। আপনি হয় টীকা লিখতে রাজী হন নয় তর্ক করে আমার ভুল দেখান।

কুমারিল মৃদু হেসে বললেন, আমার জীবনের কাজ শেষ হয়ে গেছে। তুষের আগুন আমার দেহ স্পর্শ করছে। আর খানিক বাদেই আমার দেহ ভস্মীভূত হয়ে যাবে। আপনি আমার শিষ্য মণ্ডন মিশ্রর সঙ্গে বিচার করুন। তার পরাজয়ই আমার পরাজয়।—এই বলে চোখ বুজে কুমারিল ঈশ্বর চিন্তা করতে করতে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন।
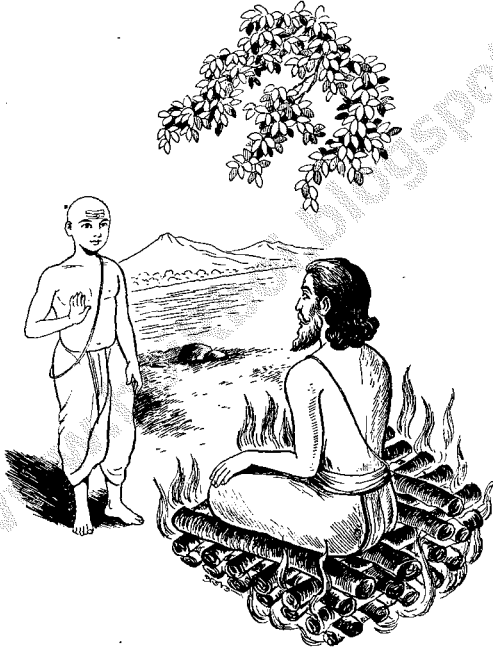
সকলের চোখের সামনে তুষের আগুন তিলে তিলে সেই দেহ পুড়িয়ে ছাই করে দিলে। ভারতের এক সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল। কিন্তু আর একটি প্রখর সূর্যের আবির্ভাব হল। তিনি শঙ্করাচার্য।

চোখের জল ফেলতে ফেলতে সরলা স্বামীর ভিটে থেকে বেরিয়ে গেলেন।

[পৃঃ ১৪৭

নিমগাছের দাম

—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

"কাকীমা! দু আনা পয়সা যে দিতে হবে আজ!"—কাঁচুমাচু হয়ে আরজিটা পেশ করে ফেলল পাঁচু।

"কেন রে?"—এঁটো থালা গেলাস নিয়ে ডোবায় যাচ্ছিলেন নীরদা, থমকে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন—"পয়সা? কেন রে? কী হবে পয়সা?"

"ঐ যে! ঐ যে চড়ুইভাতি হবে কি না পাঠশালার সবাইয়ের!"—ঢোঁক গিলতে গিলতে কোনমতে কথাগুলো বলে ফেলল পাঁচু। "একজনের মত চাল ডাল নুন তেল দিতে হবে আর দু আনা পয়সা! সব্বাইকেই দিতে হবে কাকীমা! তা জিনিসগুলো আজই চাই না, সেই রোববার দিন সকালে হলেই হবে। কিন্তু পয়সা আজই চেয়েছে বীরু-দা, সন্দেশ আর মাছের পুরো টাকা আগাম না দিলে মাল দেবে না কেউ। ছোট্ট ছেলেদের কথার উপর তো কেউ ভরসা করতে পারে না।"

চন্দ্রচূড়

"তা তো পারে না!"—নীরদার কথায় ঝাঁজ ফুটে বেরুলো অনেকখানি। "কিন্তু আমিই বা আচমকা দুই গণ্ডা পয়সা বার করতে পারি কেমন করে? রোববার দিন হলে যদি হয়, তবে আমি কোন-রকমে হয়ত যোগাড় করতেও পারি। আজ এখন তুমি লুটিস দেবা-মাত্তর আমি বাক্সো খুলে তোমায় দু গণ্ডা পয়সা দিয়ে দেব, এমন শাহেন-শা আমি নই বাবা!"

"কেন রে? কী হবে পয়সা?" [পৃঃ ৯৭

দুম্ দুম্ করে পা ফেলে ঘাটের দিকে চলে গেলেন নীরদা, আর এদিকে গুম হয়ে দাওয়ায় বসে রইল পাঁচু। ইস্কুলে যাবার সময় হয়ে এল, কিন্তু উঠে জামা গায়ে চড়িয়ে বইপত্তর গুছিয়ে নেওয়ার চাড় তার দেখা গেল না! কী হবে বই গুছিয়ে? পয়সা না নিয়ে পাঠশালে যাওয়া কোন-মতেই সম্ভব নয়। সব ছেলে বীরু-দার হাতে পয়সা গুনে গুনে দেবে, আর সে গিয়ে হাত কচলাতে কচলাতে বলবে—"আজ পারিনি বীরু-দা, রোববারে আমি ঠিক দেব—" এ কোনমতেই হতে পারে না। অন্য ছেলেরা হাসবে, টিটকারি দেবে, কান পেতে শুনতে সে রাজী নয়। মাত্তর দু গণ্ডা পয়সা! তারিণী

● শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

চন্দ্রচূড়

মিত্তিরের ছেলে সে, আজ মাত্তর দু গণ্ডা পয়সা চড়ুইভাতির চাঁদা সে দিতে পারে না, এ কেমন যেন বিশ্বাসই হতে চায় না।

কী করেই বা হয়? এই তো সেদিন! সেদিনও তাদের গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গোরু ছিল। পাঁচুর এই ছোট্ট জীবনটার ছয়টা বছর অঢেল দুধে-মাছে আরামে কেটেছে। বাপ ছিল, কাকা ছিল, এর কোল থেকে ওর পিঠে ঘুরে বেড়ানোই ছিল পাঁচুর কাজ। বংশে ঐ একটি ছেলে! খাইয়ে পরিয়ে তাকেই সুখে রাখা— উঠতে বসতে এ-বাড়ির সব কয়টা লোকের ঐ ছিল একমাত্র ভাবনা।

কিন্তু বোঁ করে চাকা ঘুরে গেল! কী-জানি কেন, ঝগড়া বেধে গেল সাহুদের সাথে। পেল্লায় বড়লোক তারা। নানান মামলা জুড়ে দিল তারিণী মোহিনী দুই ভাইয়ের নামে। মোহিনী ছিল বদরাগী, একদিন সাহুদের বড়কর্তাকে রাস্তায় পেয়ে গোবেড়েন দিলে তাকে। তারপর আর কী, জেল হয়ে গেল মোহিনীর সাথে তারিণীরও। দু বছরের জেল, তার ছয় মাসও হয়নি এখনো। এদিকে জমি জমা গেল, গোলার মজুদ ধান গেল, পুকুরের জিয়োনো মাছ গেল, গোরুগুলোর দড়ি ধরে একটা একটা করে নিয়ে চলে গেল গাঁয়ের লোকেরা। সব না কি দেনার দায়ে বিক্রি হয়েছে, শুনতে পায় পাঁচু। মাত্র এই সাত বছরে পড়েছে সে, ভাল বোঝে না এসব কথা। তবে সব না বুঝলেও, এটা তার মাথায় এসে গিয়েছে যে আজ আর তাদের কিছু নেই।

মাকে মনে পড়ে না পাঁচুর। সে যখন দোলনায় দোল খাচ্ছে, তখনই তিনি মারা যান। সেই থেকেই সে কাকীমার কোলে মানুষ। নীরদারও নিজের সন্তান নেই, ঐ পাঁচুই তাঁর চোখের মণি। অবস্থা পড়ে গিয়েছে, তবু পাঁচুকে খাওয়াপরার কষ্ট তিনি পেতে দেন না। যেভাবেই হোক, দুবেলা তার পাতে একটু মাছের ঝোল তাঁর দেওয়াই চাই; দুধ না জুটলে নিদেনপক্ষে খানিকটা নারকেল-কোরা আর গুড় থেকে সে ফাঁকি পড়ে না। এমন যে আদরের নিধি, তাকেও আজ ঝোঁকের মাথায় কড়া কথা বলে ফেলেছেন নীরদা। ঘাটে বসে বাসন মাজতে মাজতে মনটা কেঁদে উঠল তাঁর। এ তিনি কী করে বসলেন? তাঁর অবিশ্যি অভাব, কিন্তু কচি ছেলে

অভাবের কী বোঝে? সবাইকে পয়সা দিতে হবে, ও না দিয়ে পারবে কেন? না দিয়ে পারবে না জেনেই কাঁচুমাচু হয়ে চেয়ে ফেলেছে। নীরদার কাছে ছাড়া আর তো ওর চাইবার জায়গা নেই! সেই নীরদা কোন্ প্রাণে ওকে পয়সা দেওয়ার বদলে তিরস্কার করে এলেন?—অনুতাপে প্রাণটা জ্বলে যেতে লাগল নীরদার।

এক্ষুণি গিয়ে ওকে পয়সা দিতে হবে। ডুবটা দিয়ে উঠেই। ছেলেটা ততক্ষণে চলে না যায় পাঠশালায়। পয়সা নীরদার নেই, তা ঠিক। তবে মা-লক্ষ্মীর আছে। মা-লক্ষ্মীর পাটের নীচে দু এক পয়সা করে কখনো-সখনো ফেলে রাখেন নীরদা। তা দিয়ে মায়ের পূজোই হয়। অন্য কাজে তা খরচ হয় না কোনমতেই। কিন্তু আজ হবে। মা-লক্ষ্মীর কাছে দু গণ্ডা পয়সা ধার চেয়ে নেবেন নীরদা। মাসে দু গণ্ডাতে দু পয়সা সুদ ধরে দেবেন মায়ের পাটে। তাতে মা আপত্তি করবেন না নিশ্চয়। তারিণী মিত্তিরেরই লক্ষ্মী তিনি, সেই তারিণী মিত্তিরের ছেলের চোখের জল মোছাবার জন্য ঐ কয়টা পয়সা ধার দিতে আপত্তি তাঁর হতেই পারে না।

বাসন মাজা হয়ে গেল। এইবার ডুবটা দিয়ে উঠতে পারলেই—

হঠাৎ কে ডেকে উঠল—"ছোট বউ, ও ছোট বউ।"

এ-সময় ডাকে কে? চমকে উঠলেন নীরদা।

চমকাবার একটু বিশেষ কারণ আছে। এ ডোবা হল মিত্তির বাড়ির খিড়কির ডোবা। বাইরের লোক এর ধারে কাছে আসতে পারে না। তবে ডোবার উত্তর পাড়ে মানুষের গলা শোনা যায় কেন? কে এল ওখানে? কিসের জন্য এল? দিন খারাপ পড়েছে মিত্তিরদের, অজানা ভয়ে নীরদার বুক দুরুদুরু কেঁপে উঠল। জলে না নেমে তিনি ঘাটের উপর উঠে দাঁড়ালেন।

"এই যে! ডাকছি আমি, ছোট বউ।"—বলতে বলতে একটা বুড়ী উত্তর পাড়ের ঝোপঝাড় ঠেলে সামনে এসে দাঁড়াল।

"কে গা তুমি?" অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন নীরদা। একুশ বচ্ছর হলো তিনি এ-গাঁয়ে এসেছেন, পুরুষদের হয়ত সবাইকে চেনেন না। কিন্তু মেয়েছেলে তাঁর অচেনা কেউ নেই। আজই না হয় অবস্থা পড়ে গিয়েছে। তা নইলে—এক বছর

● শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

আগে পর্যন্ত গাঁয়ের বারো জাতের মেয়ে পুরুষ মাঝে মাঝে এ-বাড়িতে বারব্রতে পাল-পার্বণে নেমন্তন্ন খেয়ে গিয়েছে। নীরদা আবার না চেনেন কাকে ?

তাই অবাক হয়েই এই বুড়ীকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"কে গা তুমি ?"

"আমি ?" ফোকলা মুখে এক গাল হেসে বুড়ী উত্তর করলে—"আমায় তুমি দেখনি বুঝি কখনো ? আমি ঐ সাহুদের বাড়ির গো ! যে হরেন সাহুকে ধরে পিটিয়েছিল তোমার বাড়ির লোকেরা, সেই হরেন সাহুরই আমি মা।"

আকাশ থেকে পড়লেন নীরদা। হরেন সাহুর মা ? আছে না কি বেঁচে ? কই, কোনদিন শোনা যায় নি তো ! অবিশ্যি নীরদা শোনেননি বলেই যে হরেন সাহুর মা বেঁচে থাকতে পারে না, এমন কোন কথা নেই। গাঁয়ে ঐ সাহুবাড়িই এক-মাত্র বাড়ি, যে-বাড়ির মেয়ে পুরুষ কোনদিন তারিণী মিত্তিরের ঘরে নেমন্তন্ন খেতে আসেনি। বরাবরই একটা রেষারেষি ছিল কিনা দুই বাড়িতে ! মিত্তিরেরা মান-ইজ্জতের দিক দিয়ে বড় ছিল, সাহুরা বড় ছিল পয়সার দিক দিয়ে। রেষারেষি না হয়ে পারে ?

কিন্তু সে-বাড়ির বুড়ো ঠাকরুন আজ হঠাৎ এ-সময়ে এখানে ? ব্যাপারখানা কি ? আবার কোন নতুন বিপদে জড়াবার ফিকিরে আছে না কি সাহুরা ? কিছু আটক নেই ! নীরদা ভয়ে ভয়ে বুড়ীর দিকে তাকিয়ে বললেন—"আমি সত্যিই আপনাকে দেখিনি কখনো। তা, আজ এই দুপুর রোদে আপনি হঠাৎ—"

"ছেলেরা বাড়ি থাকে, বেরুতে পারিনে মা !" বুড়ী ফোকলা মুখের একটা অদ্ভুত ভঙ্গী করে বলল—"তা আজ দুই ছেলেই শহরে মামলা করতে গিয়েছে, এই ফাঁকে আমি বেরিয়ে পড়েছি একবার। তোমাদের সদরের দিকেই যাচ্ছিলাম বাছা, কিন্তু বাগানের বেড়া ভাঙা দেখে ঐখান দিয়েই ঢুকে পড়েছি। নিজের মনকে নিজেই বোঝালাম—ব্যাটাছেলেতে ব্যাটাছেলেতে মামলা হচ্ছে—তা হোক। তা বলে মোহিনী মিত্তিরের বউ কি আর হরেন সাহুর মাকে চোর বলে ধরিয়ে দিতে পারবে ? কখখনো পারবে না।"

বুড়ীর কথার ধরন দেখে নীরদার হাসি পেল। হাসতে হাসতেই বললেন—

"ধরিয়ে দেওয়ার কথা হচ্ছে না, কিন্তু আপনি এলেন কেন কষ্ট করে? কোনদিন তো আসেন না!"

"অনেকদিনের দেনা বাছা!" বুড়ীও হেসে ফেলল নীরদার হাসি দেখে। "দেনা শোধ না করে মরে যদি যাই, নরকে যেতে হবে যে! ছেলেদের বলি, তারা গা করে না। তাই নিজের দেনা শুধতে নিজেই এলাম। অনেক, অনেক দিনের কথা। তখনো বোধহয় তোমার বিয়েই হয়নি। মাঝে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম কথাটা, তা নইলে আর ঐ কয়টা টাকা পড়ে থাকে? তা—আমি সাতখানা নোটই এনেছি—সাত টাকা ছিল গাছটার দাম, বলি—কয়েক বছর দেরি হয়েছে বলে তুমি আবার সুদটুদ চাইবে না কি? ওসব বাছা আমি দিতে পারব না। ছেলেদের টাকা থাকলে কী হবে, আমার ভাঁড়ে মা-ভবানী। ঐ আসলটা নিয়েই আমায় রেহাই দাও বাছা!"

নীরদা একেবারে থ মেরে গিয়েছেন। সাহুদের মায়ের সাত টাকা দেনা তাঁর কাছে? এ যে স্বপ্নেরও অগোচর!

"কিন্তু কিসের দেনা, সেটা তো বললেন না!" নীরদা প্রশ্ন করলেন অবশেষে।

পায়ে পায়ে বুড়ী এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে নীরদার কাছেই। চুপি চুপি বললে—"দেনাটা? ঐ যে হরেনের বাবা যখন মারা গেলেন, ছরাদ্দের বৃষকাঠ করব—এমন গাছ মেলাতেই পারা গেল না। পরান বাগদী ছিল পাইক, এসে বলল—তারিণী মিত্তিরের একটা বড় নিমগাছ আছে মাঠ-পুকুরের ধারে, সে যদি দেয়—তবেই হয়। তা নইলে ভারী মুশকিল, এ-তল্লাটে আর পূরন্ত নিমগাছ মিলছে না।"

"হরেনের বাবা যখন মারা গেলেন?" নীরদার মাথার ভিতর বোঁ বোঁ করে উঠল। সে কি আজকার কথা? তিনি এ-গাঁয়ে আসবার আগেই হরেনের বাবা মারা গিয়েছিলেন, তা নীরদা শুনেছেন। এতকাল বাদে—কী এ রহস্য?

"তা তুমি টাকা কয়টা নাও বাছা, আমায় ঋণ থেকে মুক্তি দাও।" বললে বুড়ী। "অবিশ্যি সেদিন তারিণী যে-উপ্‌কার আমার করেছিল, সে-উপ্‌কারের ঋণ আমি টাকা দিয়ে শুধতে পারব না। আর দেখ, গেরো দেখ, সেই তারিণীকে কি না জেল

দিলে আমার কুসন্তানেরা। নিজের ছেলেদের অভিশাপ তো আর করতে পারিনে, কী আর বলব বল। তা নাও বাছা, টাকা কয়টা নাও। এই সাতখানা নোট!"

বুড়ী হাত বাড়িয়ে টাকা দিতে এল নীরদাকে।

নীরদা ব্যস্ত হয়ে পিছনে সরে গেলেন এক পা। "এখন আমায় টাকা দেবেন না মা! আমি বাসন মেজে এখনো নাইতে পারিনি।"

"ওঃ!" বুড়ী খুশীর হাসি হাসল। "বেশ! বেশ! এমনি আচার বিচারই তো চাই। তা তোমরা ভাল বংশের মেয়ে, তোমাদের কি আর এসব শেখাতে হয়?"

"আপনি একটু দাঁড়ান, আমি ডুবটা দিয়ে নি"—বলে নীরদা তাড়াতাড়ি জলে নামলেন।

"না, না, তাড়াতাড়ি কেন করবে বউমা!"—পাড় থেকে বলে উঠল বুড়ী। "এই তোমার সাতখানা নোট রইল, ইট চাপা দিয়ে মাটিতে রাখছি এই জায়গায়। আমি আর দাঁড়াব না, বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি—বললাম তো! তুমি নেয়ে উঠে টাকা তুলে নিও ধীরে সুস্থে—।"

ডোবাটা ছোট হলেও বেশ পরিষ্কার, নাইতে অরুচি হয় না। আর নীরদার বিলাস বলতে ঐ একটিই আছে—তোয়াজ করে তিন বেলা স্নান। কাজেই বুড়ীর হাত থেকে রেহাই পেয়ে তিনি মনের আনন্দে ডুবের পর ডুব দিতে লাগলেন। স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে ঘাটে উঠে মনে মনেই মা-লক্ষ্মীকে প্রণাম জানালেন বারবার। মা মুখ তুলে চেয়েছেন আজ। সারাজীবনের লক্ষ্মীপূজা বিফল হয়নি তাঁর। দু আনা পয়সা ধার চাইতেই একেবারে সাত-সাত টাকা দিয়ে ফেলেছেন। দিন আসুক, তিনি ঐ টাকা আবার মা-লক্ষ্মীর পাটেই জমা দেবেন, ধুমধাম করে পূজা করবেন ও দিয়ে, পাড়ার ছেলেমেয়েদের সন্দেশ প্রসাদ বিলোবেন সেদিন।

বড় আনন্দ সত্যি! নীরদা ভুলে গেলেন তাঁর চরম দুরবস্থা, স্বামী আর ভাশুরের কারাবাস। কোলের ছেলেটা দু গণ্ডা পয়সা চাইতে এসে বকুনি খেয়েছে, হয়ত চোখের জল ফেলছে বসে বসে।—সে সব দুঃখ ভুলে গেলেন নীরদা, মায়ের দয়ার পরিচয় পেয়ে। "যার কেহ নাই, তুমি আছ তার"—মা-লক্ষ্মী মুখ তুলে চেয়েছেন।

তাঁর দয়া না হলে—পঁচিশ বছর আগেকার কোন্ নিমগাছের দাম বাড়ি বয়ে দিতে আসে পরম শত্রুর মা ? মা-লক্ষ্মীকে প্রণাম জানাতে জানাতে এক সময় বুড়ীকেও মনের অজান্তে প্রণাম জানিয়ে বসলেন নীরদা।

হঠাৎ—ও কী ?

বাড়ির ভিতর থেকে হাহাকার করে কেঁদে উঠল ও কে ? নিশ্চয়—নিশ্চয় ও পাঁচু। কী হল ? কী হল তার ?

"পাঁচু ! পাঁচু !"—ডাকতে ডাকতে বাসনগুলো নিয়ে ছুটে চলে গেলেন নীরদা, টাকার কথা একদম ভুল হয়ে গেল তাঁর।

বাড়িতে ঢুকে যা দেখলেন—তাতে চোখে আঁধার ঘনিয়ে এল নীরদার। একটা সাপ দাওয়ায় পড়ে ছটফট করছে, আর—

আর—পাঁচুর হাঁটুর নীচে পাশাপাশি দুটো রক্তের ফোঁটা জমে উঠেছে।

"আমায় সাপে কেটেছে কাকীমা !"—ডুকরে কেঁদে উঠল পাঁচু।

বাসনগুলো দাওয়ায় টান মেরে ফেলে দিয়ে চালের বাতা থেকে শক্ত দড়ি পেড়ে নিলেন নীরদা। পাড়াগাঁয়ে বসবাস হলেও নীরদা হাবাগোবা মুখ্খু নন। মোহিনী নিজে কলেজে পড়েছিল কিছুদিন, তার আধুনিক হাল চাল নীরদার ভিতরেও এসে গিয়েছে অনেকখানি। সাপ কামড়ালে কী করতে হয়—তা তাঁর অনেক শোনা আছে।

একটার উপর আর একটা—পর পর দুটো শক্ত গেরো বাঁধতে বাঁধতে পাঁচুর কাছে মোটামুটি সব শুনে নিলেন নীরদা। ইস্কুলে যাবে না ঠিক করে দাওয়ায় বসে ছিল পাঁচু, ক্রমে সে মাটিতেই শুয়ে পড়ে, আর কখন চোখে জড়িয়ে আসে একটুখানি কাল ঘুম। হঠাৎ দারুণ একটা জ্বালা করে ওঠে পায়ে। ধড়মড় করে উঠে দেখে—সাপটা তাকে কামড় দিয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাচ্ছে। হাতের মাথায় কাটারি ছিল একখানা, তাই দিয়ে পাঁচু তার মাথায় মারে মোক্ষম এক ঘা ! তাইতে ওটা আর যেতে পারেনি, ঐখানে পড়ে ধুলোয় গড়াচ্ছে।

নীরদা দেখলেন বোড়া সাপ। তবু মন্দের ভাল ! সময় পাওয়া যাবে একটু। কেউটে বা গোখরো হলে আর দেখতে হত না এতক্ষণ।

● শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

চন্দ্রচূড়

পাঁচু অঝোরে কাঁদছে—"আমি আর বাঁচব না কাকীমা!" নিজের বুক ফেটে গেলেও নীরদা তাকে সাহস দিচ্ছেন—"অমন বলতে নেই বাবা! দেখনা আমি এক্ষুণি তোমায় কলকাতায় নিয়ে যাব। ডাক্তার বিষ বার করে দেবে এক্ষুণি।"

"আমায় সাপে কেটেছে কাকীমা!" [পৃঃ ১০৪

সাপের কামড়ে ডাক্তার? পাঁচু অবাক্ হয়ে বলে—"ওঝা ডাকবে না? কামড়ের চিকিচ্ছে তো ওঝাতেই করে!"

নীরদা হাসলেন একটু। পাঁচুকে সাহস দেবার জন্যই হাসলেন। হেসে বললেন,—"তোর কাকা বলেন—আজকালকার কোন ওঝা আর সাপের বিষ নামাতে পারে না। সে বিদ্যে ওদের ভিতর কোনদিন যদি থেকেও থাকে, এখন তা লোপ পেয়েছে।"

তাড়াতাড়ি ভিজে কাপড় বদলে নীরদা বললেন—"কিছু ভয় নেই বাবা, আমি গোরুর গাড়ি ডেকে আনছি। বাস পর্যন্ত গাড়িতে যাব, তারপর বাসে উঠে—কতক্ষণের পথ আর কলকাতা?"

পাঁচুর মাথাটা ঝিমঝিম করছে, সে বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে জিজ্ঞাসা করলে—"গাড়ি ডাকতে যাচ্ছ, ভাড়ার টাকা পাবে কোথায়?"

চন্দ্রচূড়

টাকা? এতক্ষণ ও-চিন্তা মাথায় আসেনি। কিন্তু চিন্তা এবার যদিও এল, ভয় এল না তার সঙ্গে। সাতটা টাকা তো আছে! কলকাতায় যাওয়া তো হবেই। তারপর? সরকারী হাসপাতালে টাকা তো লাগে না!

বাড়ির বাইরে গিয়েই নফরা তেলীকে দেখতে পেলেন নীরদা। তাকে ঘটনাটা বলতেই সে গাড়ি ডাকতে ছুটল। অবিশ্যি বলতে বলতে গেল যে শহরে গিয়ে কোন লাভ নেই, বরঞ্চ বকুল গাঁয়ের দীনু ওঝাকে ডাকলে সে দু দণ্ডের ভিতরে—

নফরকে পাঠিয়ে দিয়েই এবার নীরদা ছুটলেন ডোবার ধারে। পাঁচুকে বাঁচাবার পথের কড়ি ঐখানেই ইট-চাপা পড়ে আছে। ঐ তাঁর সম্বল। উঃ! এই জন্যেই মা-লক্ষ্মী আজ পঁচিশ বছর আগেকার পাওনা টাকা তাকে পাইয়ে দিলেন? বারবার হাত জোড় করে মাথায় ঠেকাতে লাগলেন নীরদা।

ইটের তলায় ঐ যে টাকা! তুলে নিয়েই কিন্তু নীরদা থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন মাটিতে! কোথায় সাত টাকা? বুড়ী বলেছিল—"সাতখানা নোট।" নোট সাতখানাই রয়েছে বটে, কিন্তু এক টাকার নয়, সাতখানাই দশ টাকার নোট!

* * * *

দিন পোনের পরের কথা।

সাহুদের বাড়ির অন্দরের উঠোনে একটি ছেলের হাত ধরে এসে দাঁড়ালেন একটি বউ। তাঁকে দেখে সাহুদের বড় বউ হাতের কাজ ফেলে ছুটে এসে দাঁড়ালেন তাঁর সামনে। গলায় আঁচল জড়িয়ে তিনি বললেন,—"ছোট্ ঠাক্রুন! আপনি? কী ভাগ্যি আমার! আসুন—আসুন, ঘরে আসুন! ছেলেটিকে সাপে কেটেছিল, ঠাকুরের দয়ায় সেরে উঠেছে দেখছি!"

"আপনি চেনেন আমায়?"—অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন নীরদা!

"চিনি না?"—বড় বউ হেসে বললেন—"কালীতলায় কতবার আপনাকে দেখেছি যে!"

● শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

চন্দ্রচূড়

"আমি এসেছি দিদি, একবার আপনার শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা করতে!"—ধীরে ধীরে জানালেন নীরদা।

"শাশুড়ী?"—চমকে উঠে এই কথাটি বলে ভুরু কুঁচকে নীরদার দিকে তাকাতে লাগলেন বড় বউ। তাঁর সন্দেহ হল—নানা বিপদে আপদে পড়ে মিত্তির বউয়ের হয়ত মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।

অন্যায় করে অনেক জমি আপনাদের নিয়েছি আমি। [পৃঃ ১০৮

[পৃঃ ১০৮

"কেন? তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না?"—অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন নীরদা। "অসুখ বিসুখ না কি? বুড়ো মানুষ—"

"কী বলছেন ছোট্ ঠাক্রুন!"—একটু ঝাঁজালো গলায় জবাব দিলেন সাহু-বউ। "আমার শাশুড়ী মারা গিয়েছেন আজ বছর বাইশ-তেইশ হল!"

আর বলতে হল না; নীরদা সেই উঠোনে মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। পাঁচু ডুকরে কেঁদে উঠল, "কাকীমা—কাকীমা" বলে।
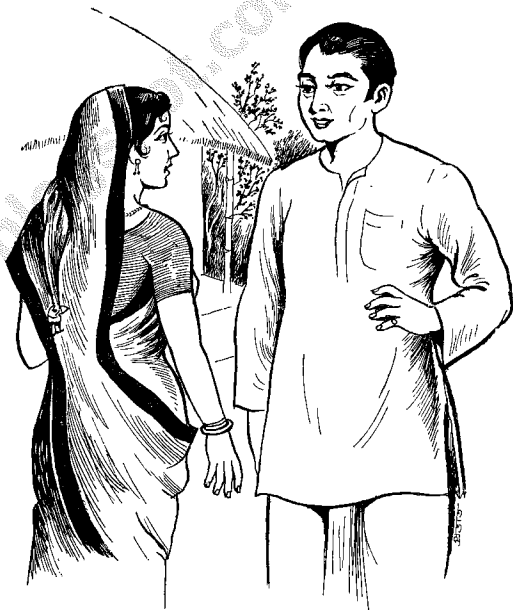
শোরগোল শুনে সাহু-কর্তারা ভিতরে এলেন। নীরদা ততক্ষণে সব কথা বলেছেন সাহু-বউকে। সাহু-বউ এবার সব স্বামীকে বললেন। নীরদার কাছে সেই সাতখানা নোটের একখানা আস্তই ছিল। সেটা বার করে দেখা গেল—তার পিছনে সাহু বাবুদের রবার স্ট্যাম্প

ছাপা রয়েছে। এ-নোট যে এ-বাড়ি থেকেই বেরিয়ে গিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। ছোট সাহু চুপি চুপি দাদাকে বলল—"সত্তরটা টাকা তবিল কম হয়েছিল দিন পোনেরো আগে, মনে পড়ে দাদা? সে টাকা ঐখানে দিয়ে এসেছিলেন মা। তাইতো বলি—লোহার সিন্দুকে বন্ধ রয়েছে টাকা—"

বড় সাহুর চোখ দিয়ে জল পড়ল। "সে নিমগাছের কথা আমার মনে আছে। মিত্তিরদা ঐ গাছ না দিলে বাবার বৃষকাঠই হত না। তিনি দাম নেননি।"

একটুখানি থেমে তিনি নীরদাকে বললেন—"বউ-ঠাকরুন, অন্যায় করে অনেক জমি আপনাদের নিয়েছি আমি। সব ফেরত দিলাম এই দণ্ডে। আর কালই আমি শহরে যাচ্ছি। মামলার যাতে আবার বিচার হয়, মিত্তিরদারা যাতে খালাস পেয়ে আসেন, তা আমি করবই। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য মাকে আর স্বর্গ থেকে মাটির ধুলোয় নেমে আসতে হবে না।"

—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

এক ব্রাহ্মণ আর এক ব্রাহ্মণী। তাঁদের একটি মেয়ে। মেয়েটি পরমাসুন্দরী। মেয়েটির নাম পুষ্পমালা। ডাগর হয়েছে, লেখাপড়া কিছু জানে এবং বেশ বুদ্ধিমতী। ব্রাহ্মণের ইচ্ছা এমন বুদ্ধিমতী মেয়ে আর এমন রূপবতী, তাকে বেশ বিদ্যাবতী করে তুলবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ বড় গরিব—বেশী বিদ্যা শেখাতে গেলে বড় পাঠশালায় দিতে হয়, সেখানে অনেক টাকা মাহিনা—সে মাহিনা তিনি কোথা থেকে দেবেন।

ব্রাহ্মণ একদিন রাজার পাঠশালার গুরুমশায়ের সঙ্গে দেখা করে বললেন,—আমার মেয়েটি লেখাপড়া শেখে, আমার বড় সাধ পণ্ডিতমশাই, কিন্তু পাঠশালার মাইনে দেবো এমন সংগতি আমার নেই!

পণ্ডিতমশাই বললেন,—তোমার মেয়েকে এনো। যদি দেখি তার বুদ্ধিসুদ্ধি আছে, তাহলে সে বিনা মাইনেয় পড়তে পাবে।

ব্রাহ্মণ পুষ্পমালাকে নিয়ে পাঠশালায় এলেন। মেয়েটিকে দেখে গুরুমশায়

বুঝলেন, মেয়েটি বুদ্ধিমতী। বিনা মাইনেয় পুষ্পমালাকে তিনি পাঠশালায় ভরতি করে নিলেন।

পুষ্পমালা নিত্য পাঠশালায় যায়। তার খুব বুদ্ধি। অন্য মেয়েরা পাঁচ দিনে যা শেখে, পুষ্পমালা তা শেখে এক দিনে।

পাঁচ বছরে পাঠশালার সব পাঠ শিখে পুষ্পমালা গুরুগৃহ থেকে বিদায় নেবার সময় গুরুমশায়ের পায়ের কাছে প্রণাম করে সরায় ভরে দুটি আলোচাল, সেই সরায় একটি পান, একটি সুপুরি, একটি পৈতা আর একটি টাকা রেখে বললেন,—দক্ষিণা নিয়ে আমায় বিদায় দিন, গুরুমশায়।

গুরুমশায় বললেন,—এ দক্ষিণায় হবে না বাপু!

পুষ্পমালা বললে,—এর বেশী দেবার সংগতি তো আমার বাবার নেই।

গুরুমশায় বললেন,—দক্ষিণার মতো দক্ষিণা দেবার সংগতি তোমার বাবার আছে—আমি জানি। পান-সুপুরির ফাঁকিতে আমি ভুলছি না!

পুষ্পমালা বললে,—বলুন, আপনি কি দক্ষিণা চান? আমার বাবাকে গিয়ে আমি বলবো।

গুরুমশায় বললেন,—তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে বলো তোমার বাবাকে। তবেই দক্ষিণা দেওয়া হবে।

এ কথা শুনে পুষ্পমালা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো। এক নিমেষ আর সেখানে দাঁড়ালো না, বাড়ি চলে এলো।

মলিন মুখ,—মেয়ে হাসে না, কারো সঙ্গে কথা কয় না। যেন কেমন হয়ে গেছে! মা বলেন,—মেয়ের কি হলো? লেখাপড়া শেষ করে বিদ্যা শিখে বাড়ি ফিরে এলো—মেয়ে যেন পাথরের পুতুল!

বাপ বললেন,—তাইতো, তোমার কি হয়েছে, পুষ্পমালা?

পুষ্পমালা কথা কয় না।

পাড়াপড়শীরা এসে বললে,—ভূতে পেয়েছে গো! বেশী লেখাপড়া শিখলে

চন্দ্রচূড়

ছেলে-মেয়েদের প্রথম-প্রথম ভূতে পায়! তুমি রোজা ডাকো, পুষ্পর মা। না হলে মেয়ে চিরজন্ম বোবা পুতুল হয়ে থাকবে!

পাড়াপড়শীর পরামর্শে রোজা এলো। অনেক মন্তর পড়লো, অনেক যাগযজ্ঞ হলো। মেয়ে কিছুতেই কথা কয় না। শেষে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রোজা বললে,—বুঝেছি ঠাকুর, এ একেবারে গুরুভূত। এ-ভূত ছাড়বে একটি কাজ করলে।

ব্রাহ্মণ বললেন,—কি কাজ?

রোজা বললে,—অমাবস্যার রাত্রে একলা কন্যাকে একশো আটটা জবাফুল নিয়ে শ্মশানে গিয়ে মা শ্মশানকালীর পূজো করতে হবে। কেউ তাঁর সঙ্গে যাবে না।

ব্রাহ্মণী বললেন,—পূজোর মন্তর?

রোজা বললে,—শুধু দুটি কথা···ওঁং ক্লীং! ব্যস্! চোখ বুজে শ্মশানে বসে সারারাত এই দুটি মন্ত্র আওড়াতে হবে, আর মাঝে-মাঝে নিজের মাথায় একটি করে জবাফুল দিতে হবে।···একশো আটটি জবাফুল চাই। ভোর হলে তবে পূজো শেষ। তারপর কন্যা ঘরে আসবেন, আমি জল-পড়া খেতে দেবো। তখন যেমন কন্যা তেমনি হবেন।

সেই ব্যবস্থাই হলো। অমাবস্যার রাত্রে পুষ্পমালা শ্মশানে চললো।

আর সকলে ভয়ে কাঁটা। পুষ্পমালার মনে ভয় নেই। সে তো জানে, তাকে ভূতে পায়নি। কিন্তু লজ্জায় গুরুর কথা কাকেও বলতে পারছে না। বেচারী কি করে, যে যা বলে, দায়ে পড়ে তাই শুনছে!

শ্মশানে এসে পূজো শুরু করতে তার বয়ে গেছে! শ্মশানে বসে সে ভাবতে লাগলো—লেখাপড়া তো আমি শিখলুম···এরপর কি করবো?

এখন সেই শ্মশানে ছিল ডাকাতদের আস্তানা। ডাকাতদের দলে আছে তারা আটজন। শ্মশানে মস্ত বটগাছের পিছনে এক গভীর গুহা। সেই গুহায় তারা চোরাই মালপত্র এনে জমা করে।

চন্দ্রচূড়

সে রাত্রে ডাকাতরা আটটা ভারী ভারী বাক্স মাথায় করে এসে হাজির। তাদের পায়ের শব্দ শুনে ভয় পেয়ে পুষ্পমালা গিয়ে আশ্রয় নিলে সেই বটগাছের পিছনে।

ডাকাতরা এলো। এসে নিঃশব্দে গুহায় নেমে আটটা বাক্স সেখানে রেখে আবার চলে গেল।

তারা চলে গেলে পুষ্পমালা পা টিপে টিপে গুহায় নামলো। নেমে দেখে গুহায় কতকগুলো দীপ জ্বলছে। দীপের আলোয় দেখে বড় বড় সব কাঠের বাক্স। অনেকগুলো বাক্স। বাক্সয় চাবি দেওয়া নেই।

পুষ্পমালা বাক্স খুললো। খুলে দেখে বাক্স একেবারে গহনায় ভরতি। সেই সব গহনা বার করে আঁচলে বেঁধে পুষ্পমালা শ্মশানে বসে রইলো। তারপর রাত পোহালে লোকজন ওঠবার আগে সে ফিরলো তার নিজের বাড়ি।

বাপ-মা তখনো ওঠেননি। গহনাগুলো তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে মাটির নীচে পুঁতে রেখে পুষ্পমালা মুখ-হাত ধুয়ে দাওয়ায় বসলো।

পরের দিন রাত্রে ডাকাতের দল গুহায় এসে দেখে বাক্স খালি !

সর্বনাশ ! কে এ-সবের সন্ধান পেলে ?

সন্ধান করতে করতে দেখে বাক্সয় রক্তের দাগ। বুঝলো, বাক্স যে লুঠ করেছে এ তার রক্ত, নিশ্চয় !

ভেবে তখন তারা বুদ্ধি বার করলো। একজন ডাকাত মলমের কৌটো নিয়ে দিনের বেলায় গ্রামে বেরুলো। পথে পথে সে হাঁকতে লাগলো,—মলম চাই ! কাটা ঘায়ের ভালো মলম। কাটা ঘা এ-মলমে বেমালুম জুড়ে যাবে। চাই, কাটা ঘায়ের মলম চাই !

এখন ব্রাহ্মণী দেখেছেন কাল রাত্রে শ্মশান থেকে পুষ্পমালা পা কেটে বাড়ি এসেছে। তিনি মলমওলাকে ডাকলেন।

মলমওলা এলো।

● সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

চন্দ্রচূড়

ব্রাহ্মণী বললেন,—কাল শ্মশান থেকে মেয়ে পা কেটে এসেছে। দিতে পারো তার মলম ?

ডাকাত চমকে উঠলো। তবে তো সন্ধান মিলেছে! ডাকাত বললে—সে মেয়ে ?

ব্রাহ্মণী বললেন,—হ্যাঁ, আমার মেয়ে।

মলম দিয়ে নিশানা পেয়ে ডাকাত মহা খুশী হয়ে চলে এলো।

ব্রাহ্মণী মেয়ের পায়ে মলম লাগিয়ে দিলেন।

রাত্রে পুষ্পমালার গা যেন কাঁটা! ডাকাতরা কি চুপ করে থাকবে? সন্ধান করবে না ?

কিছুতে আর তার ঘুম আসে না! হঠাৎ শুনলো দেওয়ালে শাবলের ঘা পড়ছে। চোখ বুজে আড়ষ্ট কাঠ হয়ে সে বিছানায় পড়ে রইলো।

সিঁধ দিয়ে ঘরে ঢুকলো আটজন ডাকাত। ঘরে ঢুকে দেখলে মেয়ে ঘুমোচ্ছে, তার ডান পায়ে মলম।

এ-ই তবে চোরের উপর বাটপাড়ি করে এসেছে! বটে!

খাসা রূপসী মেয়ে। ডাকাতরা বললে,—একে চুরি করে নিয়ে যাই, চ। বিয়ে করবো। বিয়ে করলে ডাকাতি করে রোজ রোজ ঘরে ফিরে আর রাঁধতে হবে না।

খাটিয়াসুদ্ধ পুষ্পমালাকে মাথায় করে আট ডাকাত ফিরলো জঙ্গলে। পুষ্পমালা খাটিয়ায় কাঠ হয়ে পড়ে আছে।

জঙ্গলে খাটিয়া নামিয়ে ডাকাতরা মহা খুশী! বললে,—এবারে রান্নাবান্নার যোগাড় দেখি, আয়।···

ঝোপের ওপাশে গভীর জঙ্গল। এ জঙ্গল থেকে বেরুনো—এ কি পুঁচকে মেয়ের কাজ!···নিশ্চিন্ত হয়ে ডাকাতরা চললো খাবারের সন্ধানে।

পুষ্পমালা যখন বুঝলো তারা অনেক দূর চলে গেছে, তখন সে উঠে বসলো। উঃ, অজগর জঙ্গল! সে গ্রামের পথ জানে না—বাড়ি ফেরবার উপায় ?

অথচ নিরুপায় হয়ে এখানে থাকলেও তো চলবে না। উপায় করতেই হবে এবং সে-উপায়, এই জঙ্গল ফুঁড়ে পালানো।

খাটিয়ার কাছে পড়ে ছিল মস্ত একখানা ছোরা। ছোরাখানা বুকের কাপড়ে লুকিয়ে পুষ্পমালা জঙ্গলের পথে চললো—যেদিকে ডাকাতরা গেছে ঠিক তার উলটো দিকে।

চলে চলে কত জঙ্গল যে পার হলো! তবু জঙ্গল আর শেষ হয় না! রাত জাগা, ভয়, ক্লান্তি—এসবের ভারে পুষ্পমালার শেষে এমন হলো যে পা আর চলে না। পা দুটিকে ঠেলে ঠেলে তবু সে চলে···চলে···

পিছনে হঠাৎ মানুষের গলার স্বর। পুষ্পমালার গায়ে কাঁটা দিলে। ঝোপঝাপ এমন যে নজর চলে না। কাকেও সে চোখে দেখতে পেলে না।

তবে স্বরে বুঝলে সেই ডাকাতদের গলা। তারাই কথা বলছে। তাদের কথা চলেছিল—

১ম ডাকাত—একরত্তি মেয়ে, কোথায় পালাবে?

২য়—কাছেই কোথাও আছে। সারা জঙ্গল আতিপাতি করে খোঁজ!

৩য়—পাহাড়ে মেয়ে!

৪র্থ—মেয়ে নয় তো, বাঘের ঘরে ঘোগ! আমরা লুঠপাট করে গয়নাগাঁটি আনি, আমাদের সে-গয়নাগাঁটি ও করবে লুঠ!

৫ম—ও-মেয়েকে আস্ত রাখা নয়!

৬ষ্ঠ—নিশ্চয়!

সর্বনাশ! পুষ্পমালার গা ছমছম করতে লাগলো। ওরা কথা কইছে—বেশী দূরে নয়। যদি তাকে দেখে ফেলে!

সে আর চলতে পারে না। চলবার শক্তি নেই। সামনে একটা ঘন ঝোপ। পুষ্পমালা সেই ঝোপের মধ্যে বসে রইলো।

বেলা তখন দুপুর। আট ডাকাত আট দিকে পুষ্পমালাকে খুঁজছে। খুঁজতে খুঁজতে একটা ডাকাত এলো একেবারে সেই ঝোপে পুষ্পমালার সামনে। দুজনে

চোখাচোখি। পুষ্পমালার বুকখানা ধড়াস করে উঠলো। কিন্তু ভয় করলে চলবে না। সাহস চাই—সাহস!

ডাকাত বললে,—তবে রে মেয়ের নিকুচি করেছে! সারা জঙ্গল আমাদের ঘোড়দৌড় করিয়েছ!

পুষ্পমালা বললে,—চুপ!

ডাকাত অবাক। বললে,—কেন? চুপ করবো কেন?

পুষ্পমালা বললে,—কথা আছে।

—কি কথা?

পুষ্পমালা বললে,—আমাকে বিয়ে করবে বলে এই বনে আমাকে এনেছ তো। তোমরা পুরুষমানুষ—নিজেরা রাঁধোবাড়ো—একটা বউ বিয়ে করলে সুবিধে হয়, বুঝি। তা আমি আটজনকে বিয়ে করবো না। স্বয়ং যে দ্রৌপদী তিনিও বিয়ে করেছিলেন পঞ্চ পাণ্ডবকে। অষ্ট পাণ্ডবের কথা পুরাণে নেই। তাই আমি বলি কি, আমি শুধু তোমাকে বিয়ে করবো। কি বলো?

খুশী হয়ে ডাকাত বললে,—বেশ!···

পুষ্পমালা বললে,—তাহলে চুপিচুপি তার আয়োজন করতে হবে।

এমন রূপসী কন্যা—তাকে বিয়ে করতে চাইছে! ডাকাত মহা খুশী হয়ে এগিয়ে এলো।

যেমন হাতের নাগাল আসা, অমনি ঘ্যাচ করে পুষ্পমালা ছোরাটা বসিয়ে দিলে ডাকাতের নাকে। ছোরা লাগবামাত্র নাকটা বেমালুম একেবারে কুচ! নাকের জ্বালায় ডাকাত সেইখানে পড়ে ছটফট করতে লাগলো। তার চিৎকারে বনের শেয়ালগুলো ভয় পেয়ে হুক্কা-হুয়া হুক্কা-হুয়া রবে এমন চ্যাচানি ধরলো যে কান পাতা দায়।

সে গোলমালে পুষ্পমালা ঝোপঝাড়ের আড়াল দিয়ে সরে পড়লো। ভাগ্য ছিল প্রসন্ন। পুষ্পমালা গ্রামে এলো। তারপর নিজের বাড়ি।

মেয়ে পেয়ে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী মহা খুশী।

চন্দ্রচূড়

পুষ্পমালা বললে,—খুশী হচ্ছো কি! যে কাণ্ড হয়েছে—বিলক্ষণ ভয় আছে!

ব্রাহ্মণ বললেন,—কিসের ভয় রে?

নাকের জ্বালায় ডাকাত সেইখানে পড়ে ছটফট করতে লাগল। [পৃঃ ১১৫

পুষ্পমালা বললে,—পরে বলবো। এখন খুব সাবধান! রাজার কাছে নালিশ জানিয়ে এসো, বাবা। বলবে, একটা সেপাই চাই। ডাকাত শত্রু।

ব্রাহ্মণ মানুষ রাজদ্বারে গিয়ে মিনতি জানাতে রাজা সেপাই দিলেন। ইয়া জোয়ান সেপাই—এ্যায়সা তার গালপাট্টা! আর হাতে যে অস্ত্র—দেখলে চমকে উঠতে হয়!

সাত ডাকাত বার বার ব্রাহ্মণের বাড়ির কাছে আসে—মুখ চুন করে চলে যায়। রাজার সেপাই হাতিয়ার নিয়ে পাহারা দিচ্ছে···টুঁ শব্দ করলে দলকে-দলসুদ্ধ এখনি গ্রেফতার করবে!

তখন তারা এক বুদ্ধি বার করলো!

একজন ডাকাত এলো ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে; এসে বললে,—মা-শ্মশানকালীর পূজা হবে সামনের অমাবস্যা

● সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

রাত্রে। মায়ের স্বপ্নাদেশ হয়েছে, তোমার ঘরে আছে পুষ্পমালা কন্যা—তাকে বনে গিয়ে মায়ের নামগান করতে হবে।

ব্রাহ্মণ মহা খুশী। মেয়ের উপর মা-কালীর এমন অনুগ্রহ!

মেয়ে পুষ্পমালা বললে,—বেশ, আমি যাব, যখন মায়ের আদেশ। কিন্তু আমার সঙ্গে ষোলজন যন্ত্রী যাবে। তারা ষোল রকম বাদ্য বাজাবে।

ব্রাহ্মণবেশী ডাকাত বললে,—বেশ!

অমাবস্যার দিন সকালে পুষ্পমালা রাজপুরীতে চললো। বৃদ্ধ রাজা সভায় বসে আছেন। পুষ্পমালা এসে রাজার পায়ে পড়ে নিবেদন জানালো,—বিপদে পড়েছি মহারাজ! ব্রাহ্মণকন্যা আমি···আপনার সাহায্য চাই।

মেয়েটিকে দেখে রাজার মনে মমতা হলো! তিনি বললেন,—কি হয়েছে মা, বলো···

পুষ্পমালা বললে,—গোপনে বলব, মহারাজ···

তাই হলো। সভাসদরা সভা ছেড়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন। পুষ্পমালা তখন গুরুমশায়ের দক্ষিণা চাওয়া থেকে শুরু করে সব কথা রাজার কাছে খুলে বললে।

শুনে রাজা বললেন,—হুঁ! এমন তোমার সাহস!···ডাকাতের সঙ্গে সমানে টক্কর দিচ্ছ! আমার কাছে আগে কোনোদিন নালিশ জানাওনি! বেশ, আমি সাহায্য করব···তুমি যেমন বলবে।

পুষ্পমালা বললে,—আজ রাত্রে জঙ্গলের ধারে আপনার সমস্ত সেনা যেন মজুত থাকে, মহারাজ। জঙ্গলে শঙ্খধ্বনি হবামাত্র তারা যাবে। ডাকাতের দল তখনি গ্রেফতার হবে।

সেদিন রাত্রে ষোলজন যন্ত্রী নিয়ে পুষ্পমালা চললো জঙ্গলের কালীমন্দিরে। যন্ত্রীরা জনে-জনে মস্ত পালোয়ান। তাদের হাতে রইলো বাদ্যযন্ত্রের বাক্সে লুকানো ধারালো অস্ত্রশস্ত্র।

সাত ডাকাত মস্ত দল জড়ো করেছে। ওদের দলে সাত দশে সত্তর জন লোক।
পুষ্পমালা বললে,—বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে শঙ্খধ্বনি করে মাকে ডাকবো। তোমরা সকলে চোখ বুজে মায়ের রূপ ধ্যান করো।

ডাকাতের দল তখনি চোখ বুজলো।

পুষ্পমালা শঙ্খধ্বনি করলো—বার বার সাতবার শঙ্খধ্বনি!

চকিতে অট্টরবে চারিদিক কাঁপিয়ে তীরের গতিতে ঘোড়ায় চড়ে সশস্ত্র রাজ-সৈন্যেরা এসে হাজির।

হঠাৎ এতগুলি রাজসৈন্য! ডাকাতরা এর জন্য তৈরী ছিল না। কাজেই ডাকাতের দল হলো বন্দী। তারপর···

রাজা খুশী হয়ে পরের দিন ভোরে পুষ্পমালার বাড়ি এলেন। এসে ব্রাহ্মণকে বললেন,—একটা ভিক্ষা আছে, ঠাকুর!

ব্রাহ্মণ অবাক। ভাবলেন, তিনি স্বপ্ন দেখছেন বুঝি!

রাজা বললেন,—আপনার এই বিদ্যাবতী বুদ্ধিমতী কন্যা পুষ্পমালাকে আমি ভিক্ষা চাই। যুবরাজের সঙ্গে এর বিয়ে দেবো। এমন বিদ্যাবতী বুদ্ধিমতী মেয়েই রানী হয়ে সিংহাসনে বসবার যোগ্য। কোনোদিন মোগল পাঠান যদি রাজ্য আক্রমণ করতে আসে, তাহলে রানী পুষ্পমালার বুদ্ধিতে পরাস্ত হবে।

ব্রাহ্মণের দুচোখে জলধারা। ব্রাহ্মণ ডাকলেন,—ব্রাহ্মণী···

ব্রাহ্মণী এলেন। শুনে বললেন,—এমন ভাগ্য আমার পুষ্পমালার! মহারাজ তাকে আদর করে বধূ করবেন!

রাজা বললেন—বিদ্যাবতী ও বুদ্ধিমতী মেয়ের আদর হবে না তো কার আদর হবে? নির্গুণ রূপসী মেয়ের—যার সঙ্গে মাকালফলের এতটুকু তফাত নেই?

———

জ্যোতিষী

—মুরারিমোহন বিট

কাজলগড়ে আজ চাঞ্চল্য জেগেছে।

শহর থেকে দূরে গাছপালায় ঢাকা, মেঠোপথ আর খড়োঘরে সাজান ছবির মত কাজলগড়। বৈচিত্র্যহীন গ্রাম্যজীবন। বছরে একবার মাত্র চৈত্রমাসে বুড়োশিবের মেলা উপলক্ষে কাজলগড়ের চেহারা যায় পালটে। তখন যেন আর চেনাই যায় না কাজলগড়কে। আশপাশের পাঁচসাতটা গ্রাম থেকে বহু লোক পায়ে হেঁটে এবং গরুর গাড়িতে করে আসে মেলা দেখতে। সাতদিন মেলা চলে, তারপর আবার ঝিমিয়ে পড়ে কাজলগড়······আবার একঘেয়ে জীবনযাত্রা ঢিমে তালে এগিয়ে চলে।

সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত চৈত্র মাসের এখনো অনেক দেরি। মোটে ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি এখন। হঠাৎ কাজলগড়ে আজ একজন জ্যোতিষীর আবির্ভাব হয়েছে, তাই এত চাঞ্চল্য। ছেলে বুড়ো আর মেয়ে-মহলের মধ্যে ধুম পড়ে গেছে ভাগ্যের গোপনকথা জানবার জন্য।

চন্দ্রচূড়

বৈচিত্র্যহীন জীবনযাত্রায় বৈচিত্র্য এসেছে। সকলেই ভাবছে, হাতটা একবার জ্যোতিষীমশাইকে দেখালে মন্দ হয় না!

গাঁয়ের মোড়লদের একজন, নাম বিশ্বম্ভর—কায়েতমশাই বলেই তাঁকে সকলে ডাকে—তিনি তাঁর বহু পুরাতন কোঠাবাড়ির বাইরের দাওয়ায় বসতে জায়গা দিয়েছেন জ্যোতিষীমশাইকে। সিমেন্টের দাওয়ায় চকখড়ি দিয়ে রাশিচক্রের ছক কেটে, করতলের ছবি এঁকে এবং পাশে একটা করকোষ্ঠীর বই খুলে রেখে বসেছে লোকটা। জরাজীর্ণ কঙ্কালসার চেহারা। আর তাকে ঘিরে নানা বয়সের মেয়ে-পুরুষেরা বসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভিড় বাড়ছে ক্রমশঃই। লোকজনের মধ্যে ফিসফিসিয়ে কথাবার্তা হচ্ছেঃ ইনি নাকি বিরাট গণৎকার! ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সব এঁর নখদর্পণে!

জ্যোতিষী প্রৌঢ়।

লোকটা আজই এসেছে কাজলগড়ে। গতকাল সে এসময় ছিল কোলকাতা মহানগরীতে। কোলকাতায় বিধান সরণী ও বিডন স্ট্রীটের সংযোগস্থলে হেদুয়া পার্ক। ঐ পার্কের কোলে ফুটপাথের ওপর লোকটাকে বসে থাকতে দেখা যেত। সামনে করতলের ছবি আর রাশিচক্রের ছক এঁকে চুপচাপ বসে থাকত। কখনো-সখনো কোন কোন পথচারী হয়তো তার সামনে বসে পড়ে ডানহাতটা এগিয়ে দিয়ে ভাগ্যের কথা কিছু জানতে চাইত। নরহরি জ্যোতিষশাস্ত্রের কিছুই জানে না—তবু বুঝে-সুঝে কিছু কিছু জবাব দিয়ে পারিশ্রমিক বাবদ কারুর কাছ থেকে দু আনা, কারুর কাছ থেকে বা চার আনা পয়সা নিত।

এই ছিল নরহরির রোজগারের পথ।

বরিশাল জেলার কোনও এক অখ্যাত গ্রামের বাসিন্দা ছিল সে। যা সামান্য কিছু জমিজমা ছিল তাতেই দুটি প্রাণীর সচ্ছল জীবনযাত্রা নির্বাহ হত। সে আর তার দশবছরের মেয়ে খুকী। নিজের বলতে ঐ একমাত্র মেয়ে ছাড়া তার আর কেউ বেঁচে ছিল না।

তারপর হঠাৎ একদিন হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষে সারা দেশময় দাবানল জ্বলে উঠল। নিজের নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য তখন সকলেই উন্মাদ। আত্মীয়-স্বজন,

চন্দ্রচূড়

বন্ধু-বান্ধব এমন কি নিজের ছেলে-মেয়েরা পর্যন্ত কে কোথায় গেল তা ভেবে দেখবার মত অবস্থা তখন কারো ছিল না—এমন তাণ্ডব শুরু হয়েছিল! সেই সংঘর্ষের ঘূর্ণিপাকে পড়ে হঠাৎ একসময় নরহরি আবিষ্কার করল যে তার খুকী নেই—সে একেবারে একা! খুকী! কোথায় গেল সে? বেঁচে আছে তো? ভগবান, হে দয়াময় ঈশ্বর, খুকীকে তুমি রক্ষা করো—সে যেন কষ্ট না পায়।

নরহরির দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। এই অশ্রুকে সম্বল করেই বাকী জীবনটা কাটাবার জন্য সে এসে হাজির হল হিন্দুস্থানে—কোলকাতা শহরে।

অনেক চেষ্টা-চরিত্র করেও একটা সুবিধামত কাজ যোগাড় করতে পারল না নরহরি। দিনের পর দিন চেষ্টা করেও সে ব্যর্থ হল। তারপর হঠাৎ একদিন দেখা গেল, রাশিচক্রের নকশা কেটে, হাতের ছবি এঁকে, আর কপালে রক্তচন্দনের তিলক কেটে সে বসেছে হেদুয়া পার্কের সামনে ফুটপাথের ওপর।

সাতটা বছর কেটে গেছে তারপর। হেদুয়ার সামনে দিয়ে দিনে প্রায় দশবার যাতায়াত করি। মহেন্দ্র গোস্বামী লেনে আমার আস্তানা। যখনই ওখান দিয়ে যাই, তখনই একবার দৃষ্টি পড়ে নরহরির ওপর। কখনো কখনো দেখি কারো হাত দেখছে, তবে বেশির ভাগ সময়ই দেখি কোনও একদিকে নিষ্পলক নয়নে চেয়ে চুপচাপ বসে আছে। দিনের শেষে যা কিছু উপায় হয়, তা দিয়েই সে কোনরকমে ক্ষুধার জ্বালা নিবৃত্ত করে। তবে ভরপেটা খাওয়া কোনদিনই জোটে না—আধপেটা বা সিকিপেটা জোটে।

চুপচাপ বসে বসে সে নিশ্চয় ভাবে তার দুর্ভাগ্যের কথা, খুকীর কথা। খুকী কি বেঁচে আছে আজও? এ প্রশ্নের জবাব নিজের মন থেকেও সে পায় না।

সূর্য পশ্চিম আকাশে অনেকখানি নেমে গেছে। পার্কে লোকজনের ভিড় বাড়ছে। কলহাস্যে মুখরিত পার্ক। আর তার ঠিক পাশেই নরহরি উদরে ক্ষুধার জ্বালা নিয়ে মলিন ছিন্ন বসনে বসে বসে ভাবছে তার অদৃষ্টের কথা······ভাবছে তার মেয়ের কথা······

চন্দ্রচূড়

ছাতাবগলে একটা লোক এসে দাঁড়ায় তার সামনে। দেখলেই বোঝা যায় গ্রামের লোক। লোকটা নরহরির সামনে বসে শুধাল,—হাত দেখতে কত নেন?

—দু আনা।

খিদের জ্বালায় নরহরির পেটের মধ্যে মোচড় দিচ্ছে। কাজ মিটে যাওয়ার পর দু আনা পয়সা পেয়েই সে ছুটল তেলেভাজার দোকানে। এক আনার মুড়ি আর এক আনার পিঁয়াজের বড়া কিনে যেই দু পা এগিয়েছে, অমনি একটা কলার খোসায় পা হড়কে আছাড় খেল ফুটপাথের ওপর। তার দুর্বল কণ্ঠ থেকে শুধু একটা অস্ফুট আর্তনাদ বেরুল,—আঃ!

মুড়ি আর তেলেভাজা ছড়িয়ে পড়েছে পথে। নিজের দেহটাকে টেনে তুলে সে যখন উঠে দাঁড়াল, তখন দুটো কুকুর ছড়িয়ে-পড়া খাবারগুলো খেতে শুরু করে দিয়েছে। নরহরি অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল ওদের খাওয়া।

রাত প্রায় দুটো।

আজ সারাদিন পেটে কিছু পড়েনি নরহরির। খিদের জ্বালায় ঘুম নেই চোখে। পার্কটার পাশে একটা গাড়িবারান্দা আছে, প্রায় রাতে ওখানেই শোয় নরহরি। আরও দু-একজন শোয়—তারা নাক ডাকাচ্ছে।

নরহরি জেগে আছে।

এভাবে কোন মানুষ বাঁচতে পারে? অসম্ভব! তবে কি আত্মহত্যা করবে? নাঃ, মরবার সাধ নেই নরহরির। নিয়তি যখন টেনে নেবে, তখন তো যেতেই হবে —স্বেচ্ছায় যাবে না সে। তবে? বাঁচা যায় কেমন করে?

উঠে বসে নরহরি। রক্ত গরম হয়ে গেছে। একটা ফন্দি মাথায় এসেছে। হ্যাঁ, হাত দেখেই সে টাকা রোজগার করবে। তবে কোলকাতায় তা সম্ভব নয়—যেতে হবে কোন অজ পাড়াগাঁয়ে।

ভাবতে ভাবতে পুবের আকাশ ফিকে হয়ে আসে। পার্কের গাছগুলোর

● মুরারিমোহন বিট

চন্দ্রচূড়

শাখায় শাখায় সদ্যজাগা পাখিদের পাখা ঝাপটানোর আওয়াজ আর তাদের কিচির-মিচির ডাক কানে আসে।

ভিড় জমে উঠেছে বেশ।

মাত্র দুঘণ্টা হল নরহরি কয়েতমশায়ের দাওয়ায় এসে বসেছে। এরই মধ্যে তাকে ঘিরে মেয়ে-পুরুষের যেরকম ভিড় জমে উঠেছে, তাতে নরহরি বোঝে যে, এতদিন পর সে যথার্থ জায়গায় এসে পৌঁছেছে। হয়ত এবার সে দুবেলা দুটো পেটভরে খেতে পাবে।

কিন্তু ভিড় দেখে আনন্দে আত্মহারা হলে চলবে না। হস্তরেখা বিচারের কিছুই জানে না সে—স্রেফ্ ধাপ্পাবাজি। যখন যেরকম বোঝে, সেই রকমই বলে দেয়। তবে সে বুঝেছে, এভাবে চললে তার পক্ষে দাঁড়ান অসম্ভব। উন্নতির বনিয়াদকে সুদৃঢ় করতে হলে তার গণনার এমন এক আশ্চর্য ক্ষমতা দেখাতে হবে, যাতে সারা কাজলগড় এবং তার আশপাশের গ্রামগুলো বিশ্বাসে ও শ্রদ্ধায় তার সামনে মাথা নোয়ায়। উপায় সে ভেবেই রেখেছে, শুধু সুযোগের অপেক্ষা! এক-একবার মনে দ্বিধা জাগে—পাপ-পুণ্য বিচারের দ্বিধা। কিন্তু বাঁচতে হলে ওসব মনের মধ্যে ঠাঁই দিলে চলবে না। সাতটা বছর তো দেখল, কি হল?

এখানে বলে রাখা ভাল যে, নরহরি নিজের নাম-ধাম গোপন করে গেছে কাজলগড়ের বাসিন্দাদের কাছে।

কায়েতমশাই হুকো টানছেন নরহরির পাশে বসে। সেখানে আরও ক'জন আছে। বোসবাড়ির ঝি আশালতাও এসেছে নিজের ভাগ্যের খবর জানতে। খুবই অল্প বয়স আশালতার। সতের-আঠার হবে। অবিবাহিতা। শীর্ণ চেহারা। কায়েতমশাই তাকে দেখে ব্যঙ্গ করে বললেন,—কিরে, তুইও হাত দেখাবি নাকি? রাজরানী হতে পারবি কিনা, জানতে চাস বুঝি? চার আনা প্রণামী, আর একটা চাল-ডালের 'সিধে' লাগবে—দুবেলা দুটো ভাত জোটে না পেটে, পরের বাড়ি ঝি-গিরি করিস্, তোদের এত শখ হলে চলবে কেন?

আশালতা লজ্জায় কুঁকড়ে ওঠে।

নরহরি তাকাল আশালতার দিকে। কি যেন একটু ভেবে জিজ্ঞেস করল,—কোথায় থাক তুমি?

আশালতা নরহরির সামনে বসে হাতটা এগিয়ে দেয়।

কায়েতমশাই আঙুল দেখিয়ে বললেন,—ঐ তো সামনে ঘর। ঐ যে তালগাছটার গোড়ায় চালাটা…বাবুই-এর বাসা রয়েছে গাছটায়……

—তোমার আর কে কে আছে?—নরহরি সুধাল আশালতার দিকে চেয়ে।

আশালতা বলল,—কেউ নেই আমার নিজের বলতে।

—তুমি একাই থাক?

—না, এক বুড়ী থাকে আমার কাছে। ঐ যে উনি—

নরহরি চেয়ে দেখে পথের ধারে গাছতলায় লাঠি হাতে নিয়ে একজন জরাজীর্ণ বৃদ্ধা বসে আছে।

আবার কি যেন ভাবল নরহরি, তারপর বলল,—কাছে এস, হাতটা দেখি তোমার।

আশালতা নরহরির সামনে বসে হাতটা এগিয়ে দেয়। একনজর দেখেই মুখে অস্ফুট শব্দ করল নরহরি—ইস্!

● মুরারিমোহন বিট

চন্দ্রচূড়

আশালতা শঙ্কিত নয়নে তাকায় নরহরির মুখের দিকে। কায়েতমশায়ের কানেও গেছে শব্দটা। শুধোলেন,—ব্যাপার কি ?

নরহরি তাঁর কথার কোন জবাব না দিয়ে আশালতাকে বলল,—নাঃ, তেমন কিছু নয়। তোমার ভাগ্যের উন্নতি হতে এখনো অনেক দেরি।

আশালতা চলে গেলে নরহরি কায়েতমশায়ের দিকে চেয়ে বলল,—আজ রাতের মধ্যেই মারা যাবে মেয়েটা !

সমবেত নারী-পুরুষ স্তম্ভিত হয়ে যায়। সকলেই চমকে উঠল। নরহরি সকলের উদ্দেশ্যে বলল,—কিন্তু আপনারা দয়া করে একথা এখন প্রচার করবেন না। আপনারাই যা জানলেন—আর যেন কেউ না জানে এখন।

সন্ধ্যার ঘণ্টা দুয়েক পরেই কাজলগড় যেন ঘুমিয়ে পড়ে। লোকজনের সাড়াশব্দ বড় একটা পাওয়া যায় না আর। গাছপালার ফাঁক দিয়ে, বাঁশের বেড়ার মধ্যে দিয়ে এক-একটা লণ্ঠনের মিটমিটে আলো নজরে আসে শুধু। ঐ যে দূরে তালগাছটার গোড়ায় আশালতার মাটির কুঁড়েটা—ঐ কুঁড়ের দাওয়াতেও একটা লণ্ঠন জ্বলছে। নরহরি একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে ঐদিকে।

ঢং ঢং ঢং······

অনেকটা দূর থেকে পেটাঘড়ির আওয়াজ আসছে। বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে আওয়াজটা ছড়িয়ে পড়ছে আকাশে-বাতাসে দূর থেকে দূরান্তরে······

কাজলগড়ের পাশেই স্বর্ণগাঁ। স্বর্ণগাঁয়ের মুসলমান পাড়ায় একটা মসজিদ আছে। ঐ মসজিদে পেটাঘড়ি বাজে। দিনের বেলা আওয়াজটা কানে আসে না—রাতে শোনা যায়।

নরহরি ঘড়ির আওয়াজটা গুনতে লাগল,—এক দুই তিন······

রাত্রি এগারোটা। কোনদিকে এতটুকু আলোও নজরে পড়ছে না আর। কাজলগড়ের মানুষ আর জেগে নেই।

চন্দ্রচূড়

সময় হয়েছে। আর অপেক্ষা করার দরকার নেই। নরহরি সন্তর্পণে এসে দাঁড়াল আশালতার কুঁড়েটার সামনে। নিজের দেহটার আপাদমস্তক চাদরে জড়িয়ে নিয়েছে। সারা শরীরটা কাঁপছে তার। ফিরে যাবে নাকি? পরক্ষণেই মনে সে শক্তি সঞ্চয় করে,—না, না, ফিরে যাবে কেন? সামান্য একটা রোগা-পটকা মেয়েকে গলা টিপে খুন করতে পারবে না সে? খুব পারবে।

একটু চেষ্টা করতেই ঘরের দরজাটা নিঃশব্দে খুলে যায়। নরহরি সতর্কপদে ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করল। এক কোণে একটা লণ্ঠন মিটমিট করে জ্বলছে। সেই ক্ষীণ আলোয় নরহরি দেখতে পেল ঘরটার দুপাশে দুজনে ঘুমুচ্ছে—আশালতা আর সেই বুড়ী। দুজনেই অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

নরহরি আশালতার নিদ্রিত দেহটার পাশে গিয়ে হাত দুটো এগিয়ে নিয়ে যায় গলাটা টিপে ধরবার জন্য। কিন্তু কী বিপদ! হঠাৎ তার হাত দুটো কাঁপতে লাগলো থরথর করে।

একটু অপেক্ষা করে সামলে নিল নিজেকে। তারপর—

তারপর প্রাণপণে সে দুহাতে চেপে ধরল আশালতার কণ্ঠনালী।

সারা কাজলগড়ে হইচই পড়ে যায়। লোকটা মানুষ না দেবতা? এমন জ্যোতিষীর কথা তারা ইতিপূর্বে কেউ শোনেনি। লোকটা বলেছিল রাতের মধ্যেই অপঘাতে মৃত্যু হবে আশালতার। অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে সেকথা। সকাল-বেলা গাঁয়ের সকল লোক সভয়ে বিস্ময়ে দেখল আশালতা তার ঘরের বিছানায় মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছে। তার গলায় কতকগুলো আঙুলের দাগ সুস্পষ্ট। বুড়ী অঘোরে ঘুমুচ্ছিল, সে এসবের বিন্দুবিসর্গও টের পায়নি।

শুধু কাজলগড় নয়—একটা দিনের মধ্যে বহু দূরের গ্রামগুলোর মধ্যেও একথা রাষ্ট্র হয়ে গেল। দলে দলে লোক নরহরির কাছে আসতে লাগল ভাগ্য-গণনার

জন্যে। নরহরি একবার মাত্র হাতের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে যা খুশী বলে দেয়, লোকেও তাই পরম বিশ্বাসে মেনে নেয়।

দিন যায়।

নরহরি একচ্ছত্র সম্রাটের মত কায়েতমশায়ের বারান্দা জাঁকিয়ে বসে থাকে। লোকজন আসে প্রচুর…আয়ও হয় প্রচুর।

সেদিন বিকেলবেলা।

নরহরির কাছে ভিড় জমেছে বেশ। মহিলার সংখ্যাই বেশী। সহসা নরহরির কানে এমন একটা কথা পৌঁছাল, যার পরবর্তী কথাগুলো শুনবার জন্য সে উভয় কর্ণকে সজাগ রাখল ঐদিকে। কথাটা হচ্ছিল দুজন স্ত্রীলোকের মধ্যে।

তারপর প্রাণপণে নরহরি দুহাতে চেপে ধরল আশালতার কণ্ঠনালী। [পৃঃ ১২৬

একজন মহিলা পাশের গাঁ থেকে এসেছেন, তিনি এ গাঁয়ের পরিচিত একটি মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন,—আচ্ছা ভাই শুনলাম ইনি নাকি এ গাঁয়ের একটা মেয়ের হাত দেখে বলেছিলেন, মেয়েটা রাতের মধ্যেই মারা যাবে……

এ গাঁয়ের মহিলাটি বললেন,—তুমি ঠিকই শুনেছ দিদি। ইনি মানুষ নন দেবতা! পরের দিন সকালে দেখা গেল মেয়েটা মরে পড়ে আছে!

চন্দ্রচূড়

ভিন গাঁয়ের মহিলা চোখ বড় বড় করে বললেন,—তোমরা ভাই দেখলে নিজের চোখে ?

—তবে আর বলছি কি দিদি! গাঁয়ের সবাই দেখেছে। এমন কথা ক'জন জ্যোতিষী হাত দেখে বলতে পারে বল ? লোকে-লোকারণ্যি সেদিন।

তারপর অনুশোচনার সুরে বললেন,—আহা! মেয়েটি কিন্তু বড় ভাল ছিল ভাই। পরের বাড়িতে ঝি-গিরি করলে কি হয়, অমন ঠাণ্ডা, অমন ভাল মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। কোন্ পাষণ্ড যে ওকে অমন করে গলা টিপে মারল!

—বিধির লিখন কি খণ্ডাবার উপায় আছে ভাই!

—সে কথা সত্যি। কিন্তু বড় অল্প বয়সে মরে গেল মেয়েটা—তাই বড় কষ্ট হয়। মেয়েটার আর কেউ ছিল না সংসারে। পাকিস্তানে হিন্দু-মুসলমানে যখন দাঙ্গা বাধে, তখন মেয়েটা পালিয়ে এসেছিল এদেশে। ওর বাপও ছিল। কিন্তু সেই দাঙ্গার মধ্যে বাপ-বেটীর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। তোমরাও তো ঐ অবস্থায় পড়েছিলে দিদি। তবে ভগবানের দয়ায় তোমরা যে সকলে একজোট হয়ে আসতে পেরেছ, এতো কম সুখের কথা নয়!

পূর্ববঙ্গের বাসিন্দা হিসাবে সাধারণ কৌতূহল বশেই জিজ্ঞেস করেন ভিন গাঁয়ের মহিলা,—পূর্ববঙ্গে কোথায় থাকত মেয়েটি ?

—শুনেছি বরিশালের চাঁদগাঁয়ে।

নরহরি এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল ওঁদের কথাবার্তা। এবার তার মুখ দিয়ে আচমকা বেরিয়ে এল—চাঁদগাঁয়ে ?

প্রত্যেকেই তাকাল নরহরির মুখের দিকে। মহিলাটি বললেন,—হ্যাঁ ঠাকুর-মশাই, মেয়েটির মুখেই শুনেছি, ওদের বাড়ি ছিল চাঁদগাঁয়ে। মেয়েটি সব কথাই আমাকে বলেছিল। ওর বাবার নাম ছিল নরহরি সাহা।

নরহরির চোখের সামনে গাঢ় অন্ধকার নেমে আসে। সারা পৃথিবীটা ঘুরতে শুরু করেছে। পায়ের নীচের মাটি দুলছে। ভূমিকম্পের দোলা এল নাকি ?...ওঃ, কী করেছে সে! নিজের মেয়েকে গলা টিপে হত্যা করেছে! তার সেই খুকীকে ?

● মুরারিমোহন বিট

একটা বাঘে আমার—বাবা-মাকে খেয়ে ফেলেছে। [পৃঃ ১৩২

চন্দ্রচূড়

সহসা বিকট শব্দে হেসে ওঠে নরহরি—হাঃ-হাঃ-হাঃ!

সমবেত সকলে জ্যোতিষী-ঠাকুরের ঐরকম বিদকুটে হাসি দেখে ঘাবড়ে যায়। কায়েতমশাই অবাক্ হয়ে শুধোলেন,—কি হল ঠাকুরমশাই, হাসছেন কেন অমনভাবে?

নরহরি আবার হাসে,—হাঃ-হাঃ-হাঃ!

নরহরি এখন বদ্ধ উন্মাদ।

নরহরি এখন বদ্ধ উন্মাদ। ছেঁড়া এক টুকরো কাপড় পরে বড় বড় দাড়ি-গোঁফ নিয়ে সে ঘুরে বেড়ায় কাজলগড়ের পথে পথে। কিন্তু সন্ধ্যার পর থেকে সারারাত ওর দেখা পাওয়া যায় আশালতার কুঁড়ে ঘরটার দাওয়ায়। বসে বসে বিড়বিড় করে কি সব বকে। কখনো কাঁদে, কখনো বা হাসে। এক একদিন গভীর নিশুতি রাতে ওর কান্নার আওয়াজ পাওয়া যায়! কী করুণ সে কান্না……কী মর্মন্তুদ সে কান্না……

———

স্বামী ভ্যাবলানন্দ

—কুমারী মঞ্জু ঘোষ

ভ্যাবলাদা বলল, জানিস নন্তু সে এক ব্যাপার।

চোখগুলো আধুলির মত করে ভ্যাবলাদা প্রায় মিনিট তিনেক চেয়ে রইল আমাদের দিকে। আমি আর নিতাই মুখের ফাঁকটাকে ঠিক সুয়েজ খালের মত করে ভ্যাবলাদার দিকে চেয়ে রইলুম।

—তারপর কি হল ভ্যাবলাদা ?—নিতাই ঢোক গিলল।

ঠ্যাংএর উপর ঠ্যাং তুলে বেশ যুত করে বসে ভ্যাবলাদা নবাবী চালে শুরু করল তার স্বর্গের গল্প ঃ

আমাকে দেখে দেবরাজ ইন্দ্র বললেন, তুমি এসেছ ভালই করেছ। এখান থেকেই তোমার খেলা দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছি। তাই ভাবছিলুম তুমি যদি এমনিতে না আস তাহলে যমরাজকে বলব তোমার আয়ু কমিয়ে দিতে। যাক এসেছ যখন তখন এবার থেকে আমাদের সেণ্টার ফরোয়ার্ডে তুমিই খেলবে।

চন্দ্রচূড়

নাকে এক টিপ নস্য গুঁজে ভ্যাবলাদা আবার বলল, সেকথা শুনে আমি মাথায় হাত দিয়ে পড়লুম ; তাইতো এখন কি হবে ?

আমার অবস্থা দেখে দেবরাজ আঁতকে উঠে বললেন, কি হল ? অমন করে বসে পড়লে কেন ?

আমি বললুম, আমার খেলার বুটটা আনতে ভুলে গিয়েছি।

দেবরাজ আশ্বস্ত হলেন। গালে হাত দিয়ে বললেন, ওমা তাও জান না বুঝি এখানে খালি পায়ে খেলা হয়।

দেবরাজের মত আমিও আশ্বস্ত হলুম। দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর ইন্দ্রপুরীতে। সে কি জায়গা বুঝলিরে নন্তু, সে ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। চারদিকে শুধু ফুল আর ফল। পথ চলতে মাথায় ঠেকে নানারকমের ফুল ও ফল। নাকের কাছে কানের পাশে দুলতে থাকে কাঁচা পাকা কত রকমের বৃক্ষপুত্র। বৃক্ষপুত্র কি জানিস, ফল, ফল।

আমার জিবে প্রায় জল এসে গিয়েছিল। কোন রকমে সামলে নিয়ে বললুম, তুমি গোটাকয়েক নিয়ে এলে না কেন ভ্যাবলাদা ? এখানে একটা ফলের বিজনেস করা যেত। স্বর্গীয় ফল, লোকে একেবারে লুফে নিত, দেখতে দেখতে একেবারে রকফেলার।

ভ্যাবলাদা পাগলা কুকুরের মত খেঁকিয়ে উঠল, আমার বুঝি প্রেস্টিজ নেই ! জানিস প্রথম যেদিন মাঠে নামলুম খেলতে, ভ্যাবলাদা তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পালটাল ঃ আমাকে দেখার জন্য কী ভিড় ! ওখানেও আবার স্টেডিয়ামের প্রবলেম। খেলা শুরু হবার আগে প্রায় মিনিট পনের ধরে হাজারখানেক অটোগ্রাফই দিয়ে দিলুম। আর ফটোগ্রাফারদের তো কথাই নেই। যেদিকে তাকাই শুধু ক্লিক ক্লিক শব্দ। শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলে মাঠে এসে হাজির হলুম।

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, ওখানে আবার ফটোগ্রাফার অটোগ্রাফারদের পেলে কোথায় ?

ভ্যাবলাদা একমুখ হেসে নিয়ে বলল, ওমা তাও জানিস না বুঝি। এখানে যে সব ফটোগ্রাফাররা পটল তোলে ওখানে গিয়ে আবার তারা ফটোগ্রাফারই হয়।

● স্বামী ভ্যাবলানন্দ

চন্দ্রচূড়

তাই বুঝি!—কথার শেষে নিতাই বিরাট একটা টান দিল।

ভ্যাবলাদা আবার শুরু করল ঃ সে কী খেলা! চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। সারা মাঠটায় যেন দামামা বাজতে শুরু হল।

খেলা শেষ হবার মাত্র মিনিট তিনেক আগে তিনটে গোল দিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলুম। দেবরাজ ইন্দ্র সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে একটা ছোট কাল পাথর দিয়ে বললেন, এই পাথরটার নাম মন্ত্রশক্তি পাথর। দুচারটে মন্ত্র পড়ে এই পাথরটা ছোঁয়ালেই যা ইচ্ছে তাই করা যাবে। বলে, দেবরাজ ইন্দ্র কানে কানে মন্ত্রটা বলে দিলেন।

আমি বললুম, কি মন্ত্রটা শিখেছ বল না ভ্যাবলাদা।

ভ্যাবলাদা চোখ পাকিয়ে বলল, না। তোদের মত বাচ্চা ছেলেকে বললে সব শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে।

ভ্যাবলাদা পকেট থেকে একটা চকচকে কালো পাথর বের করে আমাদের সামনে মেলে ধরল।

আমি তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে ওটা ছুঁতে গেলুম।

ভ্যাবলাদা লাফিয়ে উঠল ঃ আহা ছুঁস না, ছুঁস না।

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললুম, কেন, কি হবে?

ভ্যাবলাদা গম্ভীরভাবে জবাব দিল, হাফবামুনেরা হাত দিলে ওর সমস্ত শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে।

—তার মানে? আমি আড়চোখে তাকালুম ভ্যাবলাদার দিকে ঃ আমরা হঠাৎ হাফবামুন হতে যাব কেন?

—আলবাৎ, ভ্যাবলাদা রকের উপর চাপড় মেরে বলল, যাদের গলায় পৈতে অথচ পরনে হাফ প্যাণ্ট থাকে তাদের হাফবামুন ছাড়া আর কি বলব বল?

আমি ভীষণ রেগে গেলুম। ভাবলুম ভ্যাবলাদাকে গোটাকয়েক রামবুলি শুনিয়ে দিই। কিন্তু ভ্যাবলাদার রামগাঁট্টার ভয়ে চেপে গেলুম।

ভ্যাবলাদা হঠাৎ ফড়িংএর মত তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল। আমরা চেয়ে রইলুম ভ্যাবলাদার দিকে।

● কুমারী মঞ্জু ঘোষ

চন্দ্রচূড়

একটা ঘুড়ি কেটে গিয়েছিল। সেটাকেই লক্ষ্য করে ভ্যাবলাদা ছুটছিল। হাত দশেক গিয়েই হঠাৎ একটা বিরাট ইটেতে হোঁচট খেয়ে ভ্যাবলাদা হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

ব্যস্, সেই যে পড়ল মিনিট তিনেক কোনো সাড়াশব্দই পেলুম না ভ্যাবলাদার।

অবশেষে নিতাই এসে ভ্যাবলাদাকে চিত করিয়ে দিল।

—নিশ্চয়ই ভ্যাবলাদা জ্ঞান হাইরে ফ্যালচে। নিতাই তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে উচ্চারণ করল।

ভ্যাবলাদার কপালের একপাশটা গোলআলুর মত ফুলে গেছে, আর নাকটাও সামনের দিকে লুচির ফুলকো হয়ে উঠেছে।

নিতাই বলল, ভ্যাবলাদার মুঠোর মধ্যে পাথরটা রয়েছে, ওটা ছোঁয়ালে হয় না?

আমি বললুম, কেমন করে হবে? আমরা যে হাফবামুন।

···নাকটার এ কি অবস্থা হল রে!

অগত্যা আমরা দুজনে চ্যাংদোলা করে ভ্যাবলাদাকে নিতাইদের রোয়াকে এনে শোয়ালুম। নিতাই বাড়ি থেকে এক কুঁজো জল এনে ভ্যাবলাদার মাথায় ঢেলে দিল।

খানিকটা বাদেই ভ্যাবলাদা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল, নাকে হাত দিয়ে বলল, আহা আমার এমন অশোককুমারের মত নাকটার এ কি অবস্থা হল রে!

● স্বামী ভ্যাবলানন্দ

চন্দ্রচূড়
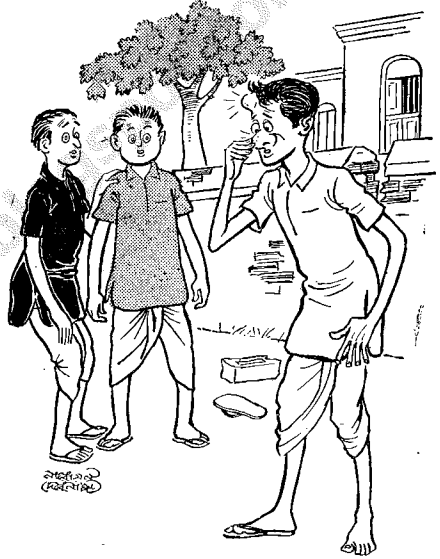
আমি বললুম, ভ্যাবলাদা, কি করতে ছুটলে ঐ ঘুড়িটার পিছনে। মিছিমিছি কপালটা ফোলালে।

ভ্যাবলাদা চোখ কটমট করে আমার দিকে তাকাল: কে বলল আমি ঐ ঘুড়িটার পেছনে ছুটেছিলাম? বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ শুনতে পেলুম, দেবরাজ ডাকছেন। তাই অমনি করে ছুটতে গিয়ে পড়ে গেলুম।

আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, দেবরাজ তোমায় কি বললেন?

—কি আর বলবেন। বললেন মাঝে মাঝে চিঠি দিও। আমার জন্য উনি নাকি বড় চিন্তায় আছেন।

* * * *

আমি বললুম, ভ্যাবলাদা, তুমি যখন এতই শক্তির অধিকারী তখন এক কাজ কর, একটা আশ্রম-টাশ্রম খুলে বস। তাহলে দুপয়সা রোজগার করা যাবে।

ভ্যাবলাদা বেশ কিছুটা ভেবে নিয়ে গদাইলশকরি চালে বলল, কথাটা মন্দ বলিস নি নন্তু। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে ঘরটর তো একটা যোগাড় করতে হবে।

নিতাই বলল, সেজন্য কিচ্ছু ভেবো না ভ্যাবলাদা, আমাদের বৈঠকখানায় অনায়াসে তোমার আশ্রম করা যেতে পারে।

অবশেষে ভ্যাবলাদা সায় দিল।

আমি অমনি সাইনবোর্ড লিখতে বসে গেলুম।

"স্বামী ভ্যাবলানন্দ আশ্রম"

স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র প্রদত্ত এক অত্যাশ্চর্য পাথর দ্বারা মানবসমাজের সমুদয় অভাব দূরীকরণ। এই অত্যাশ্চর্য পাথর দ্বারা জীবিতকে মৃত এবং মৃতকে জীবিত, বৃদ্ধকে শিশুতে এবং শিশুকে বৃদ্ধে পরিণত করা হয়। আজই সাক্ষাৎ করুন। প্রবেশ মূল্য মাত্র পাঁচ টাকা। সাক্ষাতে ফল প্রাপ্ত হইলে স্বামীজিকে উপযুক্ত দক্ষিণা দিতে হইবে।

লেখাটা ভ্যাবলাদার সামনে মেলে ধরলুম। আমার পিঠের উপর একটা থাপ্পড়

● কুমারী মঞ্জু ঘোষ

বসিয়ে ভ্যাবলাদা বলল, বেড়ে লিখেছিস তো! নে তাড়াতাড়ি টাঙ্গিয়ে দে। আমি চললুম মেকআপ করতে।

* * * *

ঘণ্টাখানেকের ভিতরই একটা ছোটখাট ভিড় জমে গেল। সবাই একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল নিতাইদের বৈঠকখানার সামনে। কিন্তু বেশী দূর আর কেউ এগোতে পারল না। প্রবেশমূল্যের উপর চোখ পড়তেই হোঁচট খেল সবাই। আমি একবার ভিতরে গিয়ে ভ্যাবলাদার কানে কানে ফিসফিস করে বললুম, প্রবেশমূল্যটা কমিয়ে দেব ?

ভ্যাবলাদা ঘাড় নাড়লঃ উঁহু খবরদার কমাস না। তাহলে সবাই আসতে চাইবে।

শেষ পর্যন্ত একটা খদ্দের এসে জুটল। বিশাল ভুঁড়ি নিয়ে ভদ্রলোক একেবারে আমার সামনে এসে হাজির হলেন।

হেঁড়েগলায় বললেন, মশাই ? আপনারা নাকি মরা মানুষ জ্যান্ত করেন ?

আমি মাথা চুলকে বললুম, কিন্তু তার জন্য দক্ষিণে চাই।

মোটা ভদ্রলোক ভুঁড়ি নাচিয়ে বললেন, তার জন্য কিচ্ছু ভাবতে হবে না। কিন্তু আমার দুলাখ টাকার সম্পত্তিটা পেলেই হল।

—তার মানে ? আমি টেরিয়ে তাকালুম ভুঁড়িধারীর দিকে।

—ব্যাপারটা তাহলে খুলেই বলি কি বলেন ? বলেই ভদ্রলোক কোলা ব্যাংএর মত থপ্ করে মাটিতে বসে পড়লেন। তারপর একটু দম নিয়ে বললেন, আমার বাবার দুলাখ টাকার সম্পত্তি আছে। তিনি বলেছিলেন মরার আগেই সমস্ত সম্পত্তি আমার নামেই লিখে দেবেন। কিন্তু কাল রাত্রে হঠাৎ করোনারি থ্রম্বোসিসে তিনি মারা গেছেন। তাই মহাসমস্যায় পড়ে আপনাদের কাছে ছুটে এলুম। স্বামী ভ্যাবলানন্দ যদি এখন কৃপা করে বাবাকে একবার বাঁচিয়ে দেন, তাহলে উইলটা লিখিয়ে নিই।

আমি বললুম, কিন্তু তাঁর বয়স কত ছিল ?

—মাত্র পঁচানব্বুই। ভদ্রলোক ঠোঁট ফোলালেন।

চন্দ্রচূড়

আমি বললুম, তাহলে তো আর জ্যান্ত করা যাবে না। তবে মিনিট পনের তাঁকে বাঁচিয়ে রাখা যেতে পারে।

ভুঁড়িধারী তাতেই সম্মত হলেন।

—কিন্তু স্বামীজির সঙ্গে একবার দেখা করতে পারলে হত।

—বেশ চলুন।

গেটে উপবিষ্ট নিতাইএর হাতে পাঁচ টাকা গুঁজে দিয়ে ভদ্রলোক আমাকে অনুসরণ করলেন।

ঘরের ঠিক মাঝখানে জটাধারী ভ্যাবলাদার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়লেন মোটা লোকটি। ভ্যাবলাদার পরনে গেরুয়া। সারা গা ছাই দিয়ে ঘষা। সামনে একটা রুপোর ছোট্ট থালায় সেই মহাশক্তিশালী পাথরটি রয়েছে। সমস্ত ঘরটা ধূপ আর ধুনোয় ভরতি হয়ে গেছে।

ভদ্রলোক বললেন, আমার একটি নিবেদন আছে গুরুদেব।

—কি নিবেদন? বেশ টেনে টেনে বলল ভ্যাবলাদা।

—আমার বাবাকে মাত্র পনের মিনিটের জন্য বাঁচিয়ে দিন।

—কত বয়স? ভ্যাবলাদার গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর।

—মাত্র পঁচানব্বুই।

—কিসে মারা গেছেন?

—করোনারি থ্রম্বোসিস।

—কি সর্বনাশ! ভ্যাবলাদা যেন আঁতকে উঠল।

—কেন? চমকে উঠলেন ভদ্রলোক।

—ওসব রোগে মরলে লোকে নরকে যায়।

—তার মানে?

—তার মানে যারা বেশী কঞ্জুস হয় তারাই নাকি ওই রোগে মারা যায়।

—তা হলে আমার দুলাখ টাকার সম্পত্তি সম্পূর্ণ বেহাত হয়ে যাবে? ভদ্রলোকের কণ্ঠে হতাশা।

● কুমারী মঞ্জু ঘোষ

চন্দ্রচূড়

—তাহলে একমাত্র উপায় হচ্ছে ওঁকে নরক থেকে তুলে আনতে হবে। তার জন্য অবশ্য খরচ পড়বে অনেক।

—কত ?

—প্রায় হাজার পনের।

—তাই দেব গুরুদেব।

ভদ্রলোক চলে গেলেন তাঁর বাবার মরদেহ আনতে। খানিকটা বাদেই আবার তিনি ফিরে এলেন। খাটিয়ার উপর একটা সাদা চাদরে ঢাকা ওঁর বাবার অস্থিচর্মসার চেহারা দেখে আমি প্রায় আঁতকে উঠলাম।

ভ্যাবলাদা আমাকে ইশারায় ডাকল ঃ এই শোন।

আমি ভ্যাবলাদার পাশে এসে বসলুম। ভ্যাবলাদা আমার কানে ফিসফিস করে বলল, ঘরটায় ভালো করে ধুনো দিয়ে দে, বুঝলি।

আমি তার কথামতই কাজ করলাম। সারা ঘরটা ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেল। ভ্যাবলাদাকে একেবারে দেখাই গেল না।

ভ্যাবলাদা এবার জোরগলায় বলল, আপনি এবার স্থির হয়ে বসুন। আপনার বাবা এখান থেকে কথা বলবেন। মন দিয়ে শুনুন।

ভদ্রলোক স্থির হয়ে বসলেন। আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম পরবর্তী দৃশ্যের জন্য। ধোঁয়ায় কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। তবু তার ভিতর থেকেই আন্দাজ করতে চেষ্টা করলুম ভ্যাবলাদার অস্তিত্বটা। কিন্তু ঘন ধোঁয়ায় কাউকেই দেখা গেল না।

হঠাৎ ভ্যাবলাদার গলা ভেসে এল ঃ শুনুন। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা কাগজে লিখে নিন। লেখা হয়ে গেলে আপনি হাত বাড়িয়ে কাগজটা দেবেন, আমি আপনার বাবাকে দিয়ে সই করিয়ে নেব।

—কিন্তু আমি যে, আপনাকে একেবারে দেখতে পাচ্ছি না, ভদ্রলোক বললেন।

—কোন দরকার নেই। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

প্রায় মিনিট দুয়েক বাদে ওপাশ থেকে ভেসে এল একটা বয়স্ক লোকের ভারী

চন্দ্রচূড়

গলা ঃ "আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি আমার একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ সন্তোষকে দিয়ে গেলুম।"

এবার ভ্যাবলাদা বলল, দিন কাগজটা, সই করিয়ে নিই।

ভদ্রলোক হাতটা বাড়ালেন কিনা বোঝা গেল না। তবে ভ্যাবলাদা যে ওঁর বাবাকে দিয়ে ওটা সই করিয়ে নিলেন এটা যেন শুনতে পেলুম।

আমি ধোঁয়া ছেড়ে ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ালুম।

কাগজটা পকেটে পুরে বাবার মরদেহ নিয়ে চলে যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক। আমি বললুম, গুরুদেবের দক্ষিণেটা তো দিলেন না।

—ওঃ! জিবটা এক হাত বের করে মা কালীর মত দাঁড়ালেন তিনি। তারপর পকেট থেকে একটা টাকার তোড়া বের করে বললেন, এতে দশ হাজার আছে, বাকিটা পরে পাঠিয়ে দেব।

আমি কিছু বলার আগেই ভদ্রলোক ব্যাঙাচির মত পাশ কাটালেন।

ভদ্রলোক চলে গেলে ভ্যাবলাদা আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

—কত টাকা দিল রে?

—মাত্র দশ হাজার।

—বাকিটা?

—পরে দেবে বলেছে।

আমি ভয়ে ভয়ে ভ্যাবলাদার দিকে তাকালুম। হঠাৎ বাইরে থেকে একটা হইচই ভেসে এল।

ভ্যাবলাদা টান হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, দেখ তো কিসের গণ্ডগোল হচ্ছে।

আমি দরজার কাছে এসে দাঁড়ালুম। দেখলুম, এর মধ্যেই বিরাট একটা লাইন দাঁড়িয়ে গেছে। একেবারে সামনে একটা বাহাত্তুরে বুড়ো লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নিতাইয়ের সঙ্গে বচসা শুরু করেছে। আর নিতাই বেচারা গলদ্‌ঘর্ম হয়ে তাকে প্রাণপণে বোঝাতে চেষ্টা করছে।

বুড়ো বলছে, কেন তোমরা সাইনবোর্ড দিয়েছ? আমি যা চাইছি তা করতেই

● কুমারী মঞ্জু ঘোষ

চন্দ্রচূড়

হবে। আমি নিতাইয়ের পাশে এসে দাঁড়ালুম। বুড়ো এবার আমার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

—তোমরা সব এক একটা ভণ্ড জোচ্চোর। বাহাত্তুরে বুড়ো তার হাতের লাঠিটা বারকয়েক আমার নাকের সামনে নাড়িয়ে নিলে।

আমি বললুম, আহা কি হয়েছে। তাই বলুন না?

বুড়ো বলল, আমি দশবছরের খোকা হতে চাই। তা ও বলছে হবে না। এদিকে সাইনবোর্ডে দিব্যি লিখেছ ছেলেকে বুড়ো এবং বুড়োকে ছেলেতে পরিণত করা হয়।

আমি একবার আড়চোখে সাইনবোর্ডটার দিকে তাকালুম। সত্যিই তো তাই। আমারই হাতের লেখা ওখানে জ্বলজ্বল করছে। পরক্ষণেই আবার সাহস ফিরে পেলুম, ভয় কি—আমাদের ভ্যাবলাদা তো নিজেই বলেছে তার সেই অত্যাশ্চর্য পাথর দিয়ে সব কিছুই করা যায়। তবে?

লাঠিটা বারকয়েক আমার নাকের সামনে নাড়িয়ে নিলে।

—টাকা এনেছেন? আমি বললাম।

—নিশ্চয়ই। কত চাই বলুন। বুড়ো তার ফতুয়ার পকেটে হাত ঢোকাল।

আমি বললুম, তাহলে ভিতরে চলে আসুন।

চন্দ্রচূড়

বুড়ো এবার একটু নরম হয়ে বলল, একটু তাড়াতাড়ি চল বাবা। ডাক্তারে বলেছে আমি নাকি আর ঘণ্টা দুয়েক বাদেই হার্টফেল করব।

বাহাত্তর বছরের বুড়োকে সঙ্গে করে আমি বাইশ বছরের ভ্যাবলাদার সামনে হাজির হলুম। সব কথা শুনে ভ্যাবলাদা বলল, কি সর্বনাশ!

—তার মানে? বুড়ো হুলো বেড়ালের মত নাক ফুলিয়ে তাকাল।

ভ্যাবলাদা ঢোঁক গিলল, তার মানে খুব জটিল কেস এনে হাজির করেছেন।

—তাহলে তুমি পারবে না? বুড়ো গম্ভীর গলায় শুধোল।

—তুমি নয় আপনি—আমি সঙ্গে সঙ্গে শুধরে দিলুম।

—আহা তাই না হয় হল। বুড়ো সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল।

ভ্যাবলাদা বলল, খরচ পড়বে অনেক, বাহাত্তর থেকে একেবারে দশে নামতে হবে তো।

—কত লাগবে শুনি?

—তা আন্দাজ হাজার দশেক তো বটেই।

—বেশ তাই দেব। এখন কাজ শুরু করুন তো—

ভ্যাবলাদা বলল, টাকা না দিলে আবার—

কথা শেষ হবার আগেই বুড়ো ভ্যাবলাদার হাতে একটা টাকার বাণ্ডিল গুঁজে দিল: এই নিন, এতেই দশ হাজার আছে।

ভ্যাবলাদা টাকার বাণ্ডিলটা পকেটে পুরে বলল, নন্তু, একটু ধুনো দিয়ে দে তো রে। ভালো করে দিবি। যমরাজা স্বয়ং আসছেন। ওঁকে বলে কয়েই তো এজ্‌টা কমাতে হবে। আর আপনি ওখানেই বসে পড়ুন।

বুড়ো সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ল। আমি সারা ঘরটায় বেশ করে ধুনো দিয়ে দিলুম। সারা ঘরটা ধোঁয়ায় ভরতি হয়ে গেল। বুড়ো যে কোথায় আছে তা মোটেই দেখতে পেলুম না। শুধু মাঝে মাঝে বুড়োর কাশির শব্দ কানে আসতে লাগল। আর কিছুক্ষণ এরকম থাকলে বুড়ো বোধ হয় অক্কাই পাবে।

আমি চাইতে চেষ্টা করলাম সেই ধোঁয়ার মধ্যে দিয়েই। কেমন করে যমরাজ

● কুমারী মঞ্জু ঘো

এসে বুড়োকে খোকা করে দেবে তাই দেখার জন্য আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলুম আমি।

অনেকক্ষণ কাটল এইভাবে। হঠাৎ আমার কানের কাছে কে যেন একটা রামচিমটি দিল। আমি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে চেঁচাতে চেষ্টা করতেই সঙ্গে সঙ্গে কে যেন মুখে হাত চাপা দিয়ে দিল। চেয়ে দেখলুম ভ্যাবলাদা।

চোখদুটো পাকিয়ে ভ্যাবলাদা ফিসফিসিয়ে বলল, শীগ্‌গির চলে আয়।

আমি অবাক হয়ে গেলুম : তার মানে ?

—পরে বলবখন। বলেই বিরাট একটা হ্যাঁচকা টান মারল ভ্যাবলাদা। আমাকে ধোঁয়ার মধ্যে দিয়েই টেনে নিয়ে চলল।

খানিক বাদে আমার টনক নড়ল। আমি বললুম, আরে এ যে নিতাইদের খিড়কির রাস্তা—

ভ্যাবলাদা চুপ। খানিকবাদেই আবার বললুম, কিন্তু নিতাইকে তো নিয়ে এলে না ভ্যাবলাদা।

—ও রাস্তায় অপেক্ষা করছে ট্যাক্সি নিয়ে—ভ্যাবলাদার থমথমে গলা।

—ট্যাক্সি নিয়ে ? আমি থমকে দাঁড়ালুম।

ভ্যাবলাদা আমার গতিক দেখে একটু ভারীগলায় বলল, এসব পাথর-টাথর মিথ্যে। আর স্বর্গে যাওয়ার ঘটনা তোদের যা বলেছি তা সম্পূর্ণ গুল। স্রেফ টাকা রোজগার করার জন্যই এই ফন্দিটা এঁটেছিলাম। তাড়াতাড়ি চলে আয়। ওরা আমাদের মতলব বুঝতে পেরেছে এতক্ষণে। আমাদের সামনে পেলে আর আস্ত রাখবে না।

আমি বললুম, কোথায় যাবে ?

—অ্যাডভেঞ্চারে। এই কুড়ি হাজার টাকা নিয়ে দেশবিদেশে ঘুরে বেড়াব।

—তাই ভালো। আমি গদগদ হয়ে বললুম। আর দ্বিরুক্তি না করে আমি ভ্যাবলাদাকে অনুসরণ করলাম।

রাস্তায় নেমে দেখি নিতাই ট্যাক্সি নিয়ে অপেক্ষা করছে। আমাদের দেখে

নিতাই বলল, তাড়াতাড়ি পাইলে চল ভ্যাবলাদা। ওরা এতক্ষণে পুলিসে খবর দিচে।

আমরা তিনজনে মোটরে এসে উঠলাম। একগাদা ধোঁয়া ছেড়ে মোটরটা স্টার্ট দিল।

আমি এতক্ষণে ভ্যাবলাদার দিকে ঘুরে তাকালুম। সত্যি তোমার ব্রেন আছে ভ্যাবলাদা। ভ্যাবলাদার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললুম। ভ্যাবলাদা আর ফিরেও তাকাল না। কেবল হেরে যাওয়া সৈনিকের মত মুখে চোখে পরাজয়ের গ্লানি মেখে মুচকি হেসেই কাজ সারল।

খোকার দোকান

—শ্রীনীরদচন্দ্র মজুমদার
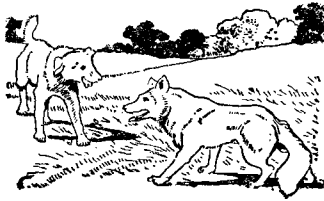
"একটা মাত্তর ছোট ভাই, তাকে দুটো ডাল-ভাত তুই খেতে দিতে পারবি নে, নিখিল ?"

"কী করে পারব ? ঐ তো মাইনের দুশোখানি টাকা সম্বল ! নিজের কাচ্চা-বাচ্চা হয়েছে, দায়-অদায় রয়েছে !"

মায়ের চোখ দিয়ে অনেক জলই ঝরল সেদিন, কিন্তু নিখিলেশের মন গলল না। আসলে মা-ভাইকে বাড়িছাড়া করতে না পারলে সে একটুখানি হাত-পা মেলে বসবারই ঠাঁই পাচ্ছে না।

গজগজ নিখিল অনেকদিনই করছে ; কিন্তু বুড়ো বাবাটা বেঁচে থাকতে সুবিধে করতে পারে নি কোনমতেই। যোগেশবাবু, মারা যাবার তিন দিন আগে পর্যন্ত মুদীর দোকানের খাতা লিখে গিয়েছেন ; রোজগার সামান্যই ছিল, কিন্তু তিনি এবং তাঁর স্ত্রী

চন্দ্রচূড়

বগলা দুজনেই ছিলেন একাহারী ; ছোট ছেলেটা দুবেলা খেত বটে, কিন্তু তাহলেও এই তিন জনের খাওয়া খরচ পঞ্চাশের উপর উঠতে পারে না, একথা একদিন যোগেশবাবু খতিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন বড় ছেলেকে।

"তোমার ভুল হয়েছে দাদামণি,…

"বেশ !"—ফুঁসে উঠেছিল নিখিল—"পঞ্চাশই যদি হয়, তাই বা তোমার কই ? আয় তো ঐ মুদীর দোকানের ত্রিশ টাকা !"

যোগেশবাবু হাঁ করে তাকিয়ে ছিলেন বড় ছেলের দিকে ; মিনিট দশেকের ভিতর সে-হাঁ তিনি বোজাতে পারেন নি।

কিন্তু মুখের-মত জবাব বুড়ো বাপের মুখে না যোগালেও ছোট ভাইয়ের মুখে যুগিয়ে গেল। সে বাইরে ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল, কখন এসে বাপের পিছনে দাঁড়িয়েছে, যোগেশ বা নিখিলেশের তা নজরে পড়ে নি। নজরে পড়ল, যখন চোখ ছোট করে ঠোঁট উলটে সে বলে উঠল—"তোমার ভুল হয়েছে দাদামণি, মুদীর দোকানের ত্রিশ টাকা ছাড়াও বাবার আর-একটা আয় আছে, বাবা সেটা হাতে করে নেন না বটে কোনদিন, কিন্তু ঐ ত্রিশ টাকার সঙ্গে সেটাও মাস-মাস তোমারই হাতে জমা হচ্ছে। হিসেবই যখন হচ্ছে, তখন সেটার কথা ভুললে চলবে কেন ?"

● শ্রীনীরদচন্দ্র মজুমদার

চন্দ্রচূড়

আরও একটা আয় ? নিখিলের হাতে জমা ?—ছোঁড়াটা ইয়ারকি করতে এসেছে, অ্যাঁ ! চোখ পাকিয়ে নিখিল চেঁচিয়ে উঠল—"তুই যে হেঁয়ালিতে কথা কইছিস রে ছোঁড়া ! মারব এক চড়, দাঁতের পাটি উপড়ে দেব !"

"হেঁয়ালি-টেয়ালি নয় দাদামণি, সাফ হিসেবের কথা। তুমি যে ঘরখানাতে আছ, তার ভাড়া আজকের বাজারে কত হয়, হিসেব করে দেখেছ ? মুদীর দোকানের ত্রিশের সাথে ওটা জুড়ে নাও, দেখবে বাবার আর দেনা থাকছে না তোমার কাছে, উলটে বরং—"

তারপর হাঁ করার পালা এসেছিল নিখিলের। এমনধারা কথা যে এ-বাড়িতে কেউ তাকে বলতে পারে, স্বপ্নেও এমনটা সে ভাবতে পারে নি কোনদিন।

যোগেশবাবু বেঁচে থাকতে নিখিলেশ আর ঘোঁট পাকায় নি এসব নিয়ে ; মনের কথা মনেই রেখেছিল। এইবার বাপটি মরে যেতেই ঝোপ বুঝে কোপ মেরেছে ; মাকে ডেকে বলে দিয়েছে পষ্টো কথা—বারো বছরের বুড়ো ভাইকে সে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে পারবে না।

"তাহলে ও খাবে কী ?"—মায়ের জিজ্ঞাসা।

"আমি তার কী জানি ? তবে বাড়ির অংশটা ছেড়ে দিক, দুহাজার টাকা দাম ধরে তারই দরুন আমি পাঁচ বছর ওকে খাওয়াচ্ছি"—নিখিলেশের উত্তর।

কথা শুনে পরমেশ হেসে ফেলল।

দাদার মনে যে এই ছিল, তা অনেক আগেই সে আন্দাজ করেছে। ছেলেমানুষ হলে কী হয়, পরমেশ মানুষ চেনে।

"ও যা বলছে, তা-ই না হয় কর !" মা কেঁদে বলেন—"না করে আর উপায় কী ? এখন পাঁচ বছর তো খা ! ততদিনে তুই একটু বড় হবি, না থাকে বাড়ি নেই, কাজকম্মো করে নিজের দায় নিজে সামলাতে পারবি।"

পরমেশ ভাবল্ল সারাদিন। রাত্রে বলল—"তা করে কাজ নেই। খাওয়ার জন্য বাড়ি ঘোচাতে রাজী নই আমি। আর লেখাপড়া করিয়ে নিতে পারলে তারপর ও খেতে দেবে বলেও ভরসা করিনে মা ! তার চেয়ে বরং—"

চন্দ্রচূড়

"বরং ?"—বারো বছরের ছেলের মুখে পাকা কথা শুনে অবাক হয়ে যান বগলা, শুনতে চান তার মতলবের কথা।

"তার চেয়ে বরং নগদ দুহাজার টাকা ফেলে দিক ও। আমরা বাড়ির অংশ বেচে দিচ্ছি।"

"তারপর ? যাবি কোথায় ?"

"বস্তিতে একটা কুঠরি ভাড়া নেব ; বিড়ি বাঁধব। তোমার আমার একবেলার ভাত আমি জুটিয়ে নেব দেখো। টাকাটা খরচ করব না ; উকিল-জেঠার হাতে জমা রাখব দু-এক বছরের জন্য। বিড়ির কাজটা শিখে নিয়ে ঐ টাকায় দোকান করে বসব—দেখ না ! আমি তোমার অকম্মা ছেলে নই মা !"

ব্রজ উকিল ওদের পড়শী, অতি সাধু লোক। সাধু বলেই ওকালতিতে সুবিধে করতে পারেন নি। অবশ্য তার জন্য তাঁর কষ্ট নেই কিছু ; অবস্থা বেশ ভাল। বাপের আমলের বড় বাড়ি রয়েছে, নীচের তলাটা ভাড়া দিয়ে যা পান, তাইতেই তাঁর ছোট্ট সংসারটুকু ভালই চলে যায়।

বগলা গিয়ে তাঁকে বললেন সব।

"পরমেশ এই পরামর্শ দিচ্ছে ?"—চমৎকৃত হয়ে প্রশ্ন করলেন ব্রজবাবু। "আমাকে গোড়ায় জিজ্ঞাসা করা হলে আমিও এই একই কথা বলতাম যে ! ও যদি খাটতে পারে, এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কিছু হতে পারে না।"

ব্রজ উকিল মাঝখানে এসে পড়াতে নিখিল আর নিজের মতলব হাসিল করতে পারল না। সে চেয়েছিল মা-ভাইকে কিছুদিন শাক-চচ্চড়ি ভাত খাইয়ে বাড়ির দাম শোধ করবে। নগদ দুহাজার টাকা ফেলে দেবার ইচ্ছে তার ছিল না মোটেই।

আর নগদ দুহাজার টাকা তার নেইও তো ! মাইনে নিখিল দুশোর উপরেই পায়, তা ঠিক। সংসারে পুষ্যিও তার বেশী নয়, এটাও ঠিক। কিন্তু তবু তার হাতে জমে না এক পয়সাও। পয়লা তারিখে মাইনে নিয়ে বাড়ি ঢুকতেই নিখিল যে-লোকটিকে দোরগোড়ায় মোতায়েন দেখতে পায় সে হল পাড়ারই গোপাল

● শ্রীনীরদচন্দ্র মজুমদার

স্যাকরা। মাস-মাস একশো টাকা তার বরাদ্দ ; একখানা গয়নার পাওনা মিটিয়ে পেলেই সে আর-একখানা গয়না দিয়ে যায়, এই রকমই বন্দোবস্ত তার সাথে। পাড়ার মেয়েমহলে জোর গুজব—কমসে-কম দশ হাজার টাকার সোনাদানা আছে নিখিলের ঘরে।

কিন্তু নগদ টাকা নেই! নিখিল ভাবনায় পড়ল। ব্রজ উকিল বলে পাঠালেন —'নিখিল বাড়ি নিতে হয় তো নিক, তা না হলে অন্য খদ্দেরও রয়েছে।'

বাধ্য হয়ে নিখিলকে টাকা যোগাড় করতে হল। বাড়ির অদ্ধেকটা অন্য লোকে নিয়ে নেবে, এ যে কল্পনাও করা যায় না!

দুচার দিনের ভিতরই নিখিল পৈতৃক বাড়ির ষোল-আনার মালিক হয়ে বসল। নাবালক পরমেশের তরফ থেকে দলিল সই করে দিলেন বগলা।

চোখের জল ফেলতে ফেলতে বগলা স্বামীর ভিটে থেকে বেরিয়ে গেলেন, ছোট্ট বারো বছরের ছেলেটার হাত ধরে।

বস্তির কামরা আগে থেকেই ঠিক করা ছিল ; সেইখানে মাকে বসিয়ে পরদিন থেকেই এক বিড়িওয়ালার কাছে কাজ শিখতে শুরু করল পরমেশ।

মাস ছয়েক যায়।

রাত নটা নাগাদ বস্তির ঘরে ফিরে উঠোন থেকেই ডাক দিল পরমেশ—"টাকা দুটো ধর মা, আমি একেবারে গা-হাত-পা ধুয়ে আসি কল থেকে।"

আজকাল দিনে দুটাকা মজুরী পায় পরমেশ।

ছেলের ডাক শুনে কেরোসিনের লম্পটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন বগলা। মিটমিটে আলোতেও পরমেশের যেন মনে হল মায়ের মুখখানা থমথম করছে। "কী হয়েছে মা?"—ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল সে। বস্তিবাড়ি ঘরে ঘরে ঝগড়াঝাটি লেগেই আছে। তার মায়ের সঙ্গে অবশ্য কারো বাধে না, তবু বলা তো যায় না! অঘটন ঘটবার জায়গা যদি থাকে, তবে সে হল এই বস্তি। এখানকার বাসিন্দারা অদ্ধেক হল বেপরোয়া, অদ্ধেক হল মরিয়া। ঝগড়া এরা বিনা কারণেই বাধায়, আর কারণ থাকলে তো খুন করতেও রাজী।

চন্দ্রচূড়

"কী হয়েছে মা ?" ভয়ে ভয়ে তাই জানতে চাইল পরমেশ।

"না, এমন কিছু নয়।" জামাটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে বগলা বললেন—"হাত-মুখ ধুয়ে আয়, শুনতে পাবি এখন। বিশেষ কিছু নয়।"

বিশেষ কিছু নয় তো মায়ের মুখের চেহারা অমন থমথমে কেন ? তবে ও নিয়ে আর কথা বাড়াল না পরমেশ, গামছাখানা টেনে নিয়ে চলে গেল কলের দিকে।

ফিরে যখন এল, তখন বগলা রান্নাঘরে। সেখান থেকেই ডাকলেন—"খেতে দিয়েছি খোকা। এদিকে আয়।"

এই আর এক খটকা। রাত্রে রুটি তৈরি করা থাকে ; শোবার ঘরে বসেই পরমেশ তা খায়। আজ রান্নাঘরে খাওয়াবার বন্দোবস্ত কেন ? শোবার ঘরে কী হল ?

ঘরে ঢুকতেই বগলা বললেন—"ওঘরে বসে আছেন আমাদের উকিলবাবু। বেড়াতে এসেছেন, মানে আমাদের খোঁজখবর নিতে এসেছেন। তা তুই খেয়ে নে, তারপর কথা কইবি এখন।"

উকিলবাবু ? ব্রজবাবু ?—হুঁ ! ব্যাপার তাহলে ঘোরালো রকমেরই কিছু ! তাই মায়ের মুখে কালি মেড়ে দিয়েছে ! কী জানি কী গেরো বাধাল আবার ঐ হতচ্ছাড়া দাদাটা !

কথা না বলে তাড়াতাড়ি খেয়ে উঠল পরমেশ। "চল এইবার খবর শুনি"—বলে শুকনো হাসি হাসল একটু।

মাদুর পেতে বসে লক্ষ্মীর-আসনের মেটে প্রদীপের আলোতে কতকগুলো কাগজপত্র দেখছিলেন ব্রজবাবু, ঘরে ঢুকেই পরমেশ ঢিপ করে প্রণাম করল তাঁর পায়ের কাছে। ভদ্রলোক পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিলেন তাকে, তারপর অবাক হয়ে বললেন—"এই ক মাসে তুই এত ঢ্যাঙা হয়ে গেছিস খোকা ?"

"ঢ্যাঙার কথা জানি নে, তবে মা বলেন—দেহটা নাকি আমার প্যাকাটির মতন হয়ে গিয়েছে। আপনি কী বলেন জেঠামশাই ? মায়ের কথা আমার তো

বিশ্বেস হয় না। খাটনি আমার খুব বটে, কিন্তু সে তো বসে বসে কাজ করে যাওয়া, তাতে তো বরং আরো ভুঁড়ি বেরোবার কথা। প্যাকাটি হতে যাব কেন ?"

ব্রজবাবু এ বাজে কথার আলোচনা আর গড়াতে দিলেন না। কাগজগুলো অকারণেই ঠেলে এগিয়ে দিলেন পরমেশের দিকে, তারপর জিজ্ঞেস করলেন—"জানিস এগুলো কী ? এ তোর দাদার মামলার কাগজ।"

"দাদার মামলা ?"—আকাশ থেকে পড়ল পরমেশ।

তারপর সব সে শুনল। মায়ের মুখের চেহারা অত থমথমে কেন, বুঝতে আর বাকী রইল না।

আফিসের তহবিল থেকে দুহাজার টাকা সরিয়েছে নিখিল। সরিয়েছিল ছ' মাস আগে, সম্ভবতঃ পরমেশের কাছ থেকে বাড়ির ভাগ কিনে নেবার জন্য।

এতদিন কোনরকমে চাপাচুপি দিয়ে রেখেছিল, ধরা পড়েছে এই কয়েকদিন আগে। সে গ্রেফতার হয়েছে, হাজতে রয়েছে।

অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল পরমেশ, তারপর বলল—"টাকাগুলো ফেরত দিলে ওকে ছেড়ে দেবে না ?"

"বলা যায় না।"—মাথা নেড়ে বললেন ব্রজবাবু। "বলা যায় না। আইনের কথা বলা যায় না কিছু। কোন্ দিকে জল গড়াবে বলার উপায় নেই, আফিসের কর্তারা ভয়ানক খাপ্পা ওর উপরে। এই বেইমানির জন্যে আর কী। বলে—ওকে ছাড়াছাড়ি নেই।"

ব্রজবাবু একটু থেমে গেলেন। পরমেশ কিছু বলে কি না, তারই জন্য থামলেন বোধ হয়। কিন্তু কিছুই বলল না পরমেশ।

তখন ব্রজবাবু শুরু করলেন আবার—"কিন্তু ওকে যদি বাঁচাবার চেষ্টা করতে হয়, টাকাটা আগে দিয়ে দেওয়া দরকার। দিয়ে থুয়ে তারপর কান্নাকাটি করলে তবে যদি কর্তাদের দয়া হয়। মামলা হলে জেল অনিবার্য।"

"তা, টাকাটা দিয়েই দিক না দাদা! বউদির গায়ে যা গয়না আছে—কী বল মা ? তুমিই না বলছিলে দশ বারো হাজার টাকার জিনিস হবে ?"

চন্দ্রচূড়

পরমেশের কথার উত্তরে ব্রজবাবু সদুঃখে মাথা নাড়লেন—"বউমার কথা আর বলিস নি বাবা! নিখ্‌লে গ্রেফতার হবার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ডাকিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেছে। আমি সেখান অবধি ধাওয়া করেছিলাম। সে দেখা করলে না। বলে পাঠালে তার ভয়ানক জ্বর।"

"দেখা করলে না?"—হেসে ফেলল পরমেশ।

"না"—রাগতভাবে ব্রজবাবু বলতে লাগলেন—"নিজে দেখা না করে তার বাবাকে পাঠিয়ে দিলে আমার সাথে কথা কইতে। সে-বুড়োটা এক নম্বরের ফিচেল, তা তোর বাপের মুখ থেকে শুনেছিলাম সেকালে। দেখলামও তাই। বলে কিনা—কোথায় গয়না মশাই? দুহাজার টাকা তা থেকে হবে না। আর সেই ব্যাংএর আধলা যদি মামলাতে খরচ হয়ে যায়, আর তারপর মামলাতে যদি নিখিল বাবাজী খালাস না পান, তখন মেয়েটা যে কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে পথে দাঁড়াবে, সেটা ভেবেছেন? ওগুলো যদি থাকে, নিখিলের ছেলেমেয়েরই একটা অবলম্বন রইল!"

গুম হয়েই রইল পরমেশ।

বগলা কথা কইলেন এইবার—"উকিলবাবুর কাছে শুনছি বাড়িটাও নাকি বউ নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছে।"

"হ্যাঁ, হাজতে নিখিলের সাথে দেখা করেছিলাম বউমার তরফের কথা তাকে শোনাবার জন্যে। সেই সময়ই সে বাড়ির কথা জানাল আমায়। আগে জানতে পারি নি।"

পরমেশ হেসে ফেলল—"বউদি গুছিয়ে নিয়েছে।"

"এ-গোছানোর মাথায় মারি ঝাড়ু!" রেগে ব্রজবাবু বললেন—"বাড়ি কার? —নিখিলের। গয়না কার?—নিখিলের। এখন নিখিলের বিপদের সময় যদি তার বউ ওগুলো গুছিয়ে নিয়ে দূরে গিয়ে গা ঢাকা দেয়, ভগবান তা সইবেন, ভেবেছিস?"

"ভগবান?"—আবার হেসে ফেলল পরমেশ।

"ভগবানের কথায় তুই হাসলি?"—ব্রজবাবু যেন ভয়ে কাঠ হয়ে গেলেন।

"আজ্ঞে না। হাসিটা এমনিই। ভগবানের কথায় আমি হাসিও না, আমার বিড়ির মহাজন বেঁচে থাক, ভগবান মশাইকে নিয়ে আমার মাথা না ঘামালেও চলবে।"

আরও কী-সব সে বলতে যাচ্ছিল, বগলা ডুকরে কেঁদে উঠলেন—"এক ছেলে হল চোর, আর এক ছেলে হল নাস্তিক। ওরে খোকা, এ তোর কী মতি-গতি হল?"

ব্রজবাবু কাগজপত্তর গোছাতে গোছাতে বললেন—"তোর যেমন কথাবার্তা, তাতে শেষ কথাটা আর তোকে না জিজ্ঞেস করলেও চলে। তবু, নিখিল বলে দিয়েছে বলেই বলছি—তোর দুহাজার টাকা—দুহাজার পুরো নয়, শোখানেক তো তুই খাওয়াদাওয়ার দরুন খরচ করে ফেলেছিস—উনিশশোর মত টাকা যা আমার কাছে জমা আছে, তা কি তুই দিবি তোর দাদাকে?"

চোখ বড় বড় করে পরমেশ চাইল ব্রজবাবুর পানে—"আপনি দিতে বলেন জেঠামশাই? বাড়ি দাদার, গয়না দাদার, তবু বিপদের সময় বউদি তা দাদাকে দিলে না। আর এই উনিশশো টাকা, এটা আমার, বাড়ি বেচে এ-টাকা যোগাড় করেছি, সকাল ছটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত বিড়ি বাঁধছি নফর মিঞার দোকানে—যে গালাগাল না দিয়ে কথা কয় না ভুলক্রমেও; তবু ঐ উনিশশো টাকা আমি জমিয়ে রেখেছি, একদিন নিজে একখানি দোকান করব বলে, ঐ টাকা আপনি দিতে বলেন? ধরুন দিলাম, ধরুন দাদা খালাস হল, আবার চাকরি পেয়ে সুখে সংসার করতে লাগল, ধরুন তখন আমি দাদাকে গিয়ে বললাম—'দাদা, তোমার জন্যে আমার সর্বস্ব গিয়েছে, আমায় তুমি দুটি দুটি খেতে দাও', দেবে দাদা খেতে? বলুন জেঠামশাই, দাদা আমায় খেতে দেবে, এটা আপনি জোরগলায় বলুন একটিবার, তারপর যান, টাকা তো আপনার কাছেই আছে, আপনি দিন গিয়ে দাদাকে।"

ব্রজবাবু নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, পরমেশ লাফিয়ে উঠে লণ্ঠনটা হাতে নিল—"চলুন জেঠামশাই, আপনাকে বড় রাস্তায় তুলে দিয়ে আসি; গলি-

ঘুঁজির ভিতর দিয়ে ঠিক পথে চলা আপনার কাজ নয়। আমার অবশ্যি অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।"

* * * *

তিন বছর পরে।

জেলখানা থেকে বেরিয়ে এল নিখিল। চুল পেকে উঠেছে, দেহটা কুঁজো হয়ে গিয়েছে। গেটের বাইরে এসে সে যেন দিশাহারা হয়ে পড়ল। এত-চেনা শহরটাতে কোন্ পথে যে তাকে চলতে হবে আজ, তা যেন কোনমতেই তার মাথায় আসছে না।

একটা ছেলে এসে ঢিপ করে প্রণাম করল তাকে।

"এই যে দাদা!"—বলে তাগড়া-জোয়ান একটা ছেলে এসে ঢিপ করে প্রণাম করল তাকে। তার পিছনে দাঁড়িয়ে বগলা, দুচোখ দিয়ে নীরব ধারায় জল নামছে বৃদ্ধার।

দুমিনিট নিখিল চুপচাপ—তারপর ভাঙাগলায় বলল—"তুই আমায় নিতে এসেছিস খোকা? ভগবান আছেন তাহলে।"

পরমেশ তার হাত ধরে বলল—"ঘরে চল্ দাদা। ভগবান আছেন কিনা, তা নিয়ে মাথা ঘামাই নে। আমার বিড়ির দোকানখানা আছে, সেই আমার যথেষ্ট ভরসা; দরকার হলে সারাজীবন তোমায় আমি বসিয়ে খাওয়াতে পারব।"
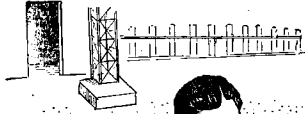
মারণ-মন্ত্র

—গুরনেক সিং

ছেলেবেলা থেকেই ভূত-প্রেত, তন্ত্র-মন্ত্র সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনে আসছি। আগেকার যুগে তান্ত্রিকরা নাকি বহু দূর থেকে এক ধরনের মারণ-মন্ত্রের সাহায্যে মানুষ খুন করতে পারতেন। কিন্তু বিজ্ঞানের ছাত্র আমি, পাকা বস্তু-বাদী ; তাই কোন কালে এসব কথা বিশ্বাস করিনি।

বি. এস্-সি. পরীক্ষা দেবার পর একটা লম্বা ছুটি পেলাম। ভাবলাম, যাই বিহারের দিকে বন্ধুবর ধর্মনাথ সিংয়ের জমিদারিতে ছুটিটা কাটিয়ে আসি ; সেই সঙ্গে প্রাণ ভরে শিকারের শখটাও মেটানো যাবে। ওদের জমিদারিতে নাকি অনেক কুমির পাওয়া যায়। কুমির শিকারের ইচ্ছা আমার অনেকদিনের। অবিশ্যি, ধর্মনাথের জমিদারিতে যাওয়া এই আমার প্রথম নয়, এর আগেও কয়েকবার ঘুরে এসেছি, তবে সে মাত্র কয়েকদিনের জন্য।

চন্দ্রচূড়

স্টেশনে ধর্মনাথ আমাকে নিতে এলো। বহুদিন পরে দেখা, ধর্মনাথের আনন্দ আর ধরে না। দুহাতে জড়িয়ে ধরে কুশল প্রশ্নের অবিরাম স্রোতোধারায় আমায় ব্যতিব্যস্ত করে তুললো ধর্মনাথ।

প্রথম আবেগটা একটু শান্ত হলে তার সঙ্গে আসা চাকরের দিকে নজর দিলাম। দেখলাম, নতুন লোক। রাম সিংয়ের সেই চিরপরিচিত সদাহাস্য মুখটি নজরে পড়লো না।

বললাম—চাকর পালটেছিস্ দেখছি। রাম সিং কোথায়? আর এই বুড়ো দাদুটিকে যোগাড় করলি কোথেকে?

ধর্মনাথ বললে—এ নতুন চাকর, লাল সিং। রাম সিং আর নেই।

—আর নেই, মানে?

—আর নেই, মানে মারা গেছে; মারণ-মন্ত্রে!

—মারণ-মন্ত্রে? সে আবার কি?

—গত বছর জমি নিয়ে রাম সিংয়ের মামলা হয়েছিল একজনের সঙ্গে। কয়েকমাস মামলাটি চলে, শেষে অবিশ্যি রাম সিংই মামলাটি জিতে যায়; কিন্তু সেই হোল তার কাল! যে লোকটা মামলা হেরে গিয়েছিল, একজন তান্ত্রিকের সঙ্গে তার জানাশোনা ছিল। সেই তান্ত্রিক-বন্ধুর সাহায্যে লোকটি রাম সিংয়ের ওপর মারণ-মন্ত্র প্রয়োগ করলো; পরের দিনই নদীতে স্নান করবার সময় রাম সিংকে কুমিরে টেনে নিয়ে গেল!

—ওটা একটা দুর্ঘটনা মাত্র। মারণ-মন্ত্র-টন্ত্র সব আজগুবি কাণ্ড। মামলায় হেরে গেলেও রাম সিং কুমিরের হাতে পড়তো! তুইও এ সব কথা বিশ্বাস করিস নাকি?

—বিশ্বাস করি কি করি না, সেটা আলোচনা করবার ঢের-ঢের সময় পাওয়া যাবে। তুই এখন বাড়ি যাবি, না স্টেশনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তর্ক করবি আমার সঙ্গে?

অগত্যা কথা না বাড়িয়ে ধর্মনাথের সঙ্গে বাড়ির দিকে রওনা দিতে হোল।

* * * *

ধর্মনাথের বাবা ঠাকুর কৃপাল সিংয়ের সঙ্গে বহুদিন আগেই আমার পরিচয়

● গুরনেক সিং

হয়েছিল। আমাকে দেখে যেন চাঁদ হাতে পেলেন ভদ্রলোক। কোথায় বসাবেন, কি করবেন ভেবে পান না।

স্নান করে খেয়ে-দেয়ে নিতে দুপুর গড়িয়ে গেল। ধর্মনাথ বেরিয়ে গেল জমিদারি দেখাশোনার কাজে। ঠাকুর কৃপাল সিং আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা চালিয়ে অবশেষে দিবা-নিদ্রার কোলে আত্মসমর্পণ করলেন। আমিই শুধু জেগে বসে রইলাম।

লাল সিং গ্যাঁট হয়ে বসলো আমার সামনে।

কিছুক্ষণ পরে খইনি ডলতে ডলতে এসে আমার সঙ্গী হোল লাল সিং। আর কিছু করবার নেই দেখে লাল সিংকে নিয়েই পড়লাম আমি। বললাম—লাল সিং দাদু, মন্ত্রে-তন্ত্রে বিশ্বাস করো?

—কি আর বলবো, খোকাবাবু। আপনারা হলেন সব আংরেজি জানা লোক, হয়তো আমার কথা হেসেই উড়িয়ে দেবেন। বললে হয়তো বিশ্বাস করবেন না খোকাবাবু, এমন জিনিস আমি আমার জীবনে দেখেছি, যাতে ওসবে বিশ্বাস না করে উপায় নেই!

—বল কি, লাল সিং দাদু? আচ্ছা, তুমি মারণ-মন্ত্রের প্রয়োগ দেখেছ?

—দেখেছি বইকি খোকাবাবু, আলবত দেখেছি।

লাল সিং খইনির দলা মুখে ফেলে দিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসলো আমার সামনে। বললো—আমাদের গাঁয়েই এমন একজন লোক ছিল খোকাবাবু, সে মারণ-মন্ত্রে হাজার-হাজার মাইল দূরের মানুষকেও এক নিমেষে খুন করতে পারতো!

চন্দ্রচূড়

—দূর! তাও হয় নাকি?

—হয় না মানে? একশো বার হয়। সে করতো কি জানেন? প্রথমে একটা মোমের পুতুল তৈরি করতো। তারপর পেঁচা, কাক, শকুন আর সাপের তাজা রক্ত ভরতো সেই পুতুলটির মধ্যে। তারপর একটা ছুরি নিয়ে বিড়বিড় করে কি সব মন্ত্র পড়ে, শত্রুর নাম নিয়ে, সেই পুতুলটির বুকে আমূল বসিয়ে দিতো সেই ছুরি! আর ঠিক তক্ষুণি, সেই শত্রুটি, তা সে যত দূরেই হোক না কেন, মুখে রক্ত উঠে মারা যেতো! বললে বিশ্বাস করবেন না খোকাবাবু, এ আমি নিজের চোখে দেখেছি!

গল্প শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। কখন যে সূর্য ঢলে পড়েছে, তার খেয়ালই ছিল না। চমক ভাঙলো ধর্মনাথের কথায়,—কি রে? লাল সিংয়ের সঙ্গে গল্পে-গুজবে খুব জমে গেছিস যাহোক। চা-টা খেয়ে তৈরী হয়ে নে; আজ পূর্ণিমার রাত, চাঁদের দেদার আলো, কুমির শিকার জমবে ভাল!

* * * *

দুটো বন্দুক আর লাল সিংকে সঙ্গে নিয়ে আমরা যখন বেরুলাম তখন রাত প্রায় নটা। চাঁদ পুবের সীমানা ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা ওপরে উঠে এসেছে। নদীর ধারে বালির ওপর চাঁদের আলো পড়ে চিকচিক করছে, মনে হয় কে যেন চুপি চুপি এসে একটা রুপোর পাত বিছিয়ে দিয়ে গেছে নদীর ধারে-ধারে। নদীর জলে আর চাঁদের প্রতিচ্ছায়ার মধ্যে চলছে এক অপূর্ব লুকোচুরি খেলা।

ধর্মনাথ বললে—ভালভাবে দেখ, ঐ দূরে! দেখছিস, ক'টা কুমির কেমন মজা করে বালির ওপর গা ছড়িয়ে দিয়ে চাঁদের আলো উপভোগ করছে? আজকে দেখা যাবে, তোর হাতের টিপ কেমন!

উত্তেজনায় হাতটা নিশপিশ করে উঠলো। লাল সিংয়ের হাত থেকে বন্দুকটা নিয়ে দুটো তাজা টোটা পুরলাম। তারপর সকলে এগিয়ে চললাম চুপি চুপি নদীর ধার ঘেঁষে, সামনে লাল সিং, পরে আমি, সকলের পেছনে ধর্মনাথ।

হঠাৎ লাল সিং থমকে দাঁড়ালো! মনে হোল, যেন ভূত দেখেছে! ফিসফিস করে বললে—কিছু শুনতে পাচ্ছেন?

● গুরনেক সিং

ততক্ষণে ধর্মনাথও এগিয়ে এসেছে আমাদের পাশে। বললে—কি ব্যাপার?

লাল সিং আবার ফিসফিস করে বললে—কিছু শুনতে পাচ্ছেন না? ঘন্টির শব্দের মতো কিছু?

সেই চাঁদের আলোয় দেখলাম লাল সিংয়ের মুখ ভয়ে আর উত্তেজনায় সাদা হয়ে গেছে!

মনোযোগ দিয়ে ভালভাবে শোনবার চেষ্টা করলাম। হাওয়ার পরতে পরতে মনে হোল একটা ঘন্টির মিষ্টি সুর ভেসে আসছে টুং টাং করে। বললাম—কোনো মন্দিরে ঘন্টি বাজছে হয়তো!

ধর্মনাথ আমার দিকে তাকিয়ে বললে—পাগল, না মাথা খারাপ? এখান থেকে দুচার মাইলের মধ্যে কোন মন্দির নেই!

লাল সিং হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালো ধর্মনাথের দিকে। বললে—ছোটবাবু, আপনি তো কখনো আমার কথা বিশ্বাস করেন না, সব হেসে উড়িয়ে দেন। কিন্তু মহাবীরজীর দোহাই, অন্ততঃ দশ মিনিটের জন্যে আমি যা বলছি তাই করুন দয়া করে। না হলে মহাবিপদ হবে!

ঠিক এই সময়ে এক টুকরো মেঘের আড়ালে চাঁদ ঢাকা পড়ে গেল, আর চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো এক রহস্যময় অন্ধকার। ধর্মনাথ বন্দুকটা জোরে চেপে ধরে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়ালো, আমার বুকের ভেতরটা শিরশির করে উঠলো ভয়ে।

লাল সিং ততক্ষণে বিড়বিড় করে কি একটা মন্ত্র পড়ে তার হাতের লাঠি দিয়ে বালির ওপর দুটো স্বস্তিকার চিহ্ন এঁকে ফেলেছে, আর আমাদের দুজনকে টেনে নিয়ে এক একটি চিহ্নের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে; তারপর আমাদের দুজনকে ঘিরে একটা গোল চক্র টেনে দিয়ে, এক মুঠো বালি নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের দুজনের মাঝে।

সেই মিষ্টি মধুর ঘন্টির টুং টাং শব্দ ততক্ষণে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মনে হোল সেই শব্দ এগিয়ে আসছে আমাদেরই দিকে।

হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে লাল সিং চিৎকার করে উঠলো—আয়, আয়… নেমে আয় আমার কাছে!…রক্ত পাবি…তাজা রক্ত…নেমে আয়!

চন্দ্রচূড়

সেই নিস্তব্ধ প্রান্তরে লাল সিংয়ের ভারী গলা গমগম করে উঠলো। অশরীরী প্রেতের কান্নার মতো সে গলার শব্দ দূর থেকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এলো বারবার। আমার বুকের মধ্য দিয়ে, মনে হোল যেন বয়ে চলেছে একটি বরফের মতো ঠাণ্ডা রক্তের স্রোত! আর ঠিক সেই সময় মনে হোল, ঘন্টির শব্দটি যেন আকাশের বায়ুস্তর ভেদ করে নেমে আসছে, আমাদের দিকে! ততক্ষণে মেঘের টুকরোটি সরে গেছে চাঁদের ওপর থেকে। তাকিয়ে দেখলাম, ধর্মনাথ ভয়ে আর আতঙ্কে নীল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মূর্তির মতো!

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, চাঁদের আলোয় একটি কালো বিন্দু দুলতে দুলতে নেমে আসছে আমাদের দিকে, যেন লাল সিংয়ের সেই ভয়াবহ ডাকে সাড়া দিতে। ক্রমে সে বিন্দু বড় হোল···আরো বড়···আর কিছুক্ষণ পরে অবাক বিস্ময়ে দেখলাম আকাশ থেকে দুলতে দুলতে আস্তে আস্তে নেমে এলো একটি মাটির কালো হাঁড়ি। আর সেই ঘন্টির মিষ্টিমধুর টুং টাং শব্দের মধ্যেই শুনলাম একটি অদ্ভুত ভারী গলা···রক্ত···রক্ত চাই···ঠাকুর কৃপাল সিংয়ের রক্ত চাই!······

চমকে উঠলাম! ঠাকুর কৃপাল সিং যে ধর্মনাথের বাবা!

ক্রমে ক্রমে হাঁড়িটি নেমে এলো লাল সিংয়ের পায়ের কাছে। দারুণ আতঙ্কে আর কৌতূহলে তাকালাম সেই হাঁড়ির মধ্যে···আর ভয়ে আমার রক্ত যেন জল হয়ে গেল! হাঁড়ির ভেতরে রয়েছে কয়েকটি জংলী লতা-পাতা, শুকনো শেকড়, তাদের ওপরে রয়েছে তাজা রক্ত মাখানো একটি নরমুণ্ড; আর তার ওপর টিম টিম করে জ্বলছে একটি প্রদীপ! সেই প্রদীপের সামনে রয়েছে একটি সাদা হাতির দাঁতের বাঁটওয়ালা ছোরা! হয়তো আমার চোখের ভুল, স্পষ্ট দেখলাম নরমুণ্ডের চোখ দুটো ধিকি ধিকি করে জ্বলছে ভাঁটার মতো!···আবার সেই রহস্যময় কণ্ঠ শোনা গেল—রক্ত···ঠাকুর কৃপাল সিংয়ের রক্ত চাই···তাজা, গরম, লাল রক্ত চাই!······

লাল সিং হাতের লাঠিটি পাশে রেখে সেই মূর্তিমান বিভীষিকার পাশে বসে পড়লো হাঁটু গেড়ে···বিড়বিড় করে কি যেন একটা মন্ত্র পড়লো অস্পষ্ট ভাবে···আর

● গুরনেক সিং

তারপর ছোঁ মেরে হাঁড়ির ভেতর থেকে সেই চকচকে ছোরাটি তুলে নিলে। সঙ্গে সঙ্গে নরমুণ্ডের ভেতর থেকে শব্দ উঠলো—রক্ত চাই !······

ছোরাটা হাতে নিয়ে লাল সিং বললে—কে পাঠিয়েছে তোকে ?

ভারী গলায় একটা নাম শোনা গেল। আমার মনে পড়লো, রাম সিংয়ের মৃত্যুর জন্যেও এই লোকটাই দায়ী। তার সঙ্গেই রাম সিংয়ের মামলা হয়েছিল, যার জন্য রাম সিংকে করতে হয়েছিল মৃত্যুবরণ ! ···আর মনে পড়লো, মামলায় রাম সিংকে নানাপ্রকারে সাহায্য করেছিলেন কৃপাল সিং··· সেই জন্যেই বোধ হয় কৃপাল সিংকেও সরাবার ব্যবস্থা হয়েছে রাম সিংয়ের মতো !

আস্তে আস্তে নেমে আসছে একটি মাটির কালো হাঁড়ি। [পৃঃ ১৫৮

লাল সিং বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে পড়তে সেই ছোরাটি হাঁড়ির চার-পাশে কয়েকবার ঘোরালো চক্রাকারে, তারপর নিজের আঙুল একটু কেটে কয়েক ফোঁটা রক্ত ফেলে দিলে সেই প্রদীপের তেলের মধ্যে, আর ছোরাটি আবার ফেলে দিলে হাঁড়ির মধ্যে। তারপর লাঠিটা তুলে নিয়ে বললে—যা,

চন্দ্রচূড়

ফিরে যা! যেখান থেকে এসেছিস, সেইখানেই ফিরে যা! রক্ত পাবি ওখানেই; তাজা, গরম, লাল রক্ত! যা!

—রক্ত, রক্ত চাই!······চিৎকার করতে করতে সেই জীবন্ত বিভীষিকাটি মিলিয়ে গেল মহাশূন্যে একটি দুঃস্বপ্নের মতো!

* * * *

সে রাতে কি ভাবে যে বাড়ি ফিরেছিলাম, তা আমার স্পষ্ট মনে নেই। একটি ভয়াবহ আর বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্নের মতো সেই স্মৃতিটি আজও মনে হলে গায়ে কাঁটা দেয়!

পরের দিন খোঁজ নিয়ে জানা গেল, রাম সিংয়ের মামলার সেই প্রতিদ্বন্দ্বীটিকে কে বা কারা খুন করে গেছে। তার বুকে আমূলবিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল একটি হাতির দাঁতের বাঁটওয়ালা চকচকে ছোরা!

এখন আমি তন্ত্রে-মন্ত্রে বিলক্ষণ বিশ্বাস করি!

চাবুক খেয়ে ওরা যেন হিংস্র হয়ে উঠল চতুর্গুণ। [পৃঃ ১৭৪

হিংসায় মৃত্যু

—রেণুকা মুখার্জি

কনকপুরের রাজার ছিল পরম রূপবতী ও গুণবতী এক রানী। রাজা, রানীকে খুব ভালবাসতেন। কিছুদিন পরে রানীর ফুলের মত একটি মেয়ে হল। কিন্তু তাকে প্রাণভরে দেখবার আগেই পৃথিবীর আলো রানীর চোখ থেকে চিরদিনের মত মুছে গেল।

রাজা কয়েকদিন দুঃখে মুহ্যমান হয়ে রইলেন; কিন্তু রাজকন্যার মুখ চেয়ে ধীরে ধীরে শোক ভুললেন। তিনি মেয়ের নাম রাখলেন সুছন্দা। রানীর নাম ছিল সুনন্দা, রাজার নাম ছন্দক; রাজা-রানীর নামের শেষ আর প্রথম মিলিয়ে তাই সুছন্দা রাখা হল। সুছন্দার রূপে ত্রিভুবন আলো হয়ে উঠলো। তার হাসিতে মুক্তা ঝরে, কান্নায় ঝরে পান্না। রাজা তো মেয়েকে বুক থেকে নামানই না, মা ছিল না বলে মাতৃহারা কন্যাকে আরও ভালবাসতেন।

চন্দ্রচূড়

একদিন রাজা মৃগয়ায় গিয়েছেন। মৃগয়া থেকে ফিরে আসার সময় বনের ভিতর থেকে করুণস্বরে কান্নার আওয়াজ এলো কানে। রাজা ঘোড়া ছুটিয়ে ভিতরে গিয়ে দেখেন, এক লাবণ্যময়ী কন্যা দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে!

রাজা তাকে শুধালেন, "কন্যা, তুমি কাঁদো কেন?"

মেয়েটি তখন মুখ তুলে বললে, "আমার নাম অর্পণা। আমরা বনের ভেতর থাকি। একটা বাঘে আমার বাবা-মাকে খেয়ে ফেলেছে। সামনে রাত্রি আসন্ন, কোথাও আশ্রয় নেই স্থান পাবার, তাই কাঁদছি।"

রাজার মনে বড় দুঃখ হল। তিনি মেয়েটিকে সঙ্গে করে কনকপুরে ফিরে এলেন। কয়েকদিন পরে অর্পণার রূপগুণে মুগ্ধ হয়ে রাজা তাকে রানী করলেন। কিন্তু রানী অর্পণার বাইরেটা যত সুন্দর ছিল, ভিতরটা ছিল তত বিশ্রী। তাঁর মন ছিল হিংসায় ভরা। বিশেষ করে রূপের অহংকার ছিল এত বেশী যে, তাঁর চেয়ে যদি কেউ সুন্দরী হত, তাহলে তাকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না।

রাজকুমারী সুছন্দাকে দেখে তাঁর মনে ঈর্ষার উদয় হল; কিন্তু মুখে প্রকাশ পেল না সে-ভাব।

সুছন্দার রূপের মধ্যে ছিল স্বর্গের পবিত্রতা। মন ছিল তার সুন্দর। তাই তার মুখে ফুটে উঠতো এক অপূর্ব জ্যোতি। উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়ে তারা দুজনে এক সঙ্গে গেলে সকলে সুছন্দাকেই প্রশংসা করতো বেশী। অর্পণার হিংসা তাতে আরো বেশী জেগে উঠতো। ভাবতেন কি করে সুছন্দার ক্ষতি করা যায়! এর জন্য দরকার হলে ওকে মেরে ফেলতেও রাজী ছিলেন। কিন্তু মেরে ফেলা তো মুখের কথা নয়! তাই রানী বেছে বেছে একজন দুষ্ট লোকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন আর খুঁজতে লাগলেন সুযোগ।

সুযোগও মিলে গেল। বহুদিন দেশ-ভ্রমণে যেতে পারেননি রাজা প্রথম রানী মারা গিয়ে অবধি। এখন রানী অর্পণার উপর সুছন্দার ভার দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত মনে বিদেশ যাত্রা করলেন।

যাত্রার দিন রানীকে জিজ্ঞেস করলেন, "রানী, তোমার জন্যে কি আনবো?"

● রেণুকা মুখার্জি

রানী মিষ্টি করে বললেন, "রাজাধিরাজ, আপনি আমার আশ্রয়দাতা, বিপদের দিনে পরমবন্ধু। চাওয়ার কথা তুলে লজ্জা দেবেন না। আপনার মন যা চায়, তাই আনবেন, তাই আমি খুশী মনে গ্রহণ করবো।"

রাজা খুব খুশী হলেন তাঁর কথা শুনে। এমন মন না হলে কি রানী হওয়া যায়?

বাগানে দাসদাসীর সঙ্গে ছোটাছুটি করে সোনার গোলক নিয়ে খেলছিল রাজকুমারী। রাজা তাকে কোলে নিয়ে আদর করলেন। চুমু খেয়ে বললেন, "মা, আমি দেশভ্রমণে যাচ্ছি, তোমার জন্যে কি আনবো?"

রাজকন্যা সজল নয়নে বললে, "তুমি যেও না বাবা, আমার বড় ভয় করছে!"

রাজা হেসে বললেন, "দূর পাগলী! আমি তো শীগ্গির এসে পড়বো; আর মা রইলো, ভয় কি?"

রাজকুমারীও জানে না তার ভয় কোথায়! কিন্তু নতুন মাকে তার কেন যেন ভয় করে! যাই হোক, রাজা বললেন, "তোমার জন্যে গজমতির মালা নিয়ে আসবো।"

পরদিন রাজা লোক-লশকর নিয়ে ময়ূরপঙ্খী ভাসিয়ে দিলেন নদীতে। রানী আর রাজকুমারী প্রাসাদের অলিন্দে আর প্রজারা তীরে দাঁড়িয়ে সজলনয়নে তাকিয়ে রইল তাঁর ময়ূরপঙ্খীর দিকে। ময়ূরপঙ্খী অদৃশ্য হতেই রানীর মুখের ভাব গেল পালটে। হিংসার আগুনে জ্বলে উঠলো তাঁর চোখ দুটি। সুছন্দাকে নিয়ে প্রাসাদে ফিরে এলেন তিনি।

রাজকুমারীকে সেদিন এত আদর করতে লাগলেন রানী যে, বাবার কথা ভুলে পরম আরামে রানীর কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল সুছন্দা।

সুছন্দা ঘুমিয়ে পড়লে রানী অর্পণা সেই দুষ্ট লোকটাকে ডেকে এনে বললেন—"রাজকুমারীকে নিয়ে গুপ্ত দ্বার-পথে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গভীর অরণ্যে নিয়ে গিয়ে তাকে হত্যা করে ওর রক্ত এনে আমাকে দেখাও।"

লোকটা তো বনের পথে চলেছে রাজকুমারীকে কোলে নিয়ে। শেষ রাতের

চন্দ্রচূড়

চাঁদের আলো এসে পড়েছে—রাজকন্যার সুপ্তমুখে। সে আলোতে তাকে ঠিক দেব-কন্যার মতই দেখাচ্ছে। ঘুমন্ত রাজকন্যাকে গাছের তলায় শুইয়ে রেখে হঠাৎ সেই দুষ্টু লোকটার সুবুদ্ধি জাগলো। ভাবলো, "আহা! এই ফুলের মত মেয়েটাকে কোন্ প্রাণে আমি হত্যা করি? তাহলে যে আমার পাপের চরমশাস্তি ভগবান দেবেন। না, একে মারবো না।"

এই বলে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকলো—"রাজকুমারী, পালাও, চোখটি খুলে তাকাও।"

রাজকুমারী চমকে উঠে তাকায় লোকটার দিকে। জিজ্ঞাসা করে—"আমি এখানে কেন? কে তুমি? আমায় এখানে এনেছ কেন? আমাকে মার কাছে দিয়ে এসো।"

লোকটা করুণ হেসে বললে—"কে তোমার মা রাজকন্যা? ও ডাইনী! তোমায় কেটে রক্ত নিয়ে যাবার জন্যে বলেছে। তা আমি রক্ত নিয়ে যাবো, কিন্তু তুমি পালিয়ে যাও—যেদিকে দুচোখ যায় পালাও, যদি বাঁচতে চাও।"

সুছন্দার মনে পড়ে গেল বাবার কথা। সে মরে গেলে বাবা ভয়ানক আঘাত পাবেন। বেঁচে থাকলে একদিন না একদিন দেখা হবেই। রাজকন্যা তাই সামনের দিকে ছুটতে লাগলো। কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যেতে লাগলো তার কোমল পা-দুখানি, বার বার হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে লাগলো সে, তবুও সে ছুটছে।

রাজকন্যা বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যেতেই লোকটা করলো কি, গাছে উঠে একটা পাখির বাসা থেকে পাখি ধরে এনে কেটে তার রক্ত নিয়ে গিয়ে রানীকে দেখালো। রানী খুশী হয়ে তাকে পুরস্কার দিলেন কয়েকটা মোহর।

এদিকে ভোরের আলো দেখা দিতেই রাজকন্যার সমস্ত দেহ পরিশ্রমে শিথিল হয়ে এলো। ক্লান্ত, অবসন্ন দেহে সে একটা গাছের গুঁড়িতে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো, এবং গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লো।

ঘুম ভাঙতে দেখে, একটা ছোট্ট বিছানায় সে শুয়ে আছে, আর দেড় হাত লম্বা

● রেণুকা মুখার্জি

চন্দ্রচূড়

সাতটা বামন তার বিছানার পাশে বসে ঝুঁকে পড়ে দেখছে—আর কি সব যেন বলছে ফিসফিসিয়ে!

রাজকন্যার ঘুম ভেঙেছে দেখে একটা বামন এক বাটি গরম দুধ এনে দিয়ে বললে,—"রাজকন্যা, কোন ভয় নেই। দুধটুকু খেয়ে নাও।"

রাজকুমারী দুধটুকু চোঁ চোঁ করে খেয়ে ফেললে। ভয়ানক খিদে পেয়েছিল তার।

সাতটা বামন তারা সাত ভাই; বনের ভিতর তাদের ঘর। বনের বাইরে তারা যায় না। বাইরের মানুষের কোনও খবরও রাখে না তারা। কিন্তু ভূত-ভবিষ্যৎ তারা জানে, মানুষের মুখ দেখে তারা তার মনের খবর টের পায়। বনের মধ্যে তাদের ক্ষেত আছে। মড়াইএ আছে ধান আর গোয়ালে আছে গরু। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি ঠুক ঠুক করে ছোট ছোট কোদাল নিয়ে মাটি কাটে, লাঙ্গল দেয়, জমি দেখাশোনা করে। সাতটি ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ নেই, ভারী শান্তিপ্রিয় তারা।

রাজকুমারী চমকে উঠে তাকায় লোকটার দিকে। [পৃঃ ১৬৪

সুছন্দাকে বন থেকে কুড়িয়ে এনেছিল তারা। তার মুখ দেখে ধরে ফেলেছিল তার কি হয়েছে! তাই সুছন্দাকে তারা ছোট বোনের মত আদরে স্থান দিল। কিন্তু দেড় হাত বামনের দুহাত লম্বা খাট, সুছন্দা শুতে পারে না, সেইজন্যে সাত

● হিংসায় মৃত্যু

চন্দ্রচূড়

বামন বন থেকে কাঠ কেটে এনে সারা দিন খেটে সুছন্দার জন্য একটা বড় খাট বানিয়ে দিলে।

সুছন্দা ভারী লক্ষ্মী মেয়ে। সে সাত বামনের জন্য রান্না করে, ঘর-সংসার দেখা-শোনা করে, গরুকে সেবাযত্ন করে—বনের হরিণ আর পাখিদের সঙ্গে খেলা করে। মাঝে মাঝে বাবার কথা মনে হয় কিন্তু বামনরা তাকে এত ভালোবাসে যে বাবার কথা বেশীক্ষণ মনে থাকে না। বেশ সুখেই আছে সুছন্দা। এমনি করে পার হল কয়েক বছর।

একদিন একটা হরিণের সঙ্গে সে খেলছে এমন সময়ে একটা তীর এসে সাঁ করে সুছন্দার পাশ ঘেঁষে মাটিতে বিঁধে গেল। হরিণটা দৌড়ে পালিয়ে গেল। সুছন্দা অবাক্ হয়ে ভাবলো, তীর ছুড়লো কে?

এমন সময় দেখতে পেলো একজন লোক এদিকে আসছে! মাথায় তার সোনার মুকুট, ঝকমকে তার পোশাক। মনে হল, এমনি সাজ তার বাবারও ছিল। বুদ্ধিমতী সুছন্দা বুঝতে পারলো, ইনি নিশ্চয়ই একজন রাজা।

রাজা এগিয়ে এসে সুছন্দাকে দেখে মুগ্ধ এবং বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—"তুমি কে মা? এই গহন বনে তুমি কি একলা থাকো? আমি সুবর্ণপুরের রাজা, মৃগয়ায় এসেছি, পিছনে আমার লোকজন আসছে।"

সুছন্দা তখন পরম সমাদরে ঘরে নিয়ে রাজাকে বসালো; যত্ন করে, শীতল জল আর কিছু খাবার এনে দিল; তারপর ধীরে ধীরে তার কাহিনী জানালো। রাজা শুনে ভারী দুঃখিত হলেন।

সন্ধ্যাবেলা বামনেরা বন থেকে ফিরলো, রাজার লোকজনও সব এসে পড়লো। রাজা বামনদের বললেন,—"তোমাদের বোনটিকে আমি আমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে চাই।"

বামনরা বোনটিকে ছেড়ে দেবার কথা ভেবে দুঃখ পেলো, কিন্তু কি আর করা যায়? চিরদিন তো বোনকে রাখা উচিত হবে না? কাজেই সুবর্ণপুরের রাজা, রাজকুমারী সুছন্দাকে নিয়ে রাজধানীতে এলেন আর বিয়ের দিন বামনদের আসার জন্য বিশেষ করে বলে এলেন। দেশে দেশে নিমন্ত্রণবার্তা চলে গেল।

● রেণুকা মুখার্জি

চন্দ্রচূড়

কনকপুরেও নিমন্ত্রণ করতে লোক গেল। কনকপুরের রাজা দেশভ্রমণ করে আসার পর রানী কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন—"এক জাদুকর রাজকন্যাকে কোথায় নিয়ে চলে গেছে!"

রাজা দেশ-বিদেশে সন্ধান করতে বহু লোক পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু সন্ধান পাননি। সেই থেকে রাজার মুখে হাসি নেই, মনে আনন্দ নেই—চুপচাপ থাকেন। কোনও উৎসবে তিনি যোগ দেন না। পূজা-পার্বণ আর প্রজাদের মঙ্গল-চিন্তা নিয়েই থাকেন। মাঝে মাঝে গজমতি হারটা দেখেন আর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

রাজা যাবেন না, তাই নতুন রানী একাই গেলেন। কিন্তু এখনও তাঁর রূপের অহংকার যায়নি। সুবর্ণপুরের রানীর রূপের প্রশংসায় আবার ঈর্ষা জাগে মনে।

সুবর্ণপুরের রানীকে দেখে কিন্তু তাঁর বহুদিন আগেকার সুছন্দার মুখখানা মনে পড়ে গেল।

সাতটা বামনও এসেছিল সুছন্দার বিয়েতে ভোজ খেতে। তারা কনকপুরের রানীকে চিনতে পেরেছিল। সুছন্দার কোন ক্ষতি হতে পারে এই ছিল তাদের ভয়।

বামনরা তাই লক্ষ্য করছিল রানীর মুখের ভাব। দেখলে, সে মুখ হিংসায় কালো হয়ে উঠেছে আর বোধ হয় চিন্তা করছেন—কেমন করে সুছন্দাকে ধ্বংস করা যায়! এ যে সুছন্দাই তাতে আর ভুল নেই। ওর চিবুকের কাছে তিলটিই তার প্রমাণ। সুছন্দার ঘটনা যদি জানতে পারে সকলে, তাহলে যে রানীর আর রক্ষে নেই।

গভীর রাত্রিতে এক জাদুকরের সন্ধানে বেরোলেন কনকপুরের রানী। এবার আর অন্য লোককে বিশ্বাস নেই। তাঁর পিছন পিছন চললো সাতটা বামন।

তারা গল্প করছে, "এক রানী বড় হিংসুটে।"

আর একজন বললে, "তার ছিল এক সৎমেয়ে।"

অন্য জন বললে, "তাকে সে একেবারে দেখতে পারতো না।"

অপর জন যোগ দিলে, "তাকে মেরে ফেলার জন্যে বনে পাঠালো।"

দুজন একসঙ্গে বলে উঠলো, "কিন্তু সে মরেনি।"

তিনজন বলে উঠলো, "সাতটি বামন তাকে আশ্রয় দিয়েছিল।"

এবার সাতজন সমস্বরে বলে উঠলো, "আমরাই সেই সাতজন, সাতজন !"

রানী সমস্তই শুনছিলেন, বামনদের কথা শুনেই প্রাণের ভয়ে তিনি দৌড় দিলেন। দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়ুচ্ছিলেন রানী। সামনে যে নদী, সে খেয়াল নেই। সহসা সেই নদীর জলে পড়ে কোথায় যে তিনি ভেসে গেলেন, তার আর পাত্তাই পাওয়া গেল না !
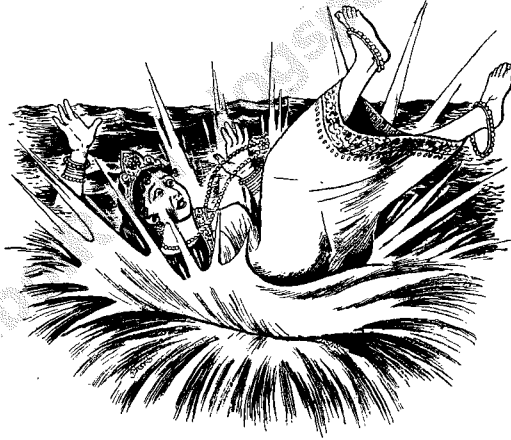
সেই নদীর জলে পড়ে কোথায় যে ভেসে গেলেন।

তারপর ? তারপর আর কি ? সুছন্দার বাবা খবর পেয়ে এলেন। রাজকন্যাকে বুকে করে চোখের জলে ভেসে রাজা তার গলায় পরিয়ে দিলেন বিদেশ থেকে কিনে আনা সেই গজমতির হার।

আর সেই বামন সাতটি—সবাই তারা বাড়ি ফিরে গেল। এখনও মাঝে মাঝে তারা এসে তাদের আদরের বোনটিকে দেখে যায়।

———

সাহসীর মৃত্যু নেই

—যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

> অজানার দুরন্ত নেশা যাদের পেয়ে বসেছিল একদিন, বিদেশ-বিভুঁই অপরিচিত স্থানে নিতান্ত পরিচিতের মতোই মৃত্যু তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকলে! তবু তারা এড়িয়ে গেলো শুধু তাদের লৌহ-কঠিন বুকের দৌলতে!

জিম্ রবিন দুরন্ত ছেলে, সে ক্যানাডার অধিবাসী। কলেজ থেকে বেরিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট হয়ে, তবু আজও সে একটু সভ্য-ভব্য হতে শিখলো না!

পরীক্ষার ফল বেরোতেই বাপ তাকে ডেকে বললেন, "এখন কয়েকটা দিন বিশ্রাম করে নে। তারপর তোকে একটা এঞ্জিনীয়ারিং কারখানায় ঢুকিয়ে দেবো; তখন কিন্তু আর তিলমাত্র অবসর পাবি না।"

জিম্ কথাটা শুনেছিল খুব নীরবেই—নতমস্তকে। বাপ ভাবলেন—জিম্ বোধহয় আর কোন দুরন্তপনা করবে না। যত সব দস্যি ছেলেদের সঙ্গে তার মেলামেশা।

এবার যদি তাদের সঙ্গছাড়া হয়! শত হলেও বয়স তো হয়েছে, বি. এ. পাসও করলো! দস্যিপনা আর কদিন করবে? জ্ঞান-বুদ্ধি হয়েছে তো!

কথাটা ভেবে মনে মনে খুবই আনন্দ হয়েছিল তাঁর, স্ত্রীর কাছেও তাই তিনি ছেলের বিনীত শান্ত স্বভাবটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই করেছিলেন।

কিন্তু পরদিন সকালেই যখন তিনি জানলেন যে, জিম্ বাড়িতে নেই, সে পালিয়েছে তার আর একটি বন্ধুর সঙ্গে,—জিমের পিতা তখন একেবারেই ভেঙে পড়লেন! অনুপায় হয়ে তিনি এখানে-ওখানে নানা জায়গায় টেলিগ্রাম করে তাঁর কর্তব্য সমাধা করলেন।

টেলিগ্রামের সন্তোষজনক জবাব এলো না কোনোখান থেকেই। আসবেই বা কেমন করে? জিম্ তখন আর ক্যানাডার ত্রিসীমানায়ও ছিল না! চির-দুরন্ত জিমের বুকে অনেক দিন আগে হতেই এক আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল—সে হলো আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষা!

ডাঃ লিভিংস্টোনের নাম সে শুনেছিল, মঙ্গোপার্কের নাম তার অজানা ছিল না। মিঃ আমুণ্ডসেন, ম্যালোরী, ক্যাপ্টেন কুক্ বা শ্যাক্ল্টন্ ইত্যাদির কথাও সে পড়েছিল কতবার! তাঁদের সকলকেই পেয়ে বসেছিল আবিষ্কারের নেশা—তাঁরা অমর হয়ে রয়েছেন সেই নেশার দৌলতে! জিম্ও চেয়েছিল তেমনি কোন গৌরব, তেমনি কোন মহিমা! কিন্তু যখন সে দেখলে যে, বি. এ. পাস করার ফলে মাকড়সার মতো সে নিজের জালে নিজেকে আরো বেশী জড়িয়ে ফেলছে. আত্মীয়-স্বজনের লুপ্তপ্রায় আশা-আকাঙ্ক্ষা আবার সজীব হয়ে উঠছে তাকেই কেন্দ্র করে, তখন সে একটা দারুণ অস্বস্তি অনুভব করলে ও অজ্ঞাত পৃথিবীর আলো-হাওয়া আলিঙ্গনের জন্য তারই মতো এক তরুণ সঙ্গীকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো। কাজেই মাতাপিতার কাছে, নিজের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের কাছে, জন্মভূমির কাছে—সে হলো নিখোঁজ ও নিরুদ্দেশ!

ক্যানাডার উত্তরে ছোট-বড় কতকগুলি দ্বীপ,—সেখানে বাস করে এস্কিমোদের বংশধর। এস্কিমোরা স্বভাবতঃ খুব দুর্দান্ত নয়। কিন্তু—তবু মনে রাখতে হবে দুরন্ত-

পনা, দস্যিপনা বা দুর্দান্ত হওয়া বিশেষ কোনো জাত-বিশেষের একচেটিয়া অধিকার নয়। কাজেই ক্যানাডার প্রতিবেশী এস্কিমোদের মধ্যে আজকাল খুন-জখমের কথাও শোনা যাচ্ছে! তাই গ্রীণল্যাণ্ডের নিরীহ শান্ত এস্কিমোদের সঙ্গে সে-দেশী এস্কিমোদের পার্থক্য ক্রমেই যেন বড় হয়ে উঠছিল! জিম্ রবিন তা জেনেশুনেও, একদিন সেই-খানেই এসে উপস্থিত হলো!

ভয়ংকর শীত—প্রায় সারাটা বছরই সেখানে জমি থাকে বরফে ঢাকা—ছোট-খাটো নদী-নালা পর্যন্ত সেখানে হালকা বরফে গা ঢেকে বিস্তৃত ময়দানের মতো নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে থাকে! সর্বত্রই একটা শান্ত সমাহিত ভাব আর শুভ্রতার পরিবেশ! তবু মাঝে মাঝে তারই ওপর পড়ে মানুষের রক্তলেখা! সাদা ধবধবে বরফের ওপর মানুষের তাজা রক্ত মাঝে মাঝে রাঙিয়ে দেয় এস্কিমোদের ঐ তুষার-ধবল দেশ আর ক্বচিৎ নবাগত দু-একটি বিদেশী ভ্রমণকারীর বুকে তাতেই কোন্ শিহরণ ও আতঙ্কের জ্বালা ধরিয়ে দেয়! জিম্ রবিন আর তার বন্ধুর বুকেও তেমনি ভাবে একদিন ভয়ের সঞ্চার হলো।

বন্ধুর নাম ডিক্। সে বললে, "এখন আর পেছুলে চলবে না জিম্! ঘর থেকে যখন বেরিয়ে এসেছি, তখন এগোতেই হবে—আর বাধা-বিঘ্ন কিছুই আমরা গ্রাহ্য করবো না। মনে রেখো ভাই, এসব দ্বীপে এখন সভ্যতার ছাপ পড়েছে, ইওরোপ-আমেরিকা থেকে আমাদের মতো লোক হরদম এসে বেড়িয়ে যায় এই বরফের দেশে। সভ্যতার ছোঁয়াচ পেয়ে এখানে রাইফেল-রিভলভার এসে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে এসে গেছে এমনিধারা খুন-জখম রক্তপাত! কিন্তু তাই বলে—"

হঠাৎ কি একটা মৃদু শব্দে তারা দুজনেই পেছন ফিরে তাকালো। তাকিয়েই দেখে—কি সর্বনাশ! একদল এস্কিমো ও শিকারী কুকুর কখন যে তাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা তা জানতেই পারেনি! সকলের আগে যে সর্দার-এস্কিমো, তার হাতে এক উদ্যত রাইফেল!

মুহূর্তে ওরা দুজনেই নিস্তব্ধ! আধ মিনিট কারো মুখে কোন কথা নেই। তারপর কথা বললো সর্দার-এস্কিমো—ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে। সে জানতে চাইলো, কে তারা? আর কেন এসেছে?—

এবার কথা কইলো জিম্। সে খুব নম্র বিনীত ভাবে মিষ্টি সুরে চমৎকার এক গল্প ফেঁদে বসলো। সে বললে যে, তারা ক্যানাডার অধিবাসী, কলেজের ছেলে। বছর-বছর সে-দেশে পরীক্ষা হয়। এবার তারা দুজনেই পরীক্ষায় ফেল করেছে। ফলে, তাদের অভিভাবক খুব গাল-মন্দ করেছেন ও বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। তাই তারা দেশ থেকে পালিয়ে এসেছে। নতুন দেশে নতুন বন্ধুদের মাঝে বাস করবে বলে।

একদল এস্কিমো ও শিকারী কুকুর কখন যে তাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। [পৃঃ ১৭১

কথা বলতে বলতে জিমের চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জলও বেরিয়ে এলো—দুঃখে ও অপমানে!

অভিনয়টা খুব ভালই হয়েছিল। এস্কিমোদের অনেকেই তাতে গলে গেছে মনে হলো। তারা নিজেদের মধ্যে কি একটু আলাপ-আলোচনা করলে। কিন্তু স্পষ্ট মনে হলো, তারা একমত হতে পারছে না। বেশির ভাগ লোকেই যেন ওদের সঙ্গে বন্ধুত্বের পক্ষপাতী। কিন্তু রাইফেলধারী লোকটা তখনো এক-গুঁয়ে, সে কিছুতেই বাগ মানতে চায় না! বরং সঙ্গীদের ভিন্নমত হওয়ায় সে খুবই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো, আর মুহূর্তের অবসর না দিয়ে তখনই ওদের নিকেশ করবার জন্য রাইফেল হাতে রুখে দাঁড়ালো তাদের বুক লক্ষ্য করে।

হয় তো দুটি সেকেণ্ড যেতে না যেতেই জিম্ ও ডিকের প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়তো সেই বরফের ওপর, কিন্তু হঠাৎ পেছন থেকে একটা ফাঁস উড়ে এসে সর্দারের মাথা গলে তার গলায় এঁটে গেলো, আর ফাঁসটি দ্বিতীয়বার আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে সর্দারের মুখের ভেতর থেকে তার জিভ বেরিয়ে এলো। খানিকক্ষণ ছটফট করার পর, সর্দারের প্রাণহীন দেহ সেইখানেই পড়ে রইলো।—এই ভাবে নিজেদের ঘরোয়া শত্রুতার ঝাল মিটিয়ে নিলে অপর এক এস্কিমো।

এত বড় একটা সাংঘাতিক কাজ,—হয়ে গেলো যেন চোখের পলকে! আসন্ন মরণের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে জিম্ ও ডিকের সারা হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয়ে গেলো। তারা অভিভূত ভাবে এগিয়ে এসে এস্কিমোদের প্রত্যেককে আলিঙ্গন করে, প্রত্যেকেরই কর-চুম্বন করলে।

বিদেশ-বিভুঁই জায়গায় তারা পেয়ে গেলো বন্ধু—অগণিত বন্ধু!—

মহা আনন্দেই কেটে গেলো দিন পনেরো। জিম্ ও ডিক্ এস্কিমোদের বাড়িতে বাস করে, তাদের সঙ্গে খায়, তাদের সঙ্গেই খেলাধুলা আমোদ-প্রমোদ করে! এস্কিমো-মেয়েরা ওদের গান শোনায়, ওরাও শোনায় তাদের ইংরেজী গান। মাঝে মাঝে ওরা দুজন বেড়িয়ে আসে বাইরে থেকে, এস্কিমোদের স্লেজ গাড়ি নিয়ে।

কিন্তু দুজনেই তারা লক্ষ্য করলে, কুকুরগুলো যেন ওদের পোষ মানতে চায় না! ওরা যে বিদেশী, কুকুরগুলোও বুঝি তা জেনে ফেলেছে! কিন্তু নেহাত গাড়ির সঙ্গে আঁটা থাকে লাগাম ইত্যাদি দড়াদড়ি দিয়ে, তাই কিছু করে উঠতে পারে না। নইলে গাড়িটানা এইসব হিংস্র কুকুর কবে যে ওদের দফা শেষ করে দিতো, ঠিক নেই!

কাজেই ডিক্ আর স্লেজগাড়ি নিয়ে যেতে চায় না, কিন্তু জিম্ তবু তা গ্রাহ্যই করে না—সে আবারও বেরুলো গাড়ি নিয়ে।

সাদা বরফের মাঠ—তারই ওপর দিয়ে কুকুরগুলো ছুটলো গাড়ি নিয়ে হাওয়ার মতো। উঁচু-নীচু অসমান পথে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ কেমন করে এক সময় গাড়িখানা উলটে গেলো, কুকুরগুলোর দড়াদড়িও গেল ছিঁড়ে।

আহত কুকুরগুলো ব্যথা পেয়ে একবার আর্তনাদ করে উঠলো, চেষ্টা করলো

ছুটে পালাতে। জিম্ তার হাতের চাবুক ওদের পিঠের ওপর একবার খেলিয়ে দিলে তাদের সংযত রাখবার জন্য।

চাবুক খেয়ে ওরা যেন হিংস্র হয়ে উঠলো চতুর্গুণ! একটা কুকুর তো তেড়ে লাফিয়ে এলো তার দিকে। সাহস পেয়ে তখন অপর কুকুরগুলোও সেদিকে ছুটে এসেছে, একটা এসে কামড়ে দিলে বাঁ-পায়ের উরু!

জিম্ তখন মরিয়া হয়ে তাদের বাধা দিতে শুরু করলে—ডান হাতের চাবুক সে বাঁ হাতে নিয়ে, তাই দিয়ে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো ঘন ঘন। আর ডান হাতে সে তার রিভলভার বার করবার চেষ্টা করতে লাগলো—অমন বিপদের মধ্যেও!

এস্কিমোদের হিংস্র কুকুরের দল ততক্ষণে ক্ষেপে উঠেছে! তারা একযোগে তাকে আক্রমণ করে পর্যুদস্ত করে তুললো। কিন্তু হঠাৎ একটা কুকুর আবিষ্কার করলে যে, তাদেরই অদূরে চুপিচুপি এগিয়ে আসছে একটা শ্বেত ভল্লুক—এস্কিমো-দেশের সাক্ষাৎ যম!

কি একটা সংকেত-ধ্বনি করলো সেই কুকুরটা! সঙ্গে সঙ্গে সবগুলো কুকুরই সহসা পেছন ফিরে তাকালো, আর তারপর মুহূর্তমধ্যে সবাই মিলে একসঙ্গে ছুটে পালালো যার যেদিকে খুশী!

জিম্ মুক্তির নিঃশ্বাস ফেললো; কিন্তু তক্ষুণি টেনে বার করলো তার রিভলভার! সঙ্গে সঙ্গে রিভলভারের গর্জনে চারদিক প্রতিধ্বনিত হলো আর লুটিয়ে পড়লো শ্বেত ভল্লুক! খানিকটা দূর থেকে কুকুরগুলো দেখলে, তাদেরই চিরশত্রু জন্মের মতো লুটিয়ে পড়েছে আর তখনো তার রক্ত ছুটছে ফিনকি দিয়ে!

মাংসের লোভে তারা তক্ষুণি ভালুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, আর দেখতে দেখতে তার বিরাট দেহটা খণ্ড খণ্ড করে তারা লুফে নিতে শুরু করলো।—

জিমের পক্ষে সেই হলো তার মাহেন্দ্রক্ষণ বা পূর্ণ সুযোগ! সে তক্ষুণি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলো তার বাসস্থানের দিকে। কিন্তু তার ক্ষত-বিক্ষত দেহ বেশীক্ষণ তার ভার সইতে পারলো না—সে খানিক দূর যেতে না যেতেই মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে রইলো।—

এরপর তারা আবার যখন তাদের দেশে ফিরে এলো, তখন পাড়া-প্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধবদের কাছে তারা যেন উপাস্য দেবতা হয়ে দাঁড়িয়েছে! ক্যাপ্টেন স্কট বা আমুণ্ডসেনের চেয়ে তখন তাদের সম্মানও কোন অংশে কম নয়! প্রমাণ হয়ে গেলো সকলের কাছেই যে, তারা বীর, তারা সাহসী!—

সঙ্গে সঙ্গে রিভলভারের গর্জনে চারদিক প্রতিধ্বনিত হলো। [পৃঃ ১৭৪

তবু একটা কথা তাদের বুকের ভেতর অনবরতই খোঁচা দিচ্ছিল। ভাগ্য তারা মানতো না কোনদিনই; কিন্তু এখন মনে হয় 'ভাগ্য' কথাটা একেবারেই মিথ্যে নয়। তা নইলে কি নিরীহ এস্কিমো আর এস্কিমোদের স্লেজটানা কুকুর কখনো অমন হিংস্র হয়ে উঠতে পারে? আর ভাগ্য যদি নাইই থাকবে, তাহলে জিম্ যখন হিংস্র কুকুরদলের আক্রমণে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিল, সে রকম সময়ে কি তার জীবনের 'শান্তিদূত' ঐ শ্বেত-ভল্লুকের উদয় হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল?

কাজেই দুরন্ত আবিষ্কারক ও পর্যটক জিম্ আর ডিক্ এখন অদৃষ্টবাদী—অদৃষ্টকে তারা মানে। কিন্তু তার সঙ্গে একথাও তারা বিশ্বাস করে যে, সাহসীর মৃত্যু নেই। সাহস করে রুখে দাঁড়িয়েছিল বলেই জিম্ বাঁচবার সুযোগ পেয়েছিল।—

———

আশা-পরী

—দীপেন সেনগুপ্ত

অনেক অনেক সকাল, অনেক অনেক দিন, অনেক অনেক রাত ধরে পৃথিবী ঘুরছে। কত মানুষ তার বুকে এল—চলে গেল। পৃথিবী তাদের সবাইকে দেখেছে। আজ তার বয়স অনেক। আজও সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে—মানুষ কষ্ট পাচ্ছে, দুঃখ পাচ্ছে, ব্যথা পাচ্ছে। মানুষের মনে আজ জটিলতা, ঈর্ষা, হিংসা, বিদ্বেষ। তাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুড়ো পৃথিবী।

চিরদিনই কিন্তু এমনটি ছিল না। আগে, যখন আজকের পৃথিবীর বয়স ছিল অল্প, সে নিজের আনন্দে ঘুরত, দুঃখ বলে কিছু জানত না। মানুষও জানত না সেদিন ঈর্ষা, হিংসা, বিদ্বেষ, নিষ্ঠুরতা। কিন্তু তারপর কি করে সমস্ত পৃথিবীতে নেমে এল অশান্তি, সেই গল্পই বলছি শোনো—।

চন্দ্রচূড়

পৃথিবীর সেই অল্প বয়সের দিনের কথা।

এক দেশে একটি ছেলে বাস করতো। তার কোন নাম ছিল না, তার বাবা-মা কেউ না থাকায় তাকে কেউ কোনো নামই দেয়নি। সে একা থাকতো বলে, দূর দেশ থেকে একটি ছোট মেয়ে তার সঙ্গে থাকতে এল। পৃথিবীতে মেয়েটিরও কেউ ছিল না। লোকে তাকে 'প্যাণ্ডোরা' বলে ডাকতো। ওদের ভালই হলো। ওরা দুজনেই দুজনের বন্ধু হলো, খেলার সঙ্গী হলো।

প্রথম যেদিন প্যাণ্ডোরা ছেলেটির কুড়েঘরে এল, সেইদিনই একটা জিনিস তার নজরে পড়ল—একটা ছোট্ট কাঠের বাক্স।

প্যাণ্ডোরা ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা না করে পারল না : "ঐ বাক্সটাতে তোমার কী আছে ?"

ছেলেটি একটু আমতা আমতা করে বলে : "ও একটা গোপনীয় ব্যাপার। আমাকে ওটা যত্ন করে রাখতে দেওয়া হয়েছে। আমি রেখে দিয়েছি—ব্যস্। এর বেশী আমিও কিছু জানি না, আর তুমিও এ বিষয়ে আর কিছু জিজ্ঞেস করো না আমায়।"

মেয়েটি কিন্তু এই ছোট্ট জবাবে খুশী হতে পারল না। সে আবারও প্রশ্ন করল : "বাঃ! বাক্সটা কে দিল আর কোত্থেকেই বা এল ?"

ছেলেটি গম্ভীর হয়ে বলে : "সে কথাও বলতে বারণ।" প্যাণ্ডোরা এবার বিরক্ত হয়, শেষে বলে : "দুত্তোর! আমি ঐ নোংরা বাক্সটাকে দূর করে দেব। একটা অকেজো জিনিস পড়ে রয়েছে ঘরের মধ্যে।"—বলেই সে ভ্রূ কুঁচকে লক্ষ্য করে ছেলেটিকে।

ছেলেটি নানা কথা বলে চাপা দিতে চায় ব্যাপারটি। শেষে সে বলে : "খেলার দেরি হয়ে যাচ্ছে, চল। ঐ বাক্সটার কথা অত না ভাবলেও চলবে।"

প্যাণ্ডোরা তখনকার মত বাক্সটার কথা ভুলে, খেলতে চলে গেল।

বাড়ি ফিরেই, সে আবার গিয়ে দাঁড়াল বাক্সের সামনে। অনেকটা নিজের মনেই বলে : "কী এমন থাকতে পারে ? কেই বা আনল এটাকে ?"

● দীপেন সেনগুপ্ত

তারপর ছেলেটির দিকে ফিরে অনুনয় করে বলেঃ "আচ্ছা একটুখানি বলই না! ওটার সম্বন্ধে জানতে না পারলে, আমার যে ভাল লাগছে না।"

ছেলেটি বোঝে প্যাণ্ডোরার কৌতূহল খুব বেশী। তাই সে বোঝাবার জন্যে মাথা নেড়ে বলেঃ "আমি তোমার চেয়ে এক বিন্দুও বেশী জানি না, প্যাণ্ডোরা! বিশ্বাস কর।"

প্যাণ্ডোরাও নাছোড়বান্দাঃ "বেশ, তাহলে তুমি তো এটা খুলতে পারো। আর আমরাও দুজনে দেখে নিতে পারি এটার মধ্যে কী আছে?"

বাক্সটি খুলতে বলায় ছেলেটি সাপ দেখার মত যেন চমকে উঠল।—সে কী করে হয়? বাক্সটা যে একজন তাকে বিশ্বাস করে রাখতে দিয়েছে! বলে কী মেয়েটা?

তার মুখ দেখে বুঝতে পারল প্যাণ্ডোরা যে, খুলতে রাজী নয় ও। তাই বাক্স খুলতে বলার আর সাহস না পেয়ে সে বল্লেঃ "যাকগে, নাইবা খুললে। কিন্তু বাক্সটা কেমন করে পেলে, সে কথাও বলতে কী দোষের?"

কিছুক্ষণ ছেলেটি চুপ করে কী যেন ভাবে। তার পর আস্তে আস্তে বলেঃ "তুমি আসার কিছুক্ষণ আগে একটা লোক বাক্সটাকে নিয়ে আমার দোরগোড়ায় এসে বসেছিল। অদ্ভুত ধরনের তার সাজ-পোশাক। গায়ের জামাটা ধোঁয়াটে রংয়ের, মাথায় একটা টুপি, টুপির অর্ধেকটা পালকের তৈরী। তার আবার পাখির মত দুটো ডানা আছে।"

মেয়েটি তার ঔৎসুক্যভরা চোখ দুটো কুঁচকে বলেঃ "তার চেহারাটা কেমন বল দেখি?"

—"ওঃ সে এক অদ্ভুত চেহারা। আমার মনে হয়, সে রকম চেহারা তুমি জীবনে দেখনি। তার চেহারাটা দেখলে তোমার মনে হবে যেন দুটো সাপ একটা লাঠির গায়ে পেঁচিয়ে উঠেছে।"

প্যাণ্ডোরা বলেঃ "হুঁ! তাকে আমি চিনেছি। এ নিশ্চয় মার্কারি দেবতা। সেই আমাকে এখানে পাঠিয়েছে। আর তাহলে বাক্সটাকেও রেখে গেছে আমার জন্যে। ওটার মধ্যে নিশ্চয় আমার জামাকাপড় রয়েছে, আর রয়েছে দুজনের খেলনা।"

চন্দ্রচূড়

ছেলেটি নিস্পৃহের মত উত্তর দেয়ঃ "তা হবে। কিন্তু মার্কারি যতক্ষণ না নিজে এসে বাক্সটাকে খুলতে বলছেন, ততক্ষণ আমাদের কারুরই কোন অধিকার নেই ওটা খোলার।" এই বলে ছেলেটি কি কাজে বাইরে বেরিয়ে গেল।

প্যাণ্ডোরা আপন মনেই বলেঃ "ছেলেটা তো আচ্ছা বোকা! আর যেমন বোকা তেমনি ভীতু।" তারপর সে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বাক্সটাকে ভাল ভাবে লক্ষ্য করে। না, বাক্সটি তো মোটেই নোংরা নয়।—বেশ সুন্দরই তো! সে অবাক হয়ে দেখে, বাক্সটার গায়ে নানারকম কারুকার্য করা।

প্যাণ্ডোরা বাক্সটির দিকে আর একটু এগিয়ে গেল। সাধারণ বাক্সের মত কোন তালা-চাবি আটকানো নেই বাক্সটিতে। একটা সোনার দড়ি দিয়ে, এক অদ্ভুত ধরনের গিঁট দিয়ে বাক্সটিকে বেঁধে রাখা হয়েছে। প্যাণ্ডোরা ভীষণ অবাক হল। এ-রকম অদ্ভুত ধরনের গিঁট বাঁধা সে জীবনে দেখেনি। এর শুরু বা শেষ খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। অতি দক্ষ লোকও গিঁটটাকে খুলতে পারবে না।

প্যাণ্ডোরা খুব মনোযোগ দিয়ে বাক্সটাকে দেখতে লাগল। দড়ির গিঁটটায় হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে আপন মনেই বলে ওঠে সেঃ "উঃ কি গিঁটরে! একটু চেষ্টা করলেই অবিশ্যি খোলা যাবে! একবারটি খুলে শুধু এই গিঁট বাঁধার ধরনটা শিখে নেব; তারপর দড়িটা আবার বেঁধে রাখলেই চলবে। বাক্সটি খুলব না। বোকা ছেলেটা তাহলে ভীষণ রাগ করবে।"

যতবার সে দড়িটাকে দেখতে লাগল, ততবারই চলতে লাগল খোলার চেষ্টা। হাত দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ মৃদু টান দিল সে দড়িটায়। সঙ্গে সঙ্গে ভোজবাজি ঘটে গেল যেন। অমন শক্ত গিঁটটা খুলে গিয়ে দড়িটা আলগা হয়ে ঝুলে পড়ল বাক্সের গায়ে।

এবারে প্যাণ্ডোরা কিন্তু বেশ ভয় পেয়ে গেল,—এ আবার কী? কখনও এমনটা তো হতে দেখিনি! ওটা আবার বাঁধতে পারব তো?

সে দু একবার চেষ্টা করল কিন্তু কিছুতেই দড়ির মুখ দুটোকে ঠিকমত লাগাতে

পারল না। এখন আর দড়িটাকে বাক্সের গায়ে জড়িয়ে, ফেলে রাখা ছাড়া উপায় নেই। ছেলেটা বাড়ি ফিরে এসে যা হয় করবে।

হঠাৎ এক দুষ্টু বুদ্ধি মাথায় এল তার,—ছেলেটা বাড়ি ফিরে যখন দড়িটা খোলা দেখবে, নিশ্চয় বুঝবে আমার কাজ। আর কী করেই বা তাকে বিশ্বাস করাব যে, বাক্সটা আমি খুলিনি! সে ভাবল,—তাহলে ও যখন বিশ্বাসই করবে না, তখন আর বাক্সটি খুলে উঁকি দিয়ে দেখতে দোষ কী? তারপর বাক্সের ঢাকনাটি ঠিকমত বন্ধ করে রাখলেই চলবে।

ঠিক এই সময় ছেলেটিও এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে। সে ইচ্ছে করলেই চেঁচিয়ে বারণ করতে পারত প্যাণ্ডোরাকে। কিন্তু তারও একটু দেখার লোভ হল। সে ভাবল,—আমি তো আর খুলিনি! যদি দোষ হয় তো আমার হবে না। বাক্স সম্বন্ধে তারও কৌতূহল হল,—সত্যি যদি কোন মূল্যবান জিনিস পাওয়া যায় এর মধ্যে! দুজনেই সমান ভাগ করে নেবে তাহলে!

প্যাণ্ডোরা যেমন আস্তে আস্তে বাক্সের ঢাকনাটা তুলছে, সঙ্গে সঙ্গে অমনি কোত্থেকে ঘন কালো মেঘ এসে সূর্যকে ঢেকে ফেলছে। সমস্ত কুড়েঘরে নেমে আসছে রাতের অন্ধকার। আকাশে ঘন ঘন বাজ ডাকছে।

প্যাণ্ডোরা বাক্স খোলার উত্তেজনায় এমনই মশগুল ছিল যে, অন্যদিকে তাকাবার তার ফুরসত ছিল না। বাক্সের ঢাকনাটা তুলতেই—ভিতর থেকে ডানাওয়ালা এক-রকমের বড় বড় পোকা ফরফর করে বাইরে বেরিয়ে এসে ঘরময় উড়ে বেড়াতে লাগল। পরক্ষণেই ছেলেটি চিৎকার করে কেঁদে উঠল: "উঃ! জ্বলে গেল, জ্বলে গেল। আমাকে হুল ফুটিয়েছে, আমার সারা শরীর জ্বলে গেল। উঃ! প্যাণ্ডোরা, এ কী করলে তুমি? কেন ঐ ভয়ংকর বাক্সটা খুললে?"

প্যাণ্ডোরার হাত কাঁপছিল, বাক্সের ঢাকনাটা হাত থেকে পড়ে গেল সশব্দে! সে তাড়াতাড়ি ছেলেটার কাছে দৌড়ে দেখতে গেল, কী হয়েছে তার? কিন্তু ঘরের ঘন অন্ধকারের মধ্যে কিছুই সে দেখতে পাচ্ছিল না। যন্ত্রণায় ছেলেটা শুধু ঘরময় দাপাদাপি করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আর একটা শব্দও কানে আসছিল তার—যেন লক্ষ

চন্দ্রচূড়

লক্ষ মৌমাছি ফরফর করে ঘরময় উড়ছে। হঠাৎ বিদ্যুতের এক ঝলকে সে দেখতে পেল, বাদুড়ের মত এক ধরনের প্রাণী। তাদের দুটো করে কালো কালো ডানা, পিছনে শুঁড় পাকানো এক রকমের লেজ, আর লেজের ডগায় মস্ত এক হুল। কি ভয়ংকর, কি বিশ্রী!

প্যাণ্ডোরা ভাবল—এদেরই কোন একটা ছেলেটিকে কামড়েছে। কিন্তু তাকেও আর বেশীক্ষণ ভাবতে হলো না। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেও দাপাদাপি শুরু করে দিল। তাকে একসঙ্গে দুটো পোকায় কামড়েছে!

পোকাগুলো তাদের কুৎসিত ডানা মেলে প্যাণ্ডোরা আর ছেলেটার সারা গায়ে হুল ফুটিয়ে উড়ে বেড়াতে লাগল, আর গান গাইতে লাগল ঃ

“পাখনা মেলে নামবি চল্
নামবি চল্।
গভীর ঘন আঁধার নামে
সূর্য গেছে অস্তাচল—
নামবি চল্।
দুঃখ-শোকে, হিংসা-বিষে
ভরিয়ে বাতাস তিক্ত-শিসে
ডাকছে যে আজ আঁধারতল
নামবি চল্।”

গান শেষ হতে পোকাগুলো জানলা দিয়ে বাইরের দিকে উড়ে চলে গেল। ওদের কানে এসে পৌঁছয় গানের শেষের দু কলি,—নামবি চল্, নামবি চল্। ওরা দুজনে কাঁদে—সমস্ত গায়ে ওদের বিষ ঢেলে দিয়ে গেছে। কাঁদতে কাঁদতে দুজনেই দুজনের দিকে কুটিল দৃষ্টিতে তাকায়।

হঠাৎ তারা শুনতে পেল, বাক্সের ভিতর থেকে একটা শব্দ উঠছে। শব্দটা শুনে তাকিয়ে দেখে, ছোট্ট একটা হাত বাক্সের ভিতর থেকে ঢাকনাটা উপরে ঠেলে তোলার চেষ্টা করছে।

● দীপেন সেনগুপ্ত

প্যাণ্ডোরা কাঁদতে কাঁদতেই জিজ্ঞেস করল ঃ "কে ? তুমি কে ?"

"প্যাণ্ডোরা, এ কী করলে তুমি ? কেন ঐ ভয়ংকর বাক্সটা খুললে ?" [পৃঃ ১৮০

বাক্সের ভিতর থেকে একটা মিষ্টি গলায় উত্তর এল ঃ "ঢাকনা তুললেই দেখতে পাবে।"

কিন্তু এবারে আর ঢাকনা খুলতে সাহস হয় না প্যাণ্ডোরার। আড়চোখে সে ছেলেটাকে দেখে। ছেলেটা তখনও কেঁদে চলেছে।

প্যাণ্ডোরা এবার কাঁদো-কাঁদো স্বরে উত্তর দেয় ঃ "না, আমি পারব না, আমার ভয় করছে। ঐ যেগুলো উড়ে গেল, ওদের হুলের ঘায়ে আমাদের ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। আমরা ও বাক্স আর খুলব না।"

সেই মিষ্টি গলায় আবার উত্তর এল ঃ "ওগো, আমি তাদের কেউ নই। তারা আমার বন্ধুও নয়। এস প্যাণ্ডোরা, লক্ষ্মীটি আমাকে বাইরে বের কর।"

কণ্ঠস্বরটিতে এমন আশ্বাস ছিল, এমন মমতার সুর ছিল যে, ওরা না এগিয়ে পারল না। এবারে ছেলেটিই বাক্সের ঢাকনা খুললে।

ঢাকনা খুলতেই, রামধনু রঙা একজোড়া ঝলমলে পাখা নিয়ে বেরিয়ে এল ছোট্ট এক পরী। এক মুহূর্তে সমস্ত ঘর আলোয় ঝলমল করে উঠল। সেই আলোয় ওরা দেখতে পেল, পরীটি ওদের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসছে। তারপর পরীটি প্রথমে উড়ে গিয়ে দাঁড়াল ছেলেটির কাছে। কোমল হাত সে বুলিয়ে দিল ছেলেটির কপালে। ছেলেটির সমস্ত ব্যথা কষ্ট একমুহূর্তে চলে গেল। তারপর পরী গিয়ে দাঁড়াল প্যাণ্ডোরার কাছে। প্যাণ্ডোরাকে কাছে টেনে নিয়ে তার কপালেও একটা চুমু দিল পরী। প্যাণ্ডোরারও মনে হল তার দেহে বা মনে কোন ব্যথা, কোন কষ্ট নেই। ঠিক আগে যেমন ছিল, তেমনটি হয়ে গেছে যেন।

প্যাণ্ডোরা জিজ্ঞেস করেঃ "লক্ষ্মীটি পরী, বল তুমি কে ?" পরী মৃদু হেসে বলেঃ "আমি আশা। আমি দুঃখের পিছন পিছন ফিরি। তোমরা যখন ডাকো, তখনই তো আর থাকতে পারি না।"

ছেলেটি এতক্ষণে জিজ্ঞেস করেঃ "আচ্ছা ঐ যে কতকগুলো বিশ্রী পোকা আমাদের কামড়ে দিয়ে গেল, ওরা কারা ? কোথেকেই বা এল ওরা ? আমরা তো ওদের এই বাক্স থেকে মুক্তিই দিলাম, তবু ওরা আমাদের কামড়ে গেল কেন ?"

মেয়েটিও বলেঃ "আর ঐ গান—নামবি চল্, নামবি চল্ ? গাইতে গাইতে গেল—কি বলতে চাইল ওরা ?"

এবারে পরী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তার চোখে-মুখে নেমে আসে বিষাদের ছায়া। সে আস্তে আস্তে বলেঃ "ওরাই দুঃখ, ওরাই শোক ; ওরাই ঈর্ষা, হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা। পৃথিবীর যত কিছু নীচতা, ঘৃণা, হীনতার সঙ্গে ওদের ভাব। ওরা আজ পৃথিবীতে নেমে এল। গান গাইতে গাইতে ওরা তাই চলে গেল—বাসা বাঁধতে চলেছে সারা পৃথিবীতে। পৃথিবীর যেখানে, মানুষের মনের যে কোণে, যত কিছু কালো, যত কিছু অন্ধকার আছে, সেখানে ওরা বাসা বাঁধবে, আস্তানা গড়বে। আজ থেকে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ এই সব পোকাদের কামড়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। সমস্ত আকাশ, বাতাস ভরে উঠবে মানুষের কান্নার শব্দে।"

প্যাণ্ডোরা আর ছেলেটির মুখ কাঁদো-কাঁদো হয়ে যায়। প্যাণ্ডোরা ভাবে, কেন

● দীপেন সেনগুপ্ত

সে খুলতে গেল বাক্সটা। ছেলেটি ভাবে, কেন সে জোর করে বাধা দিল না প্যাণ্ডোরাকে ? তারা দুজনেই ভাবে, তারাই দায়ী সমস্ত পৃথিবীতে দুঃখ-কষ্ট টেনে আনার জন্যে।

পরী ওদের মনের কথা বুঝতে পেরে বলেঃ "এতে দুঃখ করার কিছু নেই। যদিও বাক্সটা খোলার জন্যে তোমরাই দায়ী, তবু আমি জানতাম এ ঘটনা ঘটবেই। মার্কারির কথা শুনলে হয়ত এরকমটা হত না, তবু……"

ওরা দুজনেই এক সঙ্গে জিজ্ঞেস করেঃ "তবু কী ?"

"তবু অশান্তি নেমে আসত পৃথিবীতে। পৃথিবীর মানুষ কেবল যদি সুখই পায়, যদি কিছুমাত্রও দুঃখের পরিচয় না পায়, তা হলে মানুষ দেবতাদের যে ভুলে যাবে !"

প্যাণ্ডোরা বিস্মিত হয়ে বলেঃ "কিন্তু মানুষ যদি এই রকম ব্যথাই পায়, কষ্ট দুঃখই পায়—তাহলে পৃথিবীতে সে বেঁচে থাকবে কী করে ?"

পরী এবার আরও মিষ্টি করে হাসলঃ "বেঁচে থাকবে আমার জন্যে। সেই জন্যেই তো আমি আছি।"

প্যাণ্ডোরার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবারেঃ "তুমি থাকবে ? থাকবে তুমি ? সত্যি কি মিষ্টি তোমার হাসি, কি সুন্দর তোমার রামধনু-রঙা ডানা !"

পরক্ষণেই সে আবার চিন্তিত হয়ে প্রশ্ন করেঃ "কিন্তু দুঃখের হাত থেকে, কষ্ট থেকে কী করে রক্ষা করবে আমাদের ?"

—"আমি যে সবসময়েই তোমাদের কাছে-কাছে, পাশে-পাশে থাকব ! যখনই তোমরা দুঃখে কষ্টে ভেঙে পড়বে, তখনই আমার দেখা পাবে তোমরা। আমার হাতের ছোঁয়ায় তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে। পৃথিবীতে আবার সুখ-স্বস্তি শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্যে নতুন ব্রতে দীক্ষা নেবে। হয়তো মাঝে মাঝে আমার দেখা পাবে না, মনে করবে আশা-পরী বোধহয় আর আসবে না। বোধহয় সে ভুলে গেছে। ঠিক সেই সময়েই আমার হালকা পাখায় ভর দিয়ে তোমাদের কাছে এসে, আমি তোমাদের গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দেব ! তোমরা ভুলে যাবে সব কিছু ব্যথা, সব

কিছু শোক-কষ্ট-জ্বালা। তবে আমার উপরে বিশ্বাস রাখতে হবে তোমাদের। বিশ্বাস না রাখলে আমাকে আর কোনদিনই পাবে না তোমরা।"

ওরা দুজনেই একসঙ্গে বলে ওঠে: "নিশ্চয় বিশ্বাস রাখব, আশা-পরী তোমার উপরে।"

আশা-পরী ওদের দুজনকে নিজের কাছে টেনে নিতে নিতে বলে: "তাহলে আমিও কোনদিন তোমাদের ছেড়ে যাব না।"

প্যাণ্ডোরা তার উজ্জ্বল চোখ দুটি মেলে বলে: "কোনদিনও যাবে না? চিরদিনই থাকবে?"

ওদের দিকে সস্নেহ দৃষ্টি মেলে আশা-পরী উত্তর দিলে: "হ্যাঁ, চিরদিনই থাকবো।"

নায়েক নীরু সেন

—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

"হুকুমদার !"—হাঁকল দশম আসাম রাইফেল বাহিনীর সান্ত্রী।

"ফ্রেণ্ড !"—জবাব এল কম্বল ঢাকা মূর্তিটার কাছ থেকে।

"পাস্-ওয়ার্ড ?"

"নেহরু !"

"দরকার ?"

"কমাণ্ডারের সঙ্গে দেখা করব।"

"নাম ? পরিচয় ?"

"গাবাটুং, নাগা ডিফেন্স কমিটির সেক্রেটারি।"

গাবাটুং নামটা শুনেছে সান্ত্রী। ও-নাম না শুনেছে এমন সৈনিক আসাম রাইফেলে নেই। ও-নামে না ভয় পায়, এমন নাগরিক নেই নাগা হিল তুয়েনসাং এলাকায়। গণ্ডারের চাইতে গোঁয়ার, সাপের চাইতে খল। আর হিংস্রতায় তো সে

বাঘকে লজ্জা দিয়ে ছাড়ে। গলায় ছুরি সে দেয় না, বুকেও বিঁধিয়ে দেয় না বল্লম। স্রেফ মাথার চামড়াটি ছাড়িয়ে কোমরে গুঁজে চলে যায়। এমন ওস্তাদির সঙ্গে এত তাড়াতাড়ি কাজটি সমাধা করে যে হতভাগ্য শিকার ব্যাপারটা বুঝতে পারার আগেই দেখতে পায় তার কানের উপর থেকে গোটা মাথা-জোড়া একটা টাক। না! টাক তাকে বলা যায় না ; কারণ টাকে চুল না থাকুক চামড়া থাকে। গাবাটুং যার মাথায় ছুরি চালিয়েছে তার চুল-চামড়া কিছুই থাকে না।

সান্ত্রী শুনেছে গাবাটুং-এর স্বভাবের কথা। আরও শুনেছে—সরকারের হুলিয়া আছে ওর নামে। জ্যান্ত হোক, মরা হোক, ওকে হাজির করে দিতে পারলে যে-কেউ দশ হাজার টাকা ইনাম পাবে সরকার থেকে। কিন্তু এ সময় গাবাটুং-এর দিকে রাইফেল তাক করে দশ হাজার টাকা তড়িঘড়ি রোজগার করে ফেলার অধিকার তার নেই। সে এখন ডিউটিতে রয়েছে। গাবাটুং এসেছে কমাণ্ডারের সঙ্গে দেখা করতে। পাস্-ওয়ার্ড সে জানে। এর অর্থ এই যে কমাণ্ডার তাকে আসতে বলেছেন। কমাণ্ডার যাকে সাংকেতিক শব্দটি জানাননি, সে জানবে কেমন করে? আজকের সংকেত শব্দ হচ্ছে ঐ "নেহরু"।

অতএব দশ হাজার টাকা মুনাফা করার লোভ সংবরণ করে তাকে কলিং-বেল টিপতে হল। ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটি আঠারো-কুড়ি বছরের ছোকরা ; ছিপছিপে ফরসা চেহারা, পরনে সাদাসিধে খাকী প্যাণ্ট আর বুশকোট। দেখলেই বুঝতে পারা যায়—আধা-জঙ্গী কর্মচারী। 'আধা-জঙ্গী' তাদেরই বলা হয় যারা সৈন্যদলে থেকেও সৈনিক নয়—যথা ডাক্তার, নার্স, কেরানী, কুলি, রাঁধুনী, চাকর ইত্যাদি।

সান্ত্রী বলল—"ইনি গাবাটুং নাগা ডিফেন্স কমিটির সেক্রেটারি। কমাণ্ডারের সঙ্গে দেখা করতে চান, নায়েকজী।"

নায়েক অর্থাৎ নায়েক-কেরানী। নীরু সেন আজ মাত্র কয়েকদিন আগে কলকাতা থেকে এসেছে, নতুন চাকরি নিয়ে। জীবনে উচ্চাশা ছিল অনেক, কিন্তু যোগ্যতা থাকলেও সে-উচ্চাশা পূর্ণ হওয়ার কোন আশা দেখতে পায়নি বেচারা। সামরিক বৃত্তির উপরেই তার ঝোঁক, কিন্তু সামরিক কলেজে শিক্ষালাভের দক্ষিণা দেবার

ক্ষমতা তার নেই। তাই অগত্যা সে আধাসামরিক কাজ নিয়ে এসেছে—এই নায়েক-কেরানীর পদে। দুধের অভাবে পিটুলিগোলা খাওয়ার মত।

অল্পদিনই এখানে আছে নীরু, কিন্তু গাবাটুং-এর কীর্তির কথা সে শুনে ফেলেছে এর মধ্যেই। সেই লোক কমাণ্ডারের সাক্ষাৎ চায়? কমাণ্ডারও সাক্ষাৎ করতে ডেকেছেন তাকে? অবাকভাবে একবার লোকটার মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে নিয়ে সে আবার ভিতরে ঢুকল—কমাণ্ডারকে খবর দেবার জন্যে।

আর সেই মুহূর্তে গাবাটুং লাফিয়ে পড়ল সান্ত্রীর উপরে। তার চিরদিনের রীতি অনুযায়ী মাথা বেড় করে ছুরির দাগ দিল না, আগেভাগেই ছুরি বসিয়ে দিল বুকে। ওদিকে গলাও চেপে ধরেছে ভীষণ জোরে; টুঁ শব্দটি না করে সান্ত্রী বেচারা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

হঠাৎ একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল ছাউনির এই গেট-এর উপরেই। প্যাঁচা?—না, আসল প্যাঁচা এটা নয়, গাবাটুংই প্যাঁচার ডাক ডেকে উঠেছে। সেই ডাক শোনামাত্রই নিঃশব্দে দৌড়ে আসছে একটার পর একটা নাগা। দূরের একটা ঝোপের আড়ালে তারা লুকিয়ে ছিল এতক্ষণ, সংকেত পেয়েই ছুটে আসছে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত। আসাম রাইফেল-এর ছাউনিটা আজ পুরোপুরি শিকার করাই গাবাটুং-এর মতলব। ছাউনিতে মাত্র দুশো সৈনিক, সে-খবর সে পেয়েছিল, তাই নিজের সঙ্গেও দুশো নাগাই সে এনেছে। একজন ভারতীয় সৈনিককে ঘায়েল করতে কি একজন নাগাই যথেষ্ট নয়? গাবাটুং বরাবর দেমাক করে বলে আসছে—'নিশ্চয়ই যথেষ্ট'। সে দেমাক যে মিছে নয়, তারই প্রমাণ সে আজ দেবে। নির্মূল করে যাবে আসাম রাইফেল-এর এই ছাউনি।

নীরু সেন ওদিকে কমাণ্ডারের অনুমতি পেয়ে গিয়েছে। সত্যিই তিনি প্রত্যাশা করছেন গাবাটুংকে। ভারত সরকারের নীতিই তো নাগাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করা! গাবাটুং যখন গোপনে কমাণ্ডারের সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ চাইল, তখন ভদ্রলোক ভাবলেন—বোঝানো-সোঝানোর এই একটা সুবর্ণ সুযোগ এসেছে। তিনি তাকে পাস্-ওয়ার্ড পাঠিয়ে দিলেন। বেইমানি করবে গাবাটুং, এটা তিনি সম্ভব মনে

করেননি। মেসিনগানে সুরক্ষিত ছাউনিতে এসে জংলী নাগা বেইমানি করবার চেষ্টা করবে, এ তাঁর ধারণায় আসেনি।

কিন্তু নীরুর ধারণায় এটা এল। আগে আসেনি, এল এই প্যাঁচার ডাক শোনা-মাত্র। বনবাদাড়ে প্যাঁচা ডাকে বইকি! সেদিক দিয়ে এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু একসঙ্গে দুটো অসাধারণ ঘটনা ঘটে যায় যদি, সেইটেকেই অস্বাভাবিক বলে মনে করা উচিত ও নিরাপদ। এক্ষেত্রে এক নম্বর অসাধারণ ঘটনা ঘটেছে গাবাটুং-এর আগমন, দুই নম্বর ঘটল এই প্যাঁচার ডাক। সাবধান হওয়া ভাল নিশ্চয়ই।

গাবাটুং লাফিয়ে পড়ল সান্ত্রীর উপরে। [পৃঃ ১৮৮

কিন্তু সাবধান হওয়া-না-হওয়ার মালিক নীরু নয়। সে কেরানীমাত্র। ছাউনিতে লোক কম বলে কেরানীকে দিয়েই আরদালীর কাজ করাচ্ছেন কমাণ্ডার। সে-অধিকার তাঁর আছে, আর সে-কাজ করতে আপত্তিও নেই নীরুর। সব কাজই কাজ, যেমন শিকলের প্রত্যেকটা আংটাই আংটা। কোন কাজই অন্য কোন কাজের চাইতে কম গৌরবের নয়, এই রকম শিক্ষাই নীরু পেয়েছে।

কিন্তু কথা হল এই যে, সাবধান হতে হলে তাকে এখন ফিরে যেতে হয় কমাণ্ডারের কাছে, গিয়ে বলতে হয় যে—

চন্দ্রচূড়

যা-ই বলুক, কমাণ্ডার ইচ্ছে করলে তাতে চটে যেতে পারেন। নীরুকে তিনি হুকুম দিয়েছেন গাবাটুংকে নিয়ে এসে তাঁর ঘরে পৌঁছে দেবার জন্যে। তার বদলে সে যদি গিয়ে প্যাঁচার কথা তোলে, কমাণ্ডার তাকে ড্যাম্ ফুল বলে গাল দিতে পারেন, ছোট-বড় যা খুশী সাজা দিতে পারেন, চাকরি থেকে তাড়িয়ে দেবার সুপারিশ করবার অধিকারও তাঁর আছে।

উঁহু, প্যাঁচার কথা বলবার জন্যে মালিকের কাছে ফিরে যাওয়া চলে না।

কিন্তু দোর খুলে একা-একা বেরিয়ে পড়াও চলে না কোনমতে। ঐ প্যাঁচার ডাক যদি সত্যিই তেমন কোন সংকেত হয়, তাহলে এতক্ষণ সান্ত্রী বেচারা মারা পড়েছে বা বন্দী হয়েছে। দোর খুলে বেরুলে নীরুও তৎক্ষণাৎ হয় মারা পড়বে, নয় বন্দী হবে। সেনাবারিক দুশো গজ দূরে। আর ঘুমন্ত সেপাইদের ডেকে তুলে সঙ্গী যোগাড় করবার মত ক্ষমতাও কেউ তাকে দেয়নি। তবে ?

না না ! অত আর ভাবা যায় না। ভাবতে গিয়ে দেরি হচ্ছে শুধু। শাল-গাছের গায়ে শালগাছ পুঁতে পুঁতে ছাউনির দেয়াল তৈরী হয়েছে। সে-দেয়াল বত্রিশ হাত উঁচু। ভিতর দিকে গজাল দিয়ে বাটাম আঁটা। সেই বাটাম বেয়ে বেয়ে উপরে উঠতে লাগল নীরু।

দেয়ালের ভিতর দিকে পঞ্চাশ হাত পরে পরে পাহারাওয়ালা। এক নম্বর পাহারাওয়ালা নীরুর কাণ্ড দেখে ছুটে এল সঙ্গীন উঁচিয়ে। নীরু আস্তে বলল—"নেহরু"।

"নেহরু তো বটে ! কিন্তু ব্যাপার কী ?"—নায়েক-কেরানীকে চেনে পাহারা-ওয়ালারা, কিন্তু চিনলেও নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, পাস্-ওয়ার্ড শুনলেও ভরসা করা চলে না সব সময়। বেইমানি সর্বত্রই হতে পারে, হয়ে থাকে।

"প্যাঁচার ডাক শুনেছ ?"—বাটামের উপর দাঁড়িয়েই চুপি চুপি বলে নীরু,—"গাবাটুং বাইরে। তাকে ভিতরে নিয়ে যেতে এসেছি আমি কমাণ্ডারের হুকুমে। কিন্তু ঐ প্যাঁচার ডাক আমায় ভাবিয়ে তুলেছে। বাইরের চেহারা চোখে না দেখে হঠাৎ দরজা খুলতে সাহস পাচ্ছি না।"

চন্দ্রচূড়

বাটামের উপরে বাটাম। মই বেয়ে ওঠার মত বাটাম ধরে ধরে উঠতে থাকে নীরু। খাড়া দেয়াল, শালগাছগুলোর গা তেলের মত মসৃণ, তবু কাঠবেড়ালীর মত দ্রুত উঠতে থাকে তরতর করে। এক পলক থেমে নীচের পাহারাওলাকে বলে—"আমায় যদি ওপিঠে পড়ে যেতে দেখ, অ্যালার্ম বাজিয়ে দেবে।"

মিনিট দুইয়ের ভিতরই সে উঠে পড়ল মাথায়। ছাউনির সমুখদিকটা বিলকুল ফাঁকা। সান্ত্রীর যেখানে থাকবার কথা, সেখানে সান্ত্রী নেই; গাবাটুংও নেই ধারে কাছে। কোথায় গেল? কী হল? খুঁটির মাথায় পেট বাধিয়ে দিয়ে শরীরের আদ্ধেকটা হাওয়ার রাজ্যে বাড়িয়ে দিল নীরু।

পাছে উপর থেকে বা ভিতর থেকে এইরকমভাবে কেউ দেখবার চেষ্টা করে, এই ভয়ে গাবাটুং আগে থাকতে সাবধান হয়েছে। লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে নাগার দল শালের বেড়ার গা ঘেঁষে। নীরুর একেবারে ঠিক পায়ের তলাতে রয়েছে তারা, সহজে চোখে পড়ার কথা নয় এই রাতের আঁধারে। নীরু তাদের দেখতে পাচ্ছে না সেই জন্যই।

নীরু না দেখতে পাক, গাবাটুং তাকে দেখেছে। আগে দেখতে না পাক, নীরু তার দেহের আদ্ধেকটা বাড়িয়ে দিয়ে ঝুঁকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখেছে। দেখেই গর্জে উঠেছে মনে মনে। সন্দেহ হয়েছে ওদের? গোয়েন্দাগিরি করছে ছাউনিওয়ালারা? অভিযানটা ব্যর্থ হবে তাহলে? না, একেবারে ব্যর্থ হতে দেবে না গাবাটুং। দুশো সিপাহীকে ঘায়েল করতে না পারুক, দুটোকে অন্ততঃ করে যাবে। সান্ত্রীকে ঘায়েল করা হয়ে গিয়েছে, এইবার হাওয়ার রাজ্যে ঝুলন্ত ঐ কৌতূহলী লোকটাকে—

ধনুকে তীর জুড়ল গাবাটুং। উৎকট বিষ-মাখানো তীর। গায়ে যার ফুটবে, সে এক মিনিটে খতম হয়ে যাবে। তীর ছুড়তে গিয়ে কী ভেবে সে-তীর সরিয়ে রাখল গাবাটুং। বেছে নিল বিষহীন সাদা তীর। শিকারকে মেরে ফেলার চাইতে জ্যান্ত ধরতে পারলেই সুবিধে তার।

টুং করে শব্দ হল ধনুকের ছিলায়, একটা আর্তনাদ করে বত্রিশ হাত উপর থেকে ঘুরতে ঘুরতে পড়ে গেল নীরু। সঙ্গে সঙ্গে বাঁশি বাজাল ভিতরের পাহারাওয়ালা, ঢংঢং

করে বেজে উঠল পাগলাঘন্টি, আর বাইরের দুশো নাগা প্রাণপণে দৌড়ে পালিয়ে গেল জঙ্গলের আড়ালে। নীরুকে তারা কাঁধে করে নিয়ে গেল। সান্ত্রীর নিয়ে গেল শুধু মাথার চামড়াটা।

কমাণ্ডার এসে খোঁজখবর নিলেন। দেয়ালের পাহারাওয়ালা যা জানে তা বলল। চমৎকৃত হয়ে গেলেন কমাণ্ডার। সেই কেরানীটার মাথায় এত বুদ্ধি! বুকে এমন সাহস! সান্ত্রীর লাশটা পড়ে আছে, মাথার চামড়া-সুদ্ধ কামানো। এ হল গাবাটুং-এর হাতের কাজ। সাধারণ নাগারা শত্রুর মাথা কেটে নেয়, গাবাটুং নেয় মাথার চামড়াটা শুধু, আমেরিকার লাল আদিবাসীদের ধরনে। হ্যাঁ, এ গাবাটুং-এর কাজ। দেখা করার নাম করে এসে বেইমানির মতলবে ছিল। সান্ত্রী বেচারীর প্রাণ গিয়েছে। আরও অনেকের যেত, যায়নি কেবল ঐ বাঙালী নায়েকের জন্যে।
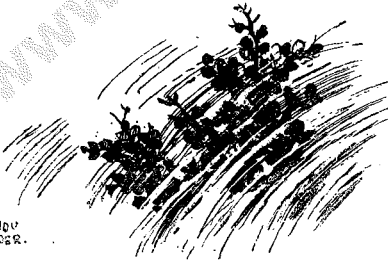
উপর থেকে ঘুরতে ঘুরতে পড়তে লাগল নীরু সেন।
[পৃঃ ১৯১

আলো নিয়ে পঞ্চাশজন সশস্ত্র সিপাহী বেরুলো নীরু সেনকে খুঁজবার জন্যে, যদিও খুঁজে পাওয়ার আশা যে নগণ্য, সে কথা সবাই জানে। ছাউনির চারদিকে টহল দিতে লাগল দলে দলে রাইফেলধারী সৈনিক, নাগারা যাতে আর কাছে ভিড়তে না পারে।

একজোড়া ঝলমলে পাখা নিয়ে বেরিয়ে এল ছোট্ট এক পরী [পৃঃ ১৮৩

*　　　　*　　　　*

জ্ঞান ছিল না নীরুর, ফিরে এল একটা অসহ্য যাতনায়। গাবাটুং-এর তীর কাঁধে বিঁধেছিল, সেই তীর ওরা টেনে বার করছে। নীরুকে ওরা বাঁচিয়ে রাখতে চায়, ওর কাছ থেকে গোপন খবর আদায় করতে চায়। শুধু এই ছাউনির ভিতরকার খবর নয়, অন্য অন্য ঘাঁটিরও, এমন কি কোহিমা-ইম্ফলে কোথায় কত ফৌজ আছে, রসদ মজুদ আছে কোন্ কোন্ গোলায়, নগদ টাকার তহবিল কত আছে কোন্ খাজাঞ্চিখানায়, সব খবর। খবর দেবে না? হাঃ হাঃ হাঃ—খবর কী করে আদায় করতে হয়, তা জানে গাবাটুং।

এক তাল তাজা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে উঠে এল তীরের ফলা। বাঁ কাঁধের নীচে গর্ত হয়ে গেল তিন ইঞ্চি গভীর। গলগল করে রক্ত বেরুতে লাগল। চট্ করে একটা কালো মলম সেই গর্তের মুখে আর চার পাশে লাগিয়ে দিল গাবাটুং। ওটা ওদের দেশী ওষুধ, জংলা লতাপাতা বেটে ওরা তৈরি করে।

রক্তটা বন্ধ হল সঙ্গে সঙ্গে; ব্যথাও ক্রমশঃ কমতে লাগল। গাবাটুং হেসে পরিষ্কার ইংরেজীতে বলল—"দেখছ ম্যান, আমরা নিষ্ঠুর তো ন-ই, অভদ্রও নই। চাঙ্গা হয়ে ওঠ, তারপর যদি ভালো-মানুষের মত কথার জবাব দাও, রাজার হালে রাখব তোমায়।"

আগুনের মত গরম এক মগ চা ওরা খেতে দিল নীরুকে; ঠিক যে-জিনিসটির প্রয়োজন একান্তভাবে সে অনুভব করছিল। শরীরের উপর দিয়ে কী যে যাচ্ছে তার, তা সেই জানে। চা-টা ধীরে ধীরে গলাধঃকরণ করে সে বেশ একটু সুস্থবোধ করল, কাঁধের বীভৎস জখম সত্ত্বেও।

গাবাটুং শুরু করল তার জেরা। প্রতি প্রশ্নেরই জবাব নীরু সেনের জিভের ডগায় তৈরী হয়ে রয়েছে। এত তাড়াতাড়ি হাজার গণ্ডা নির্জলা মিথ্যে সে গড়গড় করে কি করে বলে গেল, ভাববার সময় পেলে সে নিজেই তাক মেরে যেত।

"কোহিমায় মোট ফৌজ কত?"

"সাত হাজার তিনশো! বারোশো রাজপুত, তিন হাজার শিখ, ছয়শো গুর্খা, আর বাদবাকী সব পাঁচমিশেলি।"

"তোমার কমাণ্ডার হিম্মত সিং নাকি বদলি হবে ?"

"বদলি তো হয়েই আছেন। ওঁর জায়গায় লোক আসছে দুই-একদিনের মধ্যেই, এলে তাকে কাজ বুঝিয়ে দিয়েই উনি চলে যাবেন ডেরাডুন। সেখানে সামরিক বিদ্যালয়ে ওঁকে শিক্ষক করে পাঠাচ্ছে। বিশেষ কাজের লোক তো নন কিনা !"

"হিম্মত সিং-এর এই ছাউনিটা নির্মূল করবার একটা ফন্দি বাতলাতে পার ?"

"নিশ্চয়ই পারি। ওঁর জায়গায় যিনি আসছেন দিল্লী থেকে, বলবন্ত রাও, তাঁর প্রতীক্ষা করতে হবে মুকুচং সড়কের কোন-একটা জংলা জায়গায়। জীপে করেই তিনি আসবেন ; জীপ থামিয়ে ফেলে তাঁকে দিতে হবে শেষ করে। তারপর তাঁরই পোশাক খুলে নিয়ে আপনি পরবেন, তাঁর কাগজপত্র হাতে করে সেই জীপে চড়ে গিয়েই হিম্মত সিং-এর ছাউনির চার্জ নিয়ে নেবেন নিজেই। এ-অঞ্চলে উনি নতুন লোক, কেউ চেনে না ওঁকে, কোন গোল হবে না। ব্যস্, তারপর আর কি ! রাতারাতি বারুদঘরে আগুন দিয়ে উড়িয়ে দিন না ছাউনি !"

গাবাটুং যে গাবাটুং—তারও মাথা বনবন করে ঘুরতে লাগল নীরু সেনের আজগবী উপদেশ শুনতে শুনতে। আজগবী ? তা হোক, একে কাজে পরিণত করা অসম্ভব নয়। চাই শুধু সাহস আর উপস্থিত বুদ্ধি। গাবাটুং-এর ধারণা ও দুটো জিনিস ষোল-আনার জায়গায় আঠারো-আনা আছে তার।

সারা রাত ভেবে ভেবে এই আজগবী পরামর্শমত কাজ করাই গাবাটুং সাব্যস্ত করল। যাবে সে মুকুচং সড়কে। জঙ্গল বহু বহু জায়গাতেই আছে ; তার মধ্যে নিমিচি, কোয়াস্তুং, সারাদান—এসব জঙ্গল হল বুনো হাতিরও দুর্ভেদ্য। ওরই যে-কোন একটাতে লুকিয়ে থেকে—

কিন্তু এই বাঙালীটাকে সঙ্গে নিতে হবে। এর মাথা বড় সাফ। পদে পদে তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। কাল রাতে হিম্মত সিং-এর ছাউনিটাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে ঐ ছোকরাই। আবার দুই একদিনের ভিতর হয়ত ওরই সাহায্যে সে-ছাউনিকে বারুদে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হতে পারে। সঙ্গে ওকে নিতে হবে। ভালভাবে চলে যদি, ভাল কথা। বেয়াড়া চলবার লক্ষণ দেখলেই পাঁজরার ভিতর ছয় ইঞ্চি ইস্পাত।

চন্দ্রচূড়

নিমিচির জঙ্গলে ফাঁদ পাতাই ঠিক হল। নাগারা ও-জঙ্গল চেনে ভাল। বলবন্ত রাওকে আটকাবার ঠিক জায়গা হল বড়ফুকনের পুল ; ও-জায়গায় এসে আপনা থেকেই জীপের বেগ কমাতে হবেই কিনা বলবন্তকে !

* * *

পুরো দেড়দিন অপেক্ষা করতে হল বড়ফুকনের পুলে। ঠিক কোন্ দিন কয়টার সময় বলবন্ত রাও আসবেন, তা তো জানা নেই নীরু সেনের ! তবে লোকটা আসবে নিশ্চয় ! কথা রয়েছে আসবার ! নীরু দেখেছে হেডকোয়ার্টারের চিঠি। চিঠিতে স্পষ্ট লেখা আছে—"দু-একদিনের ভিতর বলবন্ত যাচ্ছেন।" অতএব—ধৈর্য ধারণ করলেই সিদ্ধিলাভ ! বলবন্ত রাও মরবে, হিম্মত সিং মরবে, মরবে ছাউনির দুশো সিপাহী ! বার বার গাবাটুংকে একই আশার কথা শোনায় নীরু।

দেড়দিনের মাথায় জীপ আসছে দেখা গেল।

পুলের কাছাকাছি এক জায়গায় রাস্তার দুই ধার ঘেঁষে দাঁড়াল নাগারা, দুই দলে ভাগ হয়ে। বেশী নয়, জন কুড়ি মাত্র। জীপে বড় জোর চারজন লোক থাকবে, তাদের মহড়া নেবার জন্যে কুড়িজন নাগাও আনত না গাবাটুং। কিন্তু জীপের ব্যাপার ! তার উপর নীরু সেনের উপরও ষোল-আনা বিশ্বাস নেই, তাকে আগলাবার জন্যেও লোক চাই। এই সব কারণেই এক কুড়ি লোক সঙ্গে এনেছে গাবাটুং।

সত্যিই নীরু সম্বন্ধে তারা হুঁশিয়ার। তাকে নিজেদের দলে রাখেনি। সড়ক থেকে কিছু দূরে একটা মোটা গাছের গুঁড়িতে আষ্টেপৃষ্ঠে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে তাকে। তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে গাবাটুং-এর ভাইপো সাংকা, খোলা তরোয়াল হাতে। সাংকার উপর হুকুম—কোন বেইমানির চেষ্টা দেখলেই বিনা কৈফিয়তে নীরুর ধড় থেকে মাথা নামিয়ে দেবে।

নীরু আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভাবছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, ভাগ্যে তার কী আছে ? কৌশল করে নাগা-ছাউনি থেকে বেরিয়ে এসেছে। এসেছে নিমিচির জঙ্গলে। এখানে তার পাশে মাত্র একটা নাগা। অবশ্য নিজে সে গাছের গায়ে দড়ি

দিয়ে বাঁধা রয়েছে ; কাজেই একশো নাগাও তার পক্ষে যা, একটা নাগাও তাই। ছাউনি থেকে বেরুতে পেরেছে বলেই যে তার বিপদ কেটেছে, মোটেই তা নয়।

একটা মোটা গাছের গুঁড়িতে আষ্টেপৃষ্ঠে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে নীরুকে। [পৃঃ ১৯২

ঐ জীপ আসছে। ওতে আর যে-খুশি থাকুক না কেন, বলবন্ত সিং নেই। আসলে হিম্মত সিং-এর কাছ থেকে চার্জ নেবার জন্যে কেউই আসছে না, বলবন্তও না, বুদ্ধিমন্তও না। গাবাটুং যে-উড়ো খবর পেয়েছিল, তারই উপর রং চড়িয়ে একটা গল্প তৈরি করেছে নীরু। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, সড়কের কাছে পৌঁছোনো। সড়ক দিয়ে দুই-একদিন পরে পরে জীপ আসেই ছাউনির সঙ্গে যোগা-যোগ রাখবার জন্যে, সেই ভরসাতেই সে বলেছিল—দুই-একদিনের মধ্যেই বলবন্ত আসছেন।

এই তো সড়ক! ঐ তো জীপ! কিন্তু নীরুর মুক্তির সম্ভাবনা কই? মাঝখান থেকে জীপের আরোহীদের জীবন বিপন্ন হয়েছে, এবং তারা যদি মারা যায়, তার আদ্ধেক দায়িত্ব নীরুর।

কী করবে নীরু? করবে কী?

চন্দ্রচূড়

জীপ পুলের একান্ত নিকটে। বেগ কমিয়ে দিয়েছে চালক। ঠিক এই সময়ে রাস্তার এ পাশ থেকে নাগারা মোটা একগাছা দড়ি ছুড়ে দিল ওপাশে; ওপাশের নাগারা তুলে ধরল দড়ির প্রান্ত। মাটির ঠিক এক হাত উপরে মোটা দড়ির একটা বাধা, রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত।

চালক দেখল, অন্য আরোহীরা দেখল। একটা চাপা গোলমাল, গাড়ি পিছনে হটতে লাগল। ঘোরাবার মত চওড়া নয় রাস্তা, যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি পিছু হটতে লাগল গাড়ি।

"ঐ ঐ, ঐ যে ড্রাইভারের পিছনে লোকটা, ঐ বলবন্ত রাও। শীগ্‌গির তীর হাঁকাও, শীগ্‌গির!"—ফিসফিস করে সাংকাকে বলে উঠল নীরু।

"ঐ? ঐ লোকটা?"—সাংকা তরোয়াল গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে রেখে ধনুক হাতে নিল। একটুখানি এগিয়ে গেল ফাঁকার দিকে। তাক ঠিক করবার জন্যে।

তরোয়াল ঠিক হাতের নাগালেই নীরুর। দড়ির বাঁধনের ভিতরেও হাত নাড়াচাড়া করা একেবারে অসম্ভব নয়। নীরু তরোয়াল ধরল।

তীর হাঁকাল সাংকা, ওদিক থেকে রাইফেল হাঁকাল নাগারা। গাড়ি পিছু হটছে, দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই; দড়ি ফেলে দিয়ে তাই নাগারা ছুটছে আর গুলি করছে।

এসব জীপে দরকারমত লোহার জানালা নামিয়ে দেওয়া যায় উপর থেকে। আরোহীরা জীপখানাকে ট্যাংকে পরিণত করে ফেলল।

সাংকা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তীরের পর তীর হাঁকাচ্ছে; লড়াইয়ের নেশায় নীরুর কথা সে ভুলেই গিয়েছে। নেশা ছুটল তখন, ঘাড়ের ওপর থেকে মাথাটা যখন ছিটকে বেরিয়ে গেল তরোয়ালের এক কোপে।

সেই তরোয়াল হাতে নিয়েই তীরবেগে সমুখে এগিয়ে গেল নীরু। জীপ থেকেও তখন রাইফেলের গুলি আসছে। ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে লড়ছে নাগারা। ঝোপের আড়াল থাকার দরুন নীরুকে তারা দেখতে পাচ্ছে না, বিশেষ পিছন দিকে

তাদের নজর নেই, তারা ভাবছে সমুখের ঐ জীপের কথা। বলবন্ত রাওকে পাকড়াতেই হবে যেমন করেই হোক।

গাবাটুং ছিল সবাইয়ের পেছনে। সাহস তার যতই থাক, সতর্কতাকে সে তুচ্ছ করে না। অন্য দুটো চারটে নাগা মরলে এমন কিছু সর্বনাশ হবে না; কিন্তু সর্বনাশ হবে গাবাটুং মরলে। সুতরাং নিজেকে পিছনে রাখার ভিতর লজ্জার কোন কারণ গাবাটুং দেখতে পায় না।

কিন্তু গাবাটুং-এর মৃত্যু এল পিছন থেকেই। নীরুর হাতের তরোয়ালের এক কোপ তার কাঁধ থেকে বুক পর্যন্ত দুই আধখানা করে চিরে ফেলল। বীভৎস একটা চিৎকার করে সে মাটিতে পড়ল, আর তার সেই চিৎকার শুনে সমস্ত নাগারা লড়াই ছেড়ে পিছনে তাকাল ভয় পেয়ে। গাবাটুং মরেছে এবং পিছন থেকে শত্রু এসেছে— দেখে, সে-শত্রুর সংখ্যা কত তা গুনে দেখবার তর সইল না তাদের। তারা তীরবেগে দৌড়ে বনের ভিতর ঢুকে পড়ল—কেউ ডাইনে, কেউ বাঁয়ে।

জীপ থামল, দরজা খুলে বেরিয়ে এল আরোহীরা। গাবাটুং-এর লাশ জীপে তুলে ছাউনিতে চলে এল নীরু।

গাবাটুং-এর মাথার উপর যে দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা ছিল, সেটা তো পেলই নীরু, তার উপরেও সামরিক কর্তারা নীরু সেনের সাহস ও বুদ্ধির তারিফ করে জানতে চাইলেন—আর কী ভাবে তার উপকার তাঁরা করতে পারেন।

নীরু উত্তর দিল—"আমাকে ডেরাডুন কলেজে সামরিক শিক্ষা পাবার সুযোগ করে দিলে আমি ধন্য হব। আমি কেরানী হয়ে থাকার জন্যে জন্মাইনি; আমাকে সৈনিক হতে দিন।"

বিক্রম বর্মন

—শ্রীবিভূতিভূষণ চক্রবর্তী

আমাদের আড্ডার সবচেয়ে আকর্ষণীয় বস্তু ছিল ভূতের গল্প। প্রত্যেকেরই মনে আগ্রহ—রঙ ফলিয়ে জমজমাটি গল্প বলার। এই ব্যাপারে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন হাজারীমশায়। যদিও ভদ্রলোক প্রতিদিনের সভ্য ছিলেন না, কেবল শনিবার সন্ধ্যায় তিনি আসতেন। জাঁদরেল ব্যবসাদার মানুষ, সব সময়ই ব্যতিব্যস্ত থাকেন। সপ্তাহের মধ্যে একটি দিনই তাঁকে আমরা পাই।

আজ সেই শনিবার। সারাদিনের ঝিমঝিমানি জল মাথায় করেই সব কাজ সারতে হয়েছে। আমার বাড়ি যে অঞ্চলে সেখানে এক হাঁটু জল দাঁড়িয়ে গেছে। জল ভেঙে চললাম বর্ষাতিটা গায়ে জড়িয়ে। আমার একটু দেরিই হয়ে গেল সেদিন পৌঁছতে। নিয়মিত সভ্যরা সকলেই, এমন কি হাজারীমশায়ও এসে গেছেন! সকলে উচ্চকণ্ঠে আমায় অভ্যর্থনা করলো ঃ

চন্দ্রচূড়

—'আরে, এসো—এসো, বিরিঞ্চি—'

সলজ্জ হেসে বললাম, 'আমার একটু দেরি—'

—'হবার তো কথাই, সারাদিন যা চলেছে আকাশের অবস্থা।'

এই সময় জলের ঝিমুনিটা কেটে গিয়ে ঝমাঝম বর্ষণ শুরু হল। ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা আর গরম পেঁয়াজী-ভরতি প্লেট নিয়ে কৈলাসচন্দ্রের ভৃত্য রামদীনের প্রবেশ। উল্লসিত একটা মৃদু গুঞ্জনে ঘরটা সুরেলা হয়ে উঠলো।

গরম একটা আস্ত পেঁয়াজী মুখে পুরে ঘনশ্যাম বললে, 'এবার শুরু করুন হাজারীমশায়, আবহাওয়া এবং পরিবেশ রীতিমত প্রস্তুত।'

'তাই নাকি!' হাজারীমশায় ভরাট গলায় হাসলেন ঃ 'আজ যে ঘটনা বলব, আমার জীবনেই ঘটেছিল। নির্ভেজাল সত্য।' বলে পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছে চুরোট ধরালেন। উগ্র একটা কটু গন্ধ ঘরের শীত-শীত ভেজা হাওয়ায় ভাসতে লাগলো।

হাজারীমশায় শুরু করলেন ঃ

বছর পনের আগের কথা, পর-পর কয়েকটা ব্যাপারে মোটা টাকা লোকসান হয়ে আমার ব্যবসা লালবাতি জ্বালতে বসেছিল। পুরুষানুক্রমিক সুনামের সুদ পাওনাদারদের যদিও শান্ত রেখেছিল, আমার কিন্তু শান্তি ছিল না। মাথায় ঋণের বোঝা নিয়ে কারই বা স্বস্তি থাকে! নতুন করে টাকা আমদানির রাস্তা করতে হলেও চাই টাকা! শুধু ভাবনা নিয়ে বসে থাকা আমার স্বভাব নয়, ওতে কোন কাজ হয় না।

একটা চরম দুঃসাহসের কাজ করে বসলাম দুম্ করে! আমার প্রপিতামহের আমলে প্রতিষ্ঠিত রাধাগোবিন্দের মাথার হীরে-চুনি-মুক্তোর কাজ করা সোনার মুকুট ছিল। দেড় লক্ষ টাকা পাথরগুলোরই দাম। আমার এক বন্ধু বিরাট ধনী ও জমিদার, তার নামটা বাদ থাক—তার কাছে প্রস্তাব করলাম, ওই মুকুটের বিনিময়ে টাকা ধার দিতে। এমনও বললাম, সুদ হিসাবে নয়, ধর তোমারই টাকা খাটছে—তারই একটা লভ্যাংশ তোমায় টাকা শোধ করার সময় ধরে দোব।

বন্ধু বললে, 'আরে ছিঃ! ওই সুদই হল, ওসব কথা ছাড়। জানই তো,

● শ্রীবিভূতিভূষণ চক্রবর্তী

চন্দ্রচূড়

আমি হচ্ছি গিয়ে কুড়ের বাদশা জমিদার! বাপ-ঠাকুরদা কিছু টাকা রেখে গেছেন এবং এখনও বেশ আদায়-পত্তর হচ্ছে। বিপদে তোমায় সাহায্য করব, তার আবার অত শত শর্ত কি!'

শুনে আমার মনটা খুশীই হল। বললাম, 'আমি তোমার টাকা এক বছরের মধ্যে শোধ করব। আমি নেহাত হতভাগা, তাই কুল-দেবতার—' বলতে বলতে আমার চোখে জল এসে গেল।

মোলায়েম মিষ্টি গলায় বন্ধু সান্ত্বনা দিল, 'সবই ভাগ্য হে! ওই রাধাগোবিন্দেরই ইচ্ছা সব—তিনিই দিচ্ছেন, আবার তিনিই নিচ্ছেন। আমরা তো হাত-পা-বাঁধা!'

'সে তো ঠিকই!' আমি সায় দিলাম।

'তোমার ওই পাথরগুলো কত দামের বলছিলে?'

'দেড় লক্ষ টাকা শুধু পাথরগুলোর দাম—'

'হুঁ। সোনা কত ভরি আছে?'

'চল্লিশ ভরির বেশীই হবে কিছু।'

বন্ধু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'তাহলে, কত টাকা চাও তুমিই বল?'

'এক লাখ টাকা উপস্থিত হলেই চলবে।'

'এ-ক-ল-ক্ষ! বল কি?' বন্ধু আঁতকে ওঠে, 'বন্ধকী কারবার না করি, শুনেছি, নাকি আসলের অর্ধেক মতই বুঝি টাকা মহাজন খাতককে দেয়! তা আমি তো আর মহাজনও নই, তুমিও খাতক নও। বল কি-না, হে-হে!' সে হাসলো পাক্কা মহাজনী কায়দায়, 'আশি হাজার টাকা আমি তোমায় দিতে পারি। আর, তুমি নিজে হাতে করে যখন জিনিসটা এনেছ—জহুরী ডেকে যাচাই করবার দরকার মোটেই নেই, কি বল?'

আমার দায়। তাই হাসি টেনে বলতে হল, 'তোমার মত বন্ধুর উপযুক্ত কথাই বলেছ। তোমার বিশ্বাস রাখতে পারব আশা করি। তবে—'

'কি?'

'টাকাটা একটু বেশী যদি—'

চন্দ্রচূড়

'না—না—না, এখন কবছরই অজন্মা যাচ্ছে। খাজনা আদায় হচ্ছে না হে!'

আমি আশি হাজার টাকা নিয়ে চলে এলাম, আমার মন খুবই ছোট হয়ে গেল। শেষে কি না ঠাকুরের—। যাই হোক উঠে পড়ে লেগে গেলাম। ঘড়ির কাঁটার যেমন বিশ্রাম নেই, ঠিক তেমনই যদি খাটতে পারতাম, এই কথাই শুধু মনে হত।

হাজারীমশায় থামলেন। চুরোটের আগুন নিভে গেছল, আবার ধরিয়ে নিলেন।

'সেই দিনগুলি আজ মনে হয় যেন স্বপ্ন। তবে, রাধাগোবিন্দের কৃপা আর পূর্বপুরুষদের আশীর্বাদে দুর্দিনের মেঘ কেটে গেল, সুদিনের সূর্যের মুখ দেখলাম। যেমন কথা দিয়েছিলাম সেই মতন বছর পূর্ণ হওয়ার দিনে আসল আশি হাজারের সঙ্গে আরো পাঁচ যোগ করে নিয়ে বন্ধুর কাছে গেলাম।

সে বললে, "বাঃ, বাঃ, তুমি এসে গেছ।'

'তুমিও কি তাই আশা কর না আমার সম্বন্ধে?' বললাম।

'আশা? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই করি। আমারই তো বন্ধু তুমি।'

বললাম, 'আমার জিনিসটা—'

'সে আর বলতে!' বন্ধু ব্যস্তসমস্ত ভাবে উঠে অন্দরমহলে চলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই এনে দিল সে আমার বাঞ্ছিত বস্তু। টাকা গুনে নিয়ে বললে, 'মাত্র পাঁচ হাজার ধরে দিলে হে! য়্যাঁ!'

'কেন, কম হল? আর, তা ছাড়া ও তো সুদ হিসেবে নয়, তবে তুমি যদি অসন্তুষ্ট হও—'

'আরে, পাগল নাকি! এমনিই বললাম। যাও, বাড়ি যাও।' বলে হাসলো উচ্চকণ্ঠে: 'আরে, তোমায় চা খেতে পর্যন্ত বলিনি, এমন অভদ্র আমি, ছি ছি!'

'কি বলছ যা তা। তাছাড়া আমি অসময়ে চা খাই না! চলি।' উঠে পড়লাম।

তারপর—। আশ্চর্য! শুধু আশ্চর্য নয়, অদ্ভুত! সেইদিনই রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, মিশকালো রঙ—যমদূতের মত ষণ্ডা চেহারার একটা লোক আমার সিন্দুক

● শ্রীবিভূতিভূষণ চক্রবর্তী

ভেঙে সেই মুকুটটা চুরি করছে। আর, আর তার মুখটা—সেই বন্ধুর মত অবিকল! ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসলুম। মনটা তখনও ছ্যাঁত-ছ্যাঁত করছে। একি! এমন হল কেন? একটা ভালো দিন দেখে ঠাকুরের মাথায় মুকুট পরাবো, এই ইচ্ছেয় সেটা সিন্দুকে তুলে রেখেছিলুম। তখুনি সিন্দুক খুলে ফেললুম। আঃ, ওই তো—ওই তো রয়েছে মুকুট! হাতে তুলে নিয়ে দেখতে লাগলুম। আলো লেগে জ্বলছে পাথরগুলা! চোখ-ঝলসানো ঝিলিক। কিন্তু, একটা কুৎসিত সন্দেহ—অন্ধকার পথে অকস্মাৎ ফোঁস করে ফণা-তোলা সাপের মত। মনের যত খুশী ম্লান করে দিল। পাথর-টাথর আমি মোটেই চিনি না। এগুলো সব আসল তো?

বাকী রাতটুকু আর ঘুম হল না। কি যে দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে সময়টুকু কাটলো! সকাল হতেই আমার জুয়েলারকে ফোন করলুম। তিনি এসে দেখে-শুনে ঠিক সেই কথাই বললেঃ যা স্বপ্নাতীত ছিল! পাথরগুলো সব ঝুটো। রংচঙে কাচ। বিলিতি কাচ। দেড় লক্ষ টাকার জিনিসটা নাকি, মেরে কেটে আড়াই হাজারের মত এখন মূল্য!

আমি মাথা ঘুরে পড়েই যেতুম, জুয়েলার শিশিরবাবু না যদি ধরতেন।

'আপনি আমায় না জানিয়ে কেন এই লেন-দেন করলেন।' তিনি দুঃখিত-কণ্ঠে বললেনঃ 'দুনিয়ায় বিশ্বাসের মূল্য কানাকড়িও নেই হাজারীমশায়! সব কিছুর ওজন এখন টাকার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে!'

পাথর—আমি নিষ্প্রাণ জড়-দেহ প্রাপ্ত হয়েছি। যান্ত্রিক চোখ দুটো কেবল নিষ্পলক। অনেকটা সময় লাগলো ধাক্কা সামলাতে। ভুল আমারই। তার উপযুক্ত শাস্তি তাই পেয়েছি। কিন্তু, এই ভুলের মাসুলটা কেমন করে দোব—মনে মনে স্থির করে নিয়েছি। আমার গোয়েন্দা বন্ধু বিক্রম বর্মনের শরণাপন্ন হতে চললাম। পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগের জাঁদরেল মাথা। তাকে সমস্ত কথা সবিস্তারে বললাম তার বাড়িতে হানা দিয়ে।

'আমি কি করতে পারি, বলো?' সে বললে, 'তুমি অভিযোগ প্রমাণ করতে

পারবে ? যাঁর নাম করলে, বাংলা দেশের ধনী জমিদারদের দলভুক্ত তিনি। বংশগত 'দানবীর' 'ধর্মপ্রাণ' প্রভৃতি অলংকার ধারণ করে বসে আছেন। লোকে শুনলে বিশ্বাস করবে তোমার কথা? বিশেষ করে, কিছু দিন আগে তুমি যে ব্যবসায় লালবাতি জ্বেলে বসেছিলে—এ কথা তো সকলে জানে। লোকে বলবে, হিংসেয় তুমি বদনাম দিচ্ছ মানী জনের।'

তখুনি সিন্দুক খুলে ফেললুম। আঃ, ওই তো—ওই তো রয়েছে মুকুট। [পৃঃ ২০৩

'তা হলে কোন প্রতিকার হবে না, বলতে চাও?'

'না, তা বলি না। বিষয়টা মোটেই সহজ নয়। কিছু করতে হলে আটঘাট বেঁধে তবেই আসরে নামতে হবে। উনি যে নিয়েছেন সেটা প্রমাণ করতে হবে! জিনিসটা আদায় করতে হলে কাঠ-খড় প্রচুর চাই!'

একটু হতাশ হয়ে পড়লাম: 'তুমিই বলো, কি করি? তুমিই বা কি করতে পারো?'

বিক্রম বর্মন চিন্তামগ্ন হল। কিছুক্ষণ কপাল কুঁচকে রইল। একটু পরে জ্বলজ্বলে চোখে তাকালো: 'একটা ফন্দি এসেছে।'

'কি?' উত্তেজনায় আমার গলার আওয়াজ কাঁপছে।

● শ্রীবিভূতিভূষণ চক্রবর্তী

চন্দ্রচূড়

'তোমার হাতের আংটিটা কী পাথর? রক্তমুখী নীলা, না? কত দাম হবে পাথরটার?'

বিক্রমের এই কথা শুনে বুঝতে পারি না, হঠাৎ আংটির পাথরের মূল্য কোন্ কাজে লাগবে: 'ছরতি ওজনের পাথর। হাজার পাঁচ দাম হবে।'

'তোমায় দুচার দিনের জন্যে ওটা কাছছাড়া করতে হবে, পারবে না?'

'না। ওটা কাছছাড়া করতে নেই। আমার একটা হীরের আংটি আছে এই দামেরই—'

'ঠিক আছে, সেটাতেই হবে।' বিক্রম বললে, 'তোমার সে মহাজন মহাশয়ের কাছে, যা পাও টাকার বিনিময়ে তোমায় হীরার আংটিটা বাঁধা রাখতে হবে। অভিনয় যেন নিখুঁত হয়। বলবে, আচমকা টাকার দরকার—বেশী না হলেও, যেন, সামান্য হাজার দুই টাকার জন্যে ঠেকে গিয়েছ একান্তই। আরো, এ কথাটা অবশ্যই বলবে, বেশী টাকার দরকার হলে, মুকুটটাই রাখতে হত আবার। এখন সামান্যতেই চলে যাবে।'

'তোমার হাতের আংটিটা কী পাথর?'

'তারপর?'

'তারপর দেখতেই পাবে।' বিক্রম হাসলো।

কথামত সেই মহাজন বন্ধুর কাছে গেলাম আংটি নিয়ে। হীরাটার উজ্জ্বলতা চোখে লাগে। বেশ কিছুক্ষণ সে আংটিটার দিকে চেয়ে রইলো। বললে, 'আবার টাকার দরকার?'

● বিক্রম বর্মন

চন্দ্রচূড়

অভিনয় ত্রুটিহীন করার চেষ্টা করে বললাম, 'হঠাৎ এমন মুশকিলে পড়ে গেছি ভাই—'

'সে তো বুঝছিই। তোমার তো বেশ চলছিল—'

'তা চলছিল। এখন নগদ টাকা হাতে একেবারে নেই—'

'হুঁ। দু হাজার চাই?'

'উপস্থিত ওতেই হবে।'

'বেশ, দিচ্ছি।' বলে, বন্ধু একটু উৎসুক ভাব ফুটিয়ে তুললো মুখেঃ 'তোমার গৃহদেবতার মুকুট পরানো হয়েছে?'

'নিশ্চয়ই। একটা ভালো দিন দেখে—'

'খুব ভালো, খুব ভালো।'

টাকা নিয়ে চলে এলাম। বিক্রমের সঙ্গে দেখা করে বললাম সাক্ষাৎকারের বিবরণ। সব শুনে সে বললে, 'ঠিক আছে। এবার যা করবার—করছি।'

'কি করবে?'

'পরে বলবো। তুমি আগামী কাল এসো।'

পরদিন গেলাম। আগ্রহভরে বলি, 'কতদূর—বিক্রম?'

বিক্রম বিজয়ীর মত হাসলোঃ 'জাল পেতেছি।'

'কিছু ধরা পড়লো?'

'নিশ্চয়ই।' বলে, ধোঁয়াটে হাসলো।

অধৈর্য হয়ে পড়লামঃ 'তুমি খুলে বলো—'

'ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক—কবি বলেছেন।'

'ভাই, বিক্রম—'

'বুঝেছি। তোমার খুব রাগ হচ্ছে আমার উপর।' বিক্রম উচ্চ হেসে বলে, 'শোন, আমার জালে বিখ্যাত এক জুয়েলার ধরা পড়েছে। এরই মারফত চোরা-বাজারী লেন-দেন তোমার মান্যবর বন্ধু করে থাকেন। তার বাড়িতেই তোমার আংটির হীরে চলে গিয়েছে। তার বদলে অন্য পাথর লাগানো হয়েছে তোমার

আংটিতে। লোক রেখেছিলুম ওর বাড়িতে নজর রাখবার জন্যে। কেমন ধরনের এবং কে কে সেখানে যায়, তার একটা তালিকা সে আমায় দিয়েছে।'

'এই জেনে কি করবে?' আমি হতাশ হয়ে পড়ি।

'ওই জুয়েলারটিকে ছলে-বলে-কৌশলে দলে আনতে হবে। শুধু চোরাই সোনা-পাথর নয়, মাদকজাতীয় বস্তুও তোমার বন্ধুর ব্যবসার অঙ্গ। এই লোকের মুখোশ খুলতে হলে এমন একজনকে পাকড়ানো দরকার যে তার হাঁড়ির খবর জানে, সাক্ষী দিতে পারবে।'

'যদি জুয়েলার রাজী না হয়?'

'যাতে হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে।'

'যদি তোমার কোন বিপদ—'

'তা হবার সম্ভাবনা আছে। তা বলে ভয়ে বসে থাকতে নিশ্চয়ই বলো না।' বিক্রম কঠোর কণ্ঠে বলে, 'সমাজের শত্রুদের উচ্ছেদ করার জন্যেই পুলিসে আমার কাজ নেওয়া। শত্রু আমার অনেক। চোর-ছ্যাঁচোড়-খুনে-গুণ্ডাদের চেয়ে এই সব গভীর জলের মাছেরা কত ভয়ানক—'

আমার মহাজন বন্ধুর এই নতুন পরিচয়—যদিও কিছুটা আগে পেয়েছিলাম, এখন বিস্তৃততর ভাবে পেয়ে বেশ কিছুক্ষণ শুধু তলিয়ে বুঝতেই কেটে গেল। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে জাত-সাপের ঘাঁটিতে হাত দিয়েছে বিক্রম। যদিও তার দক্ষতায় আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে। তবু বার বার মনে হতে লাগলো তার কোন বিপদ হবে না তো?

আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেই বুঝি বিক্রম বললে, 'তোমার মুকুটের ঘটনা আমায় বলেছ বলেই তো এত ভীষণ শত্রু-ঘাঁটির সন্ধান পেয়ে গেলাম! নইলে, সকলের চোখের সামনে দিনের পর দিন উনি ফলাও কারবার চালিয়ে যাচ্ছেন কেমন বংশগত মর্যাদার আড়াল দিয়ে! পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে এরা সমাজের বুকে সসম্মানে ঘুরছে! গোয়েন্দা বিভাগের দুজন সুদক্ষ অফিসার এদের দলেরই হাতে মারা পড়েছে। আমি এর একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়ব।'

বিক্রমের কাছ থেকে ভাবনা ভারাক্রান্ত মনে বিদায় নিলুম।

চন্দ্রচূড়

তারপর দুদিন কেটে গেল। বিক্রম শব্দহীন, তার দেখা পর্যন্ত পেলাম না। বাড়িতে খবর নিয়ে শুনলাম ঃ জরুরী কাজে কোথায় গেছে কেউ জানে না! গেল কোথায় মানুষটা ? মনে অশান্তির কালো-মেঘটা আরো জমাট হয়ে উঠলো। সেদিন রাত্রে আকাশ ভেঙে জল নামলো।'

হাজারীমশায় থামলেন। একটা নতুন চুরোট ধরালেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি জানালা-পথে বাইরের ঝমঝম বৃষ্টির মাঝে যেন রহস্যের সন্ধান করছে! আমরা গল্পের গভীরতায় নিঃশেষে হারিয়ে গেছলাম। বক্তার সাময়িক বিরতি আমাদের চেতনা-বস্তুটি ফিরিয়ে দিল। রামদীন আর এক প্রস্থ চা দিয়ে গেল।

হাজারীমশায় আবার শুরু করলেন ঃ

'সেদিন রাত্রেও এমনি দুর্যোগ। অনেক রাত্রে, একটানা দুম-দুম দরজায় কার ধাক্কায় ঘুম ভেঙে গেল। উঠে পড়লাম। দরজা না খুলে জিজ্ঞেস করলাম, 'কে ?' এত রাত্রে কে এলো! হুট করে দরজা খুলতে ভরসা হয় না। সাড়া এলো পরিচিত কণ্ঠে ঃ 'আমি, বিক্রম।'

দরজা খুললাম। বারান্দার অন্ধকারে একটা লম্বা-চওড়া ছায়া-মূর্তি। বর্ষাতিতে সর্বাঙ্গ ঢাকা। মাথায় বর্ষারোধক টুপিটা সামনের দিকে হেলানো। কেবল, চোখ দুটো যেন জ্বলছে!

'তোমার ঘুম ভাঙালাম!' বিক্রম হাসলো ঃ 'বেশ ঘুমুচ্ছিলে আরামে, না ? তা ঘুমোবার মতই রাত বটে!'

একটু লজ্জিত ভাবে বললাম, 'ভেতরে এসো।'

'না, সময় নেই!' ভরাট, গম্ভীর কণ্ঠ ঃ 'এই নকশাটা দিচ্ছি। গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর বিরাজবাবুকে নিশ্চয়ই চেন। তাঁর হাতে এখুনি এটা পৌঁছে দেবে। বলবে, নকশায় পথের পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া আছে। সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে তাঁর যেতে বিলম্ব না হয়। আমি সেখানেই যাচ্ছি। তুমি অবশ্যই যাবে।'

বুঝতে পারলাম না, বিক্রম আমায় প্রত্যক্ষভাবে এই ঘটনার সঙ্গে কেন জড়াতে চাইছে। মহাজনের শেষ পরিণতি দেখাতে চায় ? ছোকরা বাহাদুর বটে! এত

শীগ্‌গির বাজিমাত করে বসেছে। বিরাজবাবুকে সঙ্গে নিয়ে সেপাই সমেত নিজেই তো যেতে পারতো, হয় তো, এত সব করার সময় নেই ওর। বললাম, 'এখুনি যাচ্ছি।'

চাপা হাসির সঙ্গে বিক্রম বললে, 'চললাম। সেখানে আমায় দেখতে পাবে। দেরি করো না।' বলেই, সে হনহন করে চললো।

বিরাজবাবু নকশা দেখে বললেন, 'বিক্রম গত দুদিন ধরে একেবারে ডুব দিয়ে এই সব করেছে! এই বাদলার রাতে আচ্ছাই ফ্যাসাদে ফেললে।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই বি, টি, রোড ধরে দুখানি পুলিসের গাড়ি ছুটে চললো। ডানলপ ব্রিজ পার হয়ে গেল। আকাশের দুর্যোগ আরও ঘনীভূত হচ্ছে! বিরাজবাবু নকশার নির্দেশমত গাড়ি থামাতে হুকুম দিলেন। সকলে নামলাম, একটা বিরাট আকারের আদ্দিকালের ঝরঝরে পোড়ো বাড়ির সামনে। চারিদিকে ঝোপ-জঙ্গল। কোন ধনী খেয়ালী লোকের শখের সাজানো বাগানের পরিণতি। কিন্তু বিক্রম কই? মরচে ধরা লোহার ফটক খোলাই ছিল। কয়েকজন সিপাহীকে যথাযথ ঠাঁই রক্ষার নির্দেশ দিয়ে জনকয়েককে সঙ্গী করে বিরাজবাবু এগোলেন: 'আসুন হাজারী মশায়, দেখি ব্যাপারখানা। বিক্রমের সাড়া নেই কেন? এখনো কি পৌঁছয়নি?'

বললাম, 'চলুন। দেখা যাক। বাড়িটা দেখে, লোক বাস করে বলে তো মনে হয় না।'

হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা হাওয়া শনশন করে উঠলো মানুষের কথা কওয়ার মত! যেন, পাশ থেকে বিক্রম বলছে: 'আমি এসেছি। তোমরা এগোও।'

চমকে উঠলাম। স্বপ্ন দেখছি! বিক্রম কই? নাঃ, ঘুমের ঘোর এখনো আছে দেখছি। বর্ষা-রাতের কাঁচা-ঘুমের নেশা সহজে কাটে না। বিরাজবাবু খানিকটা এগিয়ে ততক্ষণে সদরে পৌঁছে গেছেন। চাপা কণ্ঠে বলেন, 'দরজা খোলাই দেখছি!'

'ভেতরে ঢুকবেন?' জিগ্যেস করি।

'নিশ্চয়ই! কেন, আপনার ভয় করছে? তা হলে, গাড়িতে—'

আহত কণ্ঠে বললাম, 'আমায় এত ভীরু মনে করেন।'

চন্দ্রচূড়

'না, না, ছিঃ!' বিরাজবাবু লজ্জিতভাব প্রকাশ করলেন।

ভেতরে ঢুকলাম সকলে। চাপ-চাপ অন্ধকার। ভ্যাপসা দুর্গন্ধ। বাইরে থেকে যত বড় দেখায় তার চেয়েও মস্ত বড় বাড়ি। একটা বড় চৌকো উঠানকে কেন্দ্র করে সারি সারি ঘর। দরজা জানালা বন্ধ। চামচিকে উড়ছে ফড়ফড় করে। টর্চের আলোয় চকিতে সবদিক দেখে নিয়ে বিরাজবাবু বললেন, 'সব ঘরগুলো তল্লাশ করবো?' কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, একটা ভারী কিছুর ডালা বন্ধ করার শব্দ হল।

'স-স-স' বিরাজবাবু জিহ্বার আওয়াজ করলেন সতর্কতার: 'দোতলার দিক থেকে এলো, না?'

'তাই মনে হচ্ছে।'

'চলুন—দেখি—'

চারজন সেপাইকে নীচে রেখে আমরা দোতলার সিঁড়ির দিকে গেলাম। সিঁড়িতে উঠছি, কানের কাছে চামচিকে ডানা ঝাপটানি দিল···আর মনে হল, যেন স্পষ্ট কেউ বললে 'কোণের ঘরে···কোণের ঘর দক্ষিণের···পেলাম। ভুতুড়ে বাড়ি নিশ্চয়ই। কিছু বললাম না কাউকে। শব্দহীন পদক্ষেপে উপরে উঠলাম। দক্ষিণ দিকের শেষ ঘরটায় যেন কিছু নড়াচড়ার শব্দ, ক্ষীণ আলোর আভাস। বিরাজবাবুর পিছনেই আমি। দরজার পাল্লা ভেজানো। একটুখানি ফাঁক দিয়ে দেখা গেল, ষণ্ডামার্কা জন চার লোক একটা মস্তবড় কাঠের বাক্স তোলবার চেষ্টা করছে। একজন কেউ বললে, 'বাগানে গর্ত করে পুঁতে দে।' গলার আওয়াজটা···?

হুড়মুড়িয়ে সকলে ঘরে ঢুকে পড়লাম।

'হাত তুলে দাঁড়া সব শয়তানগুলো।' বিরাজবাবুর কর্কশ কণ্ঠ, হাতে ধরা রিভলভার।

দেখলাম, দূরে দাঁড়িয়ে সেই মহাজন বন্ধু!

'জমাদার দুবে, হাতকড়া লাগাও!' বিরাজবাবুর বজ্র-কণ্ঠের আদেশ: 'সার্জেন্ট মরিস, কেউ আঙুল নড়ালেই গুলি চালাবে—কুত্তার মত মারবে—'

হাত-কড়া-পর্ব শেষ হল। লোকগুলোর সব মড়ার মত ফ্যাকাশে মুখ।

'এখানকার সন্ধান কে দিল পুলিসকে ?' মহাজনের তখনও ফোঁসফোঁসানি।

'চোপরাও।' বিরাজবাবু হাঁকলেন, 'জমাদার, বাক্স খোল—'

'হুজোর পিরেক আঁটা—'

'একটা কিছু খোলবার মত—' বিরাজবাবু ইতস্ততঃ দৃষ্টিচালনা করে বলেন, 'ঐ যে একটা শাবল—ওটা দিয়ে চাড় দাও।'

জমাদার দুবে শাবলের চাড় দিতে মড়-মড় করে ডালাটা খুলে গেল। বিরাজবাবুর জোরালো টর্চের আলো পড়তে শিউরে লাফিয়ে উঠলাম—একটা মুণ্ডহীন দেহ। আর, মুণ্ডটাও রয়েছে বীভৎসতার ভীষণতম এক নমুনার মত! সেটা বিক্রমের! আমি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম।'

যোগাযোগ

—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

লম্বা লম্বা পা, পিঠে কুঁজ, সাপের ফণার মত গলা। অতি বদখত চেহারা ; নামটি কিন্তু জমকালো। আগের মালিক "বাদশা" বলে ডাকত আদর করে। সেই সূত্রে এ-বাড়িতেও ঐ নামই চলছে। কদিনের জন্যই বা ? ভোজের দিন তো এসেই পড়ল একরকম। এখন আর নতুন খেতাব দিয়ে করবে কী ও ? মরে গেলে তো বাদশা আর গোলামের একই দশা !

বাদশা হচ্ছে আসলে একটি উট। উঁচু বংশে জন্ম, তাই এই কাঁচা বয়সেও সক্কলের উপরে মাথা উঁচিয়ে থাকে। কুৎকুতে চোখ দিয়ে পিটপিট করে তাকায় ; ছোকরারা ভয়ে কাছে ঘেঁষছে না দেখে মনে মনে খুশী হয়। আবার কেউ যদি দুষ্টুমি

করে ঢিল ছোড়ে, কি লম্বা বাখারি দিয়ে খোঁচা দেয় দূর থেকে, গাঁক করে এমন একটা আওয়াজ বার করে যে ক্ষুদে শত্রুরা ইজের চেপে ধরে দৌড় লাগায়। মোটা দড়ি দিয়ে বাদশার গলা বাঁধা আছে শালকাঠের খুঁটিতে, চারখানা পা-ই আটকানো আছে বাঁশের খোঁটাতে, তবু বাচ্চাদের বিশেষ ভরসা নেই তার সম্বন্ধে। জীবটা অজানা কিনা! গোরু তারা সারাজীবনই দেখছে, ভঁইষও দেখে থাকে দুদশটা যখন-তখন, কিন্তু উট এদেশে এই প্রথম; হরিহরছত্রের মেলা থেকে কিনে আনা হয়েছে নগদ আড়াইশো টাকা দিয়ে; গাঁয়ের লোক খান বাহাদুরের কাছে উটের মাংস খাওয়ার আবদার করেছিল ভোটাভুটির সময়, তারই জন্য ভদ্রলোকের এই উটকো খরচা।

নড়নচড়নের জো নেই; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দানা চিবোয়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোয়। প্রথম দুই-এক দিন ঘনঘনই ডাকাডাকি করত; ডাকত হয়ত তার বুড়ী মাকে, মেলা থেকে বাদশা চলে আসবার সময় যে দড়িদড়া ছিঁড়ে ধাওয়া করেছিল তার পিছনে। ডাকত হয়ত তার ভাই আমীরকে, যার শখের খেলা ছিল বাদশার গলার নীচে মাথা ঘষে ঘষে সুড়সুড়ি দেওয়া। ডাকত প্রথম প্রথম দুই-এক দিন; এখন ওই মাঝে-মাঝে এক-একবার গাঁক করে ওঠা ছাড়া আর কোন শব্দই সে করে না; চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে আর চোখের জল ফেলে। কিসের জন্য তার এত কষ্ট, জানোয়ারের মাথার ঝাপসা বুদ্ধি দিয়ে সে বোঝে না, নিষ্ফল প্রতিবাদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধুই সে কাঁদে আর কাঁদে।

তেমনি কাঁদছে একদিন দুপুর রাত্রের দিকে, অন্ধকার উঠোনে একা-একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে; হঠাৎ সে চমকে উঠল। আলোয়-আলো চারিধার। দশ-বিশটা মুষকো পালোয়ান এসে দাঁড়িয়েছে তার চারিদিকে দড়িদড়া বাঁশ খুঁটি নিয়ে; একজনের হাতে আবার লম্বা একটা চকচকে ছুরি, বাদশার সারা দেহ সিড়সিড় করে উঠল সেই ছুরি দেখে। জানোয়ারের ঝাপসা বুদ্ধি দিয়েও সে বেশ বুঝতে পারল ঐ ছুরি এক্ষুণি তার গলায় বসবে; যে-শুভক্ষণটির প্রতীক্ষায় ঐ লোকগুলো চার কোণে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে বাদশাকে আজ দিন দশেক দানাপানি খাওয়াচ্ছে, সেটি আজ এসে গিয়েছে তাহলে। দূরে দাঁড়িয়ে মোটা মোটা দড়ি ওরা ছুড়ে মারল বাদশার পিঠে, আঁকশি

দিয়ে সেই দড়ির প্রান্তগুলো টেনে টেনে আনল পেটের তলা দিয়ে। এদিকে বাঁয়ের দুখানা পা আর গলার বাঁধন কেটে দেওয়া হল, ওদিকে ডান পাশ থেকে পেট-প্যাঁচানো দড়ি ধরে প্রাণপণে টানতে লাগল এক কুড়ি মানুষ। দড়াম করে মাটিতে পড়ে গেল বাদশা, আর সঙ্গে সঙ্গে চারখানা বাঁশ দিয়ে তারা তাকে চেপে ধরতে গেল।

চেপে ধরতে গেল বটে, কিন্তু হয়ে উঠল না সেটা। লোকগুলো সবাই দড়ি টানবার জন্য ডান দিকে এসে জুটেছিল, বাঁ দিকে বাঁশের মাথা ধরবার জন্য লোক লাগবে, ওটা আগে খেয়াল করেনি তারা। এখন—

বাদশার জানোয়ারী মাথার ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ যেন ঝিলিক দিয়ে গেল একটি-বার। এত তাড়াতাড়ি ভাবা, এত তাড়াতাড়ি কাজ করা, এর আগে কখনো করেনি বাদশা। ঘাতকের ছোরাকে নাকের ডগায় দেখে তার ঝাপসা বুদ্ধি কি উজ্জ্বল হয়ে উঠল হঠাৎ?

কতক লোক ঘুরে বাঁ দিকে আসবার আগেই অত বড় দেহটা নিয়ে লাফিয়ে উঠল বাদশা। দুটো পা তার খোলাই ছিল, তাই দিয়ে ছুড়ল দুই প্রচণ্ড লাথি। পিছন-পায়ের লাথিটা পড়ল নবী শেখের পাঁজরায়, যে ডান দিক থেকে বাঁয়ে আসবার তাগিদে অসাবধানে বাদশার পা থেকে হাত তিনেকের ভিতর এসে পড়েছিল। বেকুফ লোকটার পাঁজরাটা চূর্ণ হয়ে গেল, 'ওরে বাপ' বলে একটা চিৎকার ছেড়ে সে ডিগবাজি খেয়ে উলটে পড়ল ওধারে; আর সেই মুহূর্তে ডান দিকের পিছন-পায়ের দড়িটা পটাং করে ছিঁড়ে গেল হ্যাঁচকা টানে।

সমুখের ডান পা তখনো খোঁটায় বাঁধা, সেই অবস্থায়ই বাদশার সে কী তাণ্ডব নাচ! আর কী বুকের-রক্ত-হিম-করে-দেওয়া তার বীভৎস আওয়াজ! 'বাপরে বাপ! বাপরে বাপ!' করতে করতে এক কুড়ি লোক ছিটকে পড়ল এধারে-ওধারে; কোথায় গেল বাঁশ, কোথায় রইল দড়াদড়ি! মরিয়া হয়ে আতাউল্লা ছুড়ে মারল তার হাতের ছুরি। তাক করেছিল বাদশার গলা, লাগল এসে খোঁটায় বাঁধা দড়িতে। দড়িটার আদ্ধেক ফ্যাঁশ করে কেটে গেল। বাকী আদ্ধেক পটাং করে ছিঁড়ে গেল বাদশার টানাটানিতে।

● শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

চন্দ্রচূড়

ছুটন্ত মাল-ট্রেনের মত দুলতে দুলতে ছুটল বাঁধন-ছেঁড়া বাদশা। দুটো মানুষ চিপটে গেল তার পায়ের তলায়, একখানা টিনের চালা ভেঙে পড়ল তার কাঁধের ধাক্কায়। খান বাহাদুর এর ভিতর বন্দুক এনে ফেলেছেন। এলোপাথাড়ি গুলি চলল কিছুক্ষণ, তাতে মারা পড়ল গোটাকতক রাতকানা পায়রা।

ছুটতে ছুটতে বাদশা এসে ঢুকল খান বাহাদুরের বাঁশ-বাগানে; সেখান থেকে সরষে ক্ষেতে, সেখান থেকে মহানন্দার শুকনো সোঁতা পেরিয়ে একেবার পাহাড়তলির জঙ্গলে। এতক্ষণে বাদশা চুপ করে দাঁড়িয়ে চারিধারে তাকিয়ে দেখল একবারে। জঙ্গলে চলাফেরা করতে অভ্যস্ত নয় বাদশা, কোন উটই নয়।

'ওরে বাপ' বলে একটা চিৎকার ছেড়ে সে ডিগবাজি খেয়ে উলটে পড়ল ওধারে। [পৃঃ ২১৪

কিন্তু যায় বা কোথায়? এ-জঙ্গল ভেদ করে এগুনোই এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। বড় বড় গাছে ঘষা লাগে, গায়ের কুঁজ বেধে যায় নীচু ডালে, পায়ে জড়িয়ে ধরে মোটা মোটা লতা, প্যাঁট প্যাঁট করে কাঁটা ফুটে যায় সারা গায়ে। এগিয়ে চলা বন্ধ করে ভোজনে মন দিল বাদশা। অনেকদিন পেট ভরে খাওয়া হয়নি, তৃপ্তি হয়নি শুকনো ছোলা আর কটকটে খড় চিবিয়ে। বহুক্ষণ ধরে নানা গাছের কচি পাতা দিয়ে উদর পূর্ণ করবার পরে বাদশা ভাবল একবার জলের

সন্ধানে যাওয়া যাক। যে দিকটায় ঝোপঝাড় একটু পাতলা সেই দিক দিয়েই কোনমতে একটু পথ করে নিয়ে ধীরে ধীরে বাদশা এগুতে লাগল জলের সন্ধানে।

একটা বড় গাছের তলা দিয়ে চলেছে, এমন সময়ে টুপ করে কী-একটা পড়ল উপর থেকে, ঠিক তার পিঠের উপরে। একেবারে হালকা জিনিস বলা যায় না; বাদশার আগের মালিকের যে বাচ্চা ছেলেটা যখন-তখন ওর পিঠে চড়ে কুঁজ ধরে লাফাত, প্রায় তারই মতন ওজন এ-বস্তুটার। কী হতে পারে এটা? দাঁড়িয়ে পড়ে বাদশা ঘাড় বেঁকিয়ে দেখবার চেষ্টা করতে লাগল; কিন্তু উটের ঘাড় কি আর বেঁকতে চায়!

আ মলো যা! এটাও যে পিঠের উপর দাঁড়িয়ে কুঁজ ধরে লাফাচ্ছে! সেই ফিরোজ ছেলেটাই এল নাকি? কী করে আসতে পারে, জানোয়ারী বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারে না বাদশা। সেই লক্ষ মানুষ আর লক্ষ জন্তুর মহামেলা হরিহরছত্র—সেই মেলাই এখান থেকে কতো কতো কতো দূর। আগের মালিকের বাড়ি আবার সেই ছত্র থেকেও কতো কতো কতো দূরে। বাদশার অল্প অল্প মনে পড়ে—ধুলোর রাস্তা ভেঙে সে আর তার ভাই আমীর আর তার মা সবাই পাশাপাশি হেঁটে এসেছিল সেই মালিকের বাড়ি থেকে মেলার মাঠে। পথে তিনবার সূয্যি উঠেছিল, তিনবার ডুবেছিল। কম রাস্তা নয়। অত দূরের রাস্তা সেই ফিরোজ কী করে আসবে এই বনের ভিতর!

বাদশা কৌতূহল দমন করতে পারে না, গাঁক করে শব্দ করে—তার অর্থ—"কে হে তুমি?"

'গাঁক' শুনেই পিঠের জিনিসটা আঁতকে উঠল 'হুক্কু' বলে, আর একলাফে একেবারে মাথার উপরকার গাছের ডালে।

বাদশার 'গাঁক' আর ঐ জন্তুটার 'হুক্কু' পালটাপালটি চলতে লাগল কিছুক্ষণ পর্যন্ত। দুজনেই যে মজা পেয়েছে দুজনাকে দেখে, তাদের ডাকাডাকির পর্দা ক্রমশঃ মোলায়েম হয়ে আসাতেই প্রকাশ পেল সেটা। শেষ পর্যন্ত কী-একটা অলিখিত চুক্তি হল দুজনার ভিতরে তা তারাই জানে; কিংবা হয়ত তারাও জানে না। জানুক বা না জানুক, ব্যাপার দাঁড়াল এই যে বানর মশাই গাছ থেকে আবার টুপ করে নেমে পড়লেন

বাদশার পিঠে, আর তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন বনের ভিতর দিয়ে। সে পথ দেখানোর ব্যাপারও এক মজার ব্যাপার; লেজুড় যখন বাদশার পেটের বাঁ দিকে আঁচড়ায়, বাদশা তখন বাঁ দিকে ঘোরে; যখন ডান দিকে আঁচড়ায়, তখন ঘোরে ডান দিকে।

অনেকক্ষণ ঘুরতে ঘুরতে বাদশা হঠাৎ দেখতে পেল সে একটা ঝরনার ধারে এসে পড়েছে। পথ দেখিয়ে লেজুড় তাকে নিয়ে এসেছে জলের কাছে।

চোঁ চোঁ চোঁ চোঁ করে জল খাচ্ছে তো খাচ্ছেই বাদশা, আর হুক্কু হুক্কু করে তার পিঠের উপর লাফাচ্ছে তো লাফাচ্ছেই লেজুড়। লেজুড়ের মতলব বন্ধুকে নিয়ে আবার সে তার নিজের জায়গায় ফিরে যায়, যে-জায়গায় সে প্রথম লাফিয়ে নেমেছিল বাদশার পিঠে। কিন্তু সেদিকে ফিরে যেতে বাদশা নারাজ। তার কারণ সেদিকটায় জঙ্গল বড় নিবিড়, বাদশার বাসযোগ্য স্থান সে নয়। অথচ এই ঝরনার ধারটা অনেকটা ফাঁকা; গাছপালা খুবই পাতলা। মাঝে মাঝে এরকম সব ফাঁকা জায়গা রয়েছে যাকে ছোটখাট মাঠের টুকরোও বলা যেতে পারে। উটের পক্ষে এরকম জায়গা ঘন বনের তুলনায় অনেক ভাল। আরাম করে ঘুরে বেড়ানো চলবে, চিৎপাত হয়ে শুতে গেলে গাছের গুঁড়িতে কুঁজ আটকে যাবে না, আর সব চেয়ে বড় কথা—ঘাসপাতা আর জল এখানে পাশাপাশি মিলবে। উঁহুঁঃ, বাদশা এখান থেকে এক পা নড়বে না।

কিন্তু লেজুড়ের তো না গেলে চলবে না। তার জাতের ঢের বানর থাকে বনের ঐ অংশটায়; কারণ নানারকম ফলের গাছ ওখানটায় দেদার। কলা কাঁঠাল আম আনারস জাম জামরুল—অভাব ওখানে কোন-কিছুর নেই। আর এই ঝরনার ধারে? রাম কহো! দুচারটা যা গাছ আছে তা শাল শিশু দেবদারু শিরীষের, খাদ্য অখাদ্য কোনরকম ফলই তাতে ফলে না।

কাজেই লেজুড়কে যেতে হবেই। নানান সুরে কিচকিচ করে নানান পর্দায় ডাক ছাড়ল—হুক্কু হুক্কু। বেশ বোঝা যায় সে কখনো খোশামোদ করছে, কখনো করছে তম্বি! কিন্তু বাদশা অটল, সে শুনেও শোনে না।

বেলা ওদিকে পড়ে আসে। কী যেন বোঝাতে চায় লেজুড়, উটের নিরেট

চন্দ্রচূড়

মগজে ঢোকে না সে-কথা। নিরুপায় লেজুড় শেষকালে রওনা হতে বাধ্য হল একা-একাই; এ-গাছ থেকে ও-গাছে লাফাতে লাফাতে ছুটল নিজের আস্তানার পানে; গোগ্রাসে গিলতে লাগল। যে-ফল সমুখে পড়ে তাই খায়, ভালমন্দর বিচার তার উবে গিয়েছে যেন।

ডালে ডালে গাছে গাছে তখন আরও অনেক অনেক বানর। তারা সব বেছে বেছে ভাল ভাল ফল উদরে পুরছে, আর লেজুড়ের এলোপাথাড়ি খাওয়া দেখে অবাক্ হয়ে যাচ্ছে। অবশেষে আর থাকতে না পেরে কিচিরমিচির করে উঠল তারা—হয়ত লেজুড়কে জিজ্ঞাসা করল—"হয়েছে কী তোর? যা-তা খাচ্ছিস কেন অমন করে?"

পালটা কিচিরমিচির এল লেজুড়ের তরফ থেকে। সে হয়ত জবাব দিল—"এক বেআক্কেল চারপেয়ে জানোয়ার এসেছে গাঁয়ের দিক থেকে। ইয়া মস্ত কলেবর, কিন্তু বুদ্ধির ভাঁড়ার ঢুঢু। এত করে বোঝালাম—ঝরনার ধারে রাতের বেলায় বাঘ-টাঘ আসে, ওখানে থাকিসনি। তা বুঝলও না, শুনলও না। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে যাই এখন! কেষ্টর জীবটা বেঘোরে মারা না পড়ে, দেখতে হবে তো!"

গম্ভীর হয়ে গেল বানর কোম্পানি। বাঘের হাত থেকে কোথাকার কোন্ বেআক্কেল চারপেয়েকে বাঁচাবার জন্য লেজুড় ছুটেছে অন্ধকার রাতে ঝরনার ধারে। মাথা খারাপ হয়েছে, তাতে ভুল নেই। বানরের বুদ্ধি আছে বটে, কিন্তু গায়ের জোর? —কিছু না! অন্ততঃ বাঘের থাবার কাছে সে জোরের কিছু দাম নেই। তবে? লেজুড়টা মরবে। হাই তুলল সবাই। মরে যদি তো মরুক, কী আর করা যাচ্ছে! ছেলেমানুষ তো নয়! শখ করে মরে যদি মরতে দাও!

কিন্তু সত্যি সত্যি খাওয়া শেষ করে লেজুড় যখন হুক্কু বলে তাদের বিদায় সম্ভাষণ জানাল, তখন বড় বড় গোটা দশেক বানর সঙ্গ নিল তার। সত্যি সত্যি তো আর লেজুড়কে একা বিপদের মুখে এগিয়ে যেতে দিতে পারে না তারা!

ওদিকে বাদশা তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে গাছতলায়। অল্প অল্প চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঠিক তার সমুখের বৃহৎ ফাঁকাটায়। সেই ফাঁকায় যে হামা দিয়ে এসে বসেছে এক বৃহৎ চিতা, বাদশা তা জানতেও পারেনি।

● শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

চন্দ্রচূড়

শিরদাঁড়া টান করে চিতা-মহারাজ লম্ফ দেবেন দেবেন করছেন, এমন সময় এক ডজন বানর একসঙ্গে গর্জে উঠল—"হুক্কু"! আর ঢিলের উপর ঢিল ছুড়তে লাগল চিতার গায়ে—বড় বড় পাথরের টুকরো। রাগে গরগর করে চিতা এদিক-ওদিক চাইতে লাগল বানর-গুলোর সন্ধানে, কিন্তু তারা সব গাছের ডালে; দেখতে পেলেও তাদের নাগাল ধরা সম্ভব নয়। এদিকে শোরগোল শুনে গাঁক গাঁক করতে করতে বাদশা দিল ছুট, আর "হুক্কু হুক্কু" রব তুলে গাছে গাছে লাফাতে লাফাতে তার পিছু নিল এক পাল বানর। চিতাটা বোধ হয় উট-বানরের এই যোগাযোগ দেখে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে পড়েছিল, তেড়ে যাওয়া দূরে থাক, একবার গরর গর করে গর্জে উঠতেও সে ভুলে গেল।

পরদিন থেকে লেজুড়দের দুচারজনকে সঙ্গে না নিয়ে বাদশা আর ঝরনায় আসে না। আসেও যখন, জলটি খায়, সুড়সুড় করে ফিরে যায় বানরদের আস্তানায়। বানরেরা থাকে গাছের ডালে, বাদশা থাকে গাছের তলায়। তার ঘোরাফেরার ফলে ক্রমশঃ ওখানকার ঝোপঝাড় অনেকটা ভেঙেচুরে গেল, দাঁড়াবার শোবার জায়গা তৈরী হল বাদশার।

শিরদাঁড়া টান করে চিতা-মহারাজ লম্ফ দেবেন দেবেন করছেন।

দিন একরকম আরামেই কাটে। আবার ক্রমে ক্রমে সাহস বাড়ে বাদশার। এক-একদিন একা-একাই চলে যায় চরতে দূরদূরান্তে;

ফিরে আসে বেলাবেলি। চিতা-টিতা দিনের বেলায় বেরোয় না, কাজেই আঁধার ঘনিয়ে আসবার আগেই যদি ফেরা যায়, তবে বিপদের ভয় কিছু নেই তা জানে বাদশা। জানে লেজুড়েরাও, কাজেই তারাও আর নিষেধ করে না।

একদিন হল কি—

বেলাবেলিই ফিরছে বাদশা।

বানরদের আস্তানা তখনো খানিকটা দূর আছে, হঠাৎ বহু কণ্ঠের কিচিরমিচির একসাথে বাদশার কানে এল। চমকে উঠল সে। এ তো সাধারণ ডাকাডাকি নয়! ভয়ের চিৎকার, কান্নাকাটি, হতাশ আর্তনাদ। বানরদের দারুণ কিছু বিপদ ঘটেছে। জানোয়ারের নিরেট মগজেও এটা সহজেই ঢুকল যে সর্বনাশ সমুখে না দেখলে এতগুলো বানর কখনো এমন আকুল হয়ে কেঁদে উঠত না একসাথে।

বাদশা ছুটন্ত মাল-ট্রেনের মতই ছুটল।

ঐ যে! বিশ-পঁচিশটা লোক! মুষকো জোয়ান! সর্বনাশ! খান বাহাদুর নিজে! বন্দুক হাতে!

বিশ-পঁচিশটা বানরকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে ওরা। কী জানি কী ফাঁদে তাদের ধরেছে, তা বাদশা জানবে কেমন করে। কিন্তু ধরেছে, তাতে তো আর ভুল নেই। ধরেছে এবং বেঁধেছে। ছুঁচলো বল্লমের খোঁচা দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে বনের বাইরে—মহানন্দার সোঁতার দিকে। বাদশার জানবার কথা নয়—কিন্তু খান বাহাদুর মার্কিন মুলুকে বানর চালান দেবার ব্যবসা শুরু করেছেন, মোটা টাকা লাভ ওতে।

বাদশা বুঝি একবার থমকে দাঁড়িয়েছিল; কিন্তু সেই মুহূর্তে বাদশার দোস্ত সেই লেজুড় হঠাৎ পিছন ফিরে তাকিয়েই তাকে দেখতে পেল, আর কেঁদে কেঁদে কী যেন বলে উঠল কিচিমিচি করে। তার কথা শুনে সবগুলো বানরই ফিরে তাকাল বাদশার দিকে আর সবগুলোই একসঙ্গে কাঁদতে লাগল বানরে ভাষায়।

বাদশার ভয়ডর ছুটে গেল। সেই যেদিন নিজে জবাই হতে গিয়েছিল, সেদিন একটা বিদ্যুৎ চমকে গিয়েছিল তার জানোয়ারী মগজের ভিতরে এক লহমার জন্য, সেই

বিদ্যুৎ তাকে কাজ করতে শিখিয়েছিল বিদ্যুতের বেগে। আজও ঠিক তেমনি বিদ্যুৎ চমকাল তার মাথায়, তেমনি বিদ্যুতের বেগে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল মরণের মুখে।

কী-যেন একটা ছুটন্ত জানোয়ারকে আসতে দেখে মুষকো জোয়ানেরা প্রাণের ভয়ে এদিক-ওদিক লাফিয়ে পড়ল, বানরদের বাঁধনদড়ি ফসকে গেল তাদের হাত থেকে। বানরেরা চটপট বাঁধন খুলতে খুলতে লুকিয়ে পড়ল ঝোপঝাড়ে, চটপট উঠতে লাগল গাছের ডালে। বন্ধুরা মুক্তি পেয়েছে দেখে বাদশাও ফিরবে ফিরবে ভাবছে, এমন সময়ে—গুড়ুম—খান বাহাদুরের বন্দুকের গুলি এসে বিঁধল বাদশার মাথায়। গাঁক করে একটা আর্তনাদ বেরুলো তার মুখ থেকে, সঙ্গে সঙ্গে বনের ভিতর লুটিয়ে পড়ল তার দেহ।

বাদশা কিন্তু একা পড়ল না; তাকে পড়তে দেখে করুণ সুরে একবার হুক্কু বলে ডেকে উঠল তার বন্ধু লেজুড়, আর গাছের ডালের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে সে লাফিয়ে এসে পড়ল বাদশার গায়ের উপর। কী তার কান্না! কী তার লুটোপুটি!

খান বাহাদুরের বন্দুকের গুলি এসে বিঁধল বাদশার মাথায়।

উট আর বানরের যোগাযোগ সেদিন চিতাটাও বুঝতে পারেনি, আজ বুঝতে পারলেন না খান বাহাদুরও। আর এক গুলি খরচ করে লেজুড়কে তিনি খতম করে দিলেন, তারপর কাছে এসে আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন—"আরে, এ যে আমার সেই পলাতক উটটা! নে, সবাই এটাকে কেটেকুটে বাড়ি নিয়ে চল। উটের মাংস খাওয়াব বলেছিলাম তোদের। জবান ঠিক রাখতে পারব।"
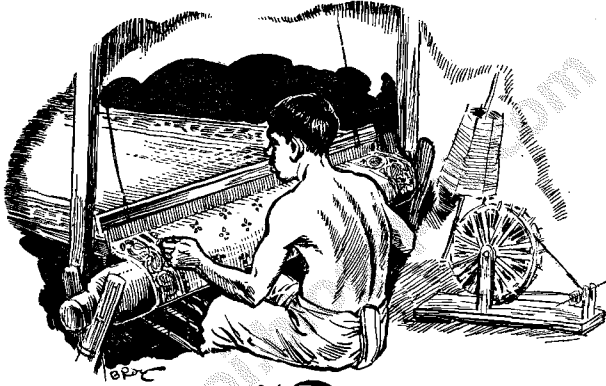
তাঁতীর বরাত

—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

অজ-পাড়াগাঁ। চাষী-মজুরই বেশী সেখানে, দুচার ঘর ভদ্রলোক যাঁরা আছেন, তাঁরাও খুব গরিব।

সেই গাঁয়ে বাস করে এক তাঁতী।

সার্থক তাঁত বুনতে শিখেছিল সে। হাতের কাজ দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। এমন সব বুটি তোলে, কলকা বুনে তোলে এমন চমৎকার—কাপড় যেন ঝলমল করে ওঠে।

কিন্তু কী বরাত! গরিব গাঁয়ে শৌখিন কাপড়ের দাম দেবে কে? অন্য তাঁতীদের বোনা মোটা মামুলী কাপড়ই হাটে বিকোয়; আমাদের সোমিলকের কাপড় সবাই একবার করে নাড়ে বটে, কেনে না কেউ। এমন কি, দাম পর্যন্ত জানতে চায় না, ভাবে—'এ তো রাজার ঘরের জন্য বোনা, আমরা আদার ব্যাপারী জাহাজের খোঁজ নিয়ে করবো কী?'

চন্দ্রচূড়

হাট ভাঙ্গবার মুখে সোমিলকই খোশামোদ করে চেনা লোকদের। 'নিয়ে যা ভাই, চাইনে বেশী দাম, মুড়ি-মুড়কি একদামেই বিকিয়ে যাক! যা হোক কিছু পয়সা না এলে যে খেতেই পাব না!'

বাড়ি গিয়ে দিব্যি গালে যে, এবার থেকে অন্য তাঁতীদের মত বাজে জিনিসই বুনবে সে। কিন্তু কী গেরো! তাঁতে বসলে সে-কথা তার মনে থাকে না। কখন যে ভাল ভাল নকশা ফুটতে শুরু করে তার টানা-পোড়েনে নিজেও তা সে জানতে পারে না। ভাল কাজ করবার জন্যই জন্ম তার, চেষ্টা করেও সে খেলো কাজ করতে পারে না।

দুঃখ তার ঘোচে না।

বামুনবাড়ির এক ছেলে বহু দূরদেশে মস্ত কোন পণ্ডিতের কাছে পড়ে। সে একবার বাড়ি এল বাপ-মাকে দেখতে। সোমিলকের দুর্দশা দেখে সে বললে—'খুড়ো একটা কথা বলি। আমি শহরে থাকি, সেখানকার হালচাল জানি। তোমার হাতের এ-কাপড়—এ জিনিসের বাজার হল শহরে। সেখানে লোকের শখও আছে, পয়সাও আছে, তুমি যদি কোন বড় জায়গায় গিয়ে কাজ কর, সোনাদানায় ঘর ভরে যাবে তোমার।'

কথাটা মনে লাগল সোমিলকের।

শহরেই সে যাবে।

কিন্তু সব চাইতে নিকটের যে-শহর সেও তো দিন সাতেকের পথ! গেলে সেইখানেই পাকাপাকি ভাবে থাকতে হয়, ঘন ঘন যাওয়া-আসা চলে না।

কিন্তু তাঁতিনীর তাতে ঘোর আপত্তি। বাপ-পিতামহের ভিটেতে সন্ধ্যে জ্বলবে না, এও কখনো হয় নাকি?

তার উপর তাঁতিনীর বুদ্ধিও কী রকম যেন উলটো। সে বলে—'শোন তাঁতী, বরাত ছাড়া পথ নেই। আমাদের ভাগ্যে যদি পয়সা থাকত, এই গাঁয়ে বসেই পেতাম। শহরে গেলেই যে হাভাতের ঘরে কাঁড়ি কাঁড়ি পয়সা আসবে, আমার তো তা মনে হয় না।'

চন্দ্রচূড়

তর্কাতর্কি অনেক হল। শেষ পর্যন্ত সোমিলকের যাওয়াও তাঁতিনী বন্ধ করতে পারল না, বাপ-পিতামহের ভিটে থেকে তাঁতিনীকে নড়াবার সাধ্যিও সোমিলকের হল না।

যাওয়ার আগে সোমিলক বন্দোবস্ত করে ফেলল, তাঁতিনী সুতো কেটে অন্য তাঁতীদের দেবে, তার এক বেলা খাওয়ার মত দুমুঠো চাল যা হোক করে তা থেকেই যোগাড় হবে হয়তো।

অবশেষে ভট্চাজমশাইকে দিয়ে শুভ দিন দেখান হল। গাঁয়ের সওয়া পাঁচ গণ্ডা দেবস্থলীতে প্রণাম করে এল সোমিলক। তারপর 'কেন কাঁদছিস তাঁতিনী, এই তো দুদিন বাদে আমি ফিরে এলাম বলে'—এই কথা বলতে বলতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো। 'শ্রীদুর্গা! শ্রীদুর্গা!'—রাস্তায় বেরিয়ে তার নিজের চোখের জল আর থামে না।

ক্রমাগত সাতদিন হাঁটছে সোমিলক। যেদিন সন্ধ্যার মুখে কোন গ্রামের কাছে এসে পড়ে, গাঁয়ের লোকে আদর করে ঘরে ডেকে নেয়। অপরিচিত অতিথিকে ভাল করে খাওয়ায়, চণ্ডীমণ্ডপের ভাল জায়গাটিতে বিছানা করে দেয়। আর যেদিন গ্রাম চোখে পড়ে না, আঁধার ঘনিয়ে আসবার আগেই সে পোঁটলা থেকে চিঁড়ে বার করে; তাই চিবিয়ে রাস্তার ধারের দীঘি বা নদীর জল পেট ভরে খেয়ে উঁচু দেখে একটা গাছের মগডালে উঠে পড়ে। তারপর চাদর দিয়ে নিজেকে শক্ত করে ডালের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে সেই তিন-শূন্যেই নাক ডাকিয়ে ঘুম!

অবশেষে শহর, বর্ধমানপুর।

প্রকাণ্ড শহর! তাক লেগে যায় সোমিলকের। ভয় পায়—এর ভিতর হারিয়ে যাবে না তো! এক একবার মনে হয়—দূর হোক গে, কাজ নেই বড়মানুষ হয়ে, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই, সেখানে যা-হোক করে এক মুঠো জুটছিল তো! এ বিদেশ বিভুঁয়ে, একটা চেনা মুখ চোখে পড়ে না—এখানে বাঁচব কি করে!

কিন্তু তারপরই মনকে শক্ত করে সোমিলক। সে গুণীলোক। ভগবান তাকে গুণ দিয়েছিলেন কি তা গোপন করে রাখবার জন্য? সেই গুণ দিয়ে মানুষের কাজ

● শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা
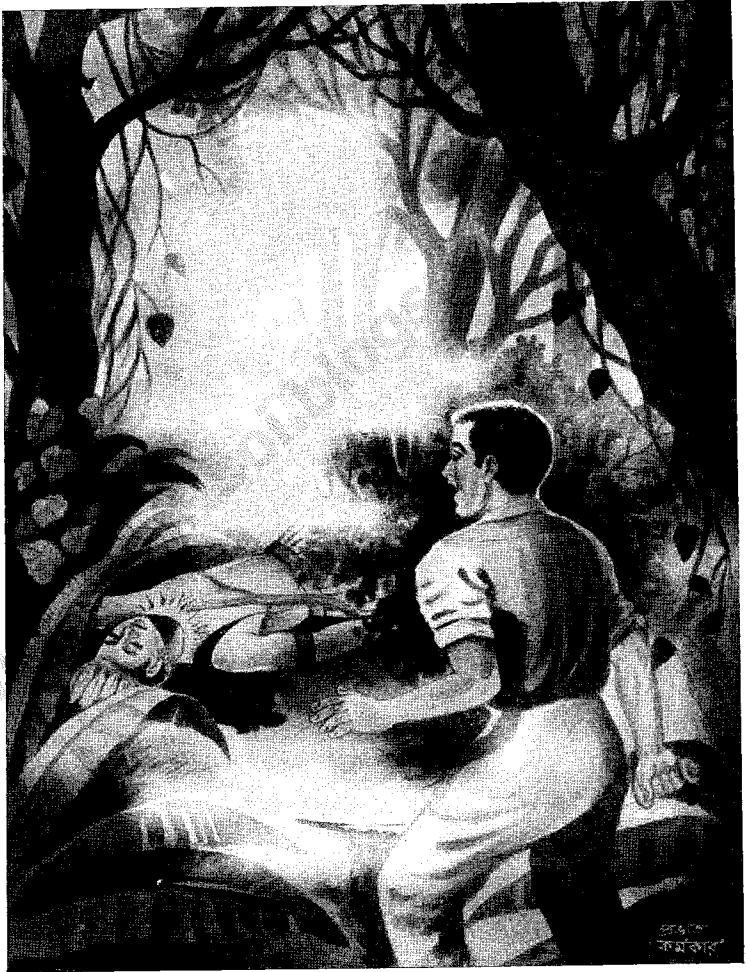
নীরুর হাতের তরোয়ালের এক কোপ তার কাঁধ থেকে বুক পর্যন্ত দুই আধখানা
করে চিরে ফেলল। [পৃঃ ১৯৮

করবে সে। মানুষও পালটা তাকে কিছু দেবে। দেবে পয়সা, দেবে মান। সেই আশাতেই সে সাতদিনের পথ ভেঙে বর্ধমানপুরে এসেছে। এখন ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলে লোকেই বা বলবে কী, নিজের মনের কাছেই বা সে কী বলে জবাবদিহি করবে?

একবার লড়ে দেখা যাক!

সোমিলক মন খাঁটী করে কাজে লেগে গেল।

তাঁত বেচে সে টাকা এনেছিল সঙ্গে। তাই দিয়ে সে নতুন তাঁত কিনল। জিনিসপত্র যোগাড় করে নিয়ে ভগবান স্মরণ করে কাজ শুরু করল সোমিলক। প্রথম কাপড় যখন সে জুড়ছে, শহরের তাঁতীরা মজা দেখতে এল। সেই যে কথায় বলে— কামারপাড়ায় এই গেঁয়ো লোকটা সত্যি তাই করছে। যেখানে ওস্তাদ তাঁতীদের কারবার চলছে শত শত, সেখানে কাপড় চালাতে এল কিনা ধাপধাড়া-গোবিন্দপুরের হাবাগোবা সোমিলক! এ ওর গা টেপাটেপি করে হাসে তারা।

কিন্তু মুখের হাসি মিলিয়ে গেল তাদের। ক্রমে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে উঠল। এ লোকটা গুণ জানে কিছু। এমন কাপড় মানুষে বুনতে পারে কখনো? মিহি যেন রেশমী কাপড়! কলকায় যেন তাজা ফুল ফুটেছে! সোমিলকের পায়ের ধুলো নিয়ে ঘরে গেল তারা।

বাজারে নাম ছড়িয়ে পড়লো। আড়তদারেরা বায়না দিয়ে গেল। কারও বিশখানা কাপড় চাই, কারও পঞ্চাশ খানা। টাকা আর টাকা। সোমিলকের কেবল এক আক্ষেপ—তাঁতিনী তার এ-পসার চোখে দেখল না! বোকা মেয়েমানুষ—সে কিনা সোমিলককে পরামর্শ দিতে এসেছিল—'বরাতে থাকলে গাঁয়েতেই পয়সা হত; মিছে তুমি শহরে যেও না!'

কিন্তু মনকে বোঝায় সোমিলক—তাঁতিনী আজ না দেখুক, একদিন দেখবেই। বছরখানেক এইভাবেই কেটে গেলে মোটা টাকা জমবে যখন, তখন সে গাঁয়ে যাবে একবার। ঝনঝন করে মোহর বৃষ্টি করবে তাঁতিনীর সম্মুখে। তাঁতিনী বুঝবে—তার স্বামী তুচ্ছ লোক নয়; গাঁয়ে বসে যে সে পয়সা রোজগার করতে পারে নি—সেটা গাঁয়ের লোকেরই দোষ। সোমিলকের দোষ নয়।

চন্দ্রচূড়

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস গড়িয়ে যায়, বছর শেষ হয়ে এল। সোমিলক একদিন গুনে দেখল—পাঁচশো মোহর জমেছে তার। করকরে ঝকঝকে সব মোহর। টুং করে আওয়াজ হয় টোকা দিলে, কী মিষ্টি সে আওয়াজ ; সোমিলকের কান জুড়িয়ে যায়। এক এক সময় চোখ বুজে সে শুধু হাত বুলিয়ে যায় মোহরের গাদার উপরে, আর কী মোলায়েম লাগে এই শক্ত ধাতুখণ্ডগুলো !

সোমিলক কিন্তু লোভীও নয় হিসেবীও নয়। টাকা জমাবার জন্য সে টাকা চায় নি, চেয়েছে ব্যবহারের জন্য। নিজে ভাল খাবে ভাল পরবে, তাঁতিনীকে ভাল খাওয়াবে ভাল পরাবে, আত্মীয় কুটুম্ব প্রতিবেশীকে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করবে বাড়িতে —এইগুলিই তার মনের সাধ। এই সাধগুলি পূর্ণ করবার জন্যই সে অর্থ চেয়েছে চিরদিন। এখন এই মোহরের স্তূপ হাতে পেয়েও সেই কামনাই আবার প্রবল হয়ে উঠেছে তার মনে, আগ্রহে সে দিন গুনছে—কবে ঘরে ফিরবে, তাঁতিনীকে গয়নায় মুড়ে দেবে, কবে ভাল ঘর বেঁধে পালঙ্কের উপর শোবে আরাম করে।

অবশেষে একদিন সত্যি সে ঘরে ফিরলো। তাঁতশালা বন্ধ করে শহরের নতুন আলাপীদের কাছে বিদায় নিল দু-এক মাসের জন্য। আবার সে আসবে, কথা দিয়ে গেল সবাইকে।

সোমিলক দেশে চলেছে—কী আনন্দ তার মনে ! সার্থক হয়েছে তার দুঃসাহস। সাতদিনের হাঁটা-পথ পেরিয়ে বর্ধমানপুরে তার গাঁয়ের কোন তাঁতীই তার আগে আসতে সাহস করেনি। সে এসেছে এবং সেখান থেকে পয়সা রোজগার করে নিয়ে যাচ্ছে। একটা যুদ্ধ জয় করে বিজয়মাল্য মাথায় পরে ফিরছে সোমিলক ; গাঁয়ের লোক এখন তাকে বাহবা দিক !

ধার্মিক রাজার দেশ, চোর ডাকাত নেই। মোহর কেউ কেড়ে নেবে, এমন ভয় নেই। ভয় কেবল বাঘ-ভালুকের আর সাপের ! দূরে দূরে গ্রাম, রোজ যে রাত্রে মাথা গুঁজবার ঠাঁই পাওয়া যায়, তা নয়। একদিন এক গভীর বনের ভিতর দিয়ে চলতে চলতেই সে দেখল—সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

এবারেও তার পোঁটলায় চিঁড়ে আছে ; তবে শুকনো চিঁড়ে শুধু নয়, তার সঙ্গে

● শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

আছে বর্ধমানপুরের সুস্বাদু সীতাভোগ। তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নিয়ে সে এক গাছে উঠে পড়লো, এবং মগডালের সাথে নিজেকে চাদর দিয়ে শক্ত করে বেঁধে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল নিশ্চিন্ত মনে।

সকালে উঠে পথ চলতে গিয়ে তার মনে হল—কোমরটা কেমন হালকা লাগছে যেন। পাঁচশো মোহর গেঁজেতে ভরে কোমরে বেঁধে রেখেছিল সে, তার ওজনটা তো কম নয়! সে ওজন আজ কমল কিসে?

কোমরের হাত মাথায় উঠল চোখের পলকে! ধপাস করে সেই বনের পথে বসে পড়ল সোমিলক! গেঁজে ঠিকই আছে কোমরে, কিন্তু একেবারে খালি!

এ কী এ? রাত্রে মোহর কোমরে বেঁধে গাছের মগডালে সে ঘুমিয়েছে! সেখানে উঠে তার কোমর থেকে মোহর নিলে কে? যেভাবে গেঁজে বাঁধা ছিল ঠিক সেই ভাবেই বাঁধা রয়েছে, শুধু তার ভিতরকার মোহরগুলি নেই! একি কাণ্ড! কে নিলে? কেমন করে নিলে? কেন নিলে?

হতবুদ্ধি হতচৈতন্যের মত একভাবে এক জায়গায় বহু, বহুক্ষণ বসে রইল হতভাগ্য সোমিলক। তার মাথায় আবছাভাবে একটা কথা ঘোরাফেরা করছিল কেবল—তাঁতিনীর সেই কথা—'ভাগ্যে যদি পয়সা থাকত, গাঁয়ে বসেই পেতাম।'

মাথার উপর একটা বটফল টুপ করে পড়ল। চমকে উঠে উপর পানে তাকিয়ে সোমিলক দেখল কোথা দিয়ে গোটা দিনটাই কেটে গিয়েছে; আবার সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আসছে বনের ভিতর।

সোমিলক কী করবে? ঘরের দিকে যাবে? গিয়ে তাঁতিনীকে বলবে—'আমি পয়সা পেয়েছিলাম, কিন্তু ভোগে লাগল না?' কিংবা আবার বর্ধমানপুরে যাবে নতুন করে কাজ শুরু করবার জন্য? কী ফল তাতে? পয়সা আবারও আসবে হয়ত, কিন্তু আসবে তো শুধু কর্পূরের মত উবে যাওয়ার জন্য?

বাঘের ডাক শোনা যায় অরণ্যে। গাছে ওঠা দরকার। তাই উঠল সোমিলক। কিন্তু মগডাল পর্যন্ত গেল না। একটা শক্ত লতা জড়িয়েছিল গাছটায়। সেই লতার এক প্রান্ত ছুরি দিয়ে কেটে নিজের গলায় শক্ত করে বাঁধল, তারপর ঝাঁপ দিল গাছ থেকে।

চন্দ্রচূড়

গাছের তলায় দাঁড়িয়ে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ।

লতার ফাঁস গলায় আটকে যখন তার শ্বাসরোধ হতে যাচ্ছে, তখন কে যেন তার পায়ের তলায় হাত দিয়ে উঁচু করে তুলল। ভয়ে বিস্ময়ে নীচু পানে তাকিয়েই সে দেখল—গাছের তলায় দাঁড়িয়ে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ।

সোমিলক গলার ফাঁস খুলে ফেলে গাছ থেকে নেমে এল। প্রণাম করল জ্যোতির্ময় পুরুষকে। স্নিগ্ধস্বরে সেই পুরুষ বললেন, 'ভোগ তোমার ভাগ্যে নেই সোমিলক! আমি বিধাতাপুরুষ, আঁতুড় ঘরে আমি তোমার কপালে লিখে দিয়েছি—মোটা ভাত মোটা কাপড় ছাড়া কোনদিন কিছু জুটবে না তোমার।'

মনের দুঃখে বিধাতা-পুরুষেরও সম্মান রেখে কথা কইতে পারল না সোমিলক—'আমার মোহরগুলো হলো কি? ভোগ না হয় নাই করতাম, উপার্জন যখন করেছি—তখন মোহরগুলো আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া আপনার উচিত হয় নি।'

বিধাতাপুরুষের মুখখানি সমবেদনায় করুণ হয়ে এল।

● শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

'ভোগই যখন করতে পারবে না, তখন অর্থ দিয়ে হবে কি? যখের মত আগলাবে সারা জীবন? সে যে মানুষের চরম দুর্গতি! তুমি লোক ভাল, তাই সেই দুর্গতি থেকে তোমায় রক্ষা করবার জন্যই আমি মোহরগুলো সরিয়ে নিয়েছি তোমার।'

সোমিলক মরিয়া হয়ে উঠেছিল মনে মনে। ক্রুদ্ধভাবে বলল—'ভোগ আর যখের মত আগলানো—এ ছাড়া কি আর অন্যভাবে অর্থের ব্যবহার করা যায় না? আমি বিলিয়ে দেব আমার টাকা! যেখানে যত দীন দুঃখী আতুর আছে—'

হঠাৎ যেন মাথাটা ঘুরে উঠল সোমিলকের। মাটিতে বসে পড়ে সে চোখ বুজলো।

চোখ মেলে আবার চাইল যখন, তখন ভোরের আলোয় বনভূমি হেসে উঠেছে! অবাক্ হয়ে সোমিলক দেখল—গাছতলায় সে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে; আর ততোধিক অবাক হয়ে সে অনুভব করল—কোমরের গেঁজে আগের মতই মোহরে ভরতি।

বক্কা রাজার কাহিনী

—পূরবী দেবী

বক্কা রাজা হয়ে দেখলে তার দেশে যত সৈনিক ছিল, সেনাপতি ছিল তাদের দ্বিগুণ। বয়স হলেও রাজার বুদ্ধি ছিল কম। তাই সে বুঝতে পারেনি যে এত সেনাপতি থাকলে যুদ্ধের সময় তারা কোন কাজে আসবে না।

তখন দেশে যুদ্ধবিগ্রহও কিছু ছিল না আর হবার সম্ভাবনাও দেখা যায়নি। তাই সৈনিক আর সেনাপতি নিয়ে বক্কা রাজা মাথা ঘামালে না। বেশ সুখেই কেটে যাচ্ছিল তার দিন। রোজ সকালে সাজগোজ করে এসে সভায় বসত। মন্ত্রী, ওমরাহ ও সেনাপতিরা এসে বড় বড় সেলাম করে বলত, মহারাজের জয় হোক! খুশী হয়ে রাজা তাদের বসতে দিত। কোন কাজকর্মও ছিল না। তাই দাবার ছক পেতে বসে যেত রাজা বক্কুচন্দ্র মন্ত্রীর সঙ্গে কিস্তিমাত খেলতে।

ছক পাতা হতেই চারদিক থেকে সেনাপতি আর ওমরাহরা রাজাকে ঘিরে খেলা দেখত। রাজা চাল দিলেই বলে উঠত, বাঃ কি চাল! এত বুদ্ধি আমাদের নেই। সে কথা শুনে রাজার হাতটা আপনিই গোঁফের কাছে উঠে আসত। গোঁফ তো নেই। কিন্তু সে তার বাবাকে গোঁফ পাকাতে পাকাতে ভাবতে দেখেছে। তাই মনে মনে গোঁফের কাছে একটু তা দিয়ে নিত।

এমনি করে দিন যায়। একদিন একটা দরজী এসে হাজির হল রাজসভায়।

রাজা বললে, কি চাই?

—চাকরি।

—কি কাজ কর ?

—আমি দরজী। খুব তাড়াতাড়ি পোশাক তৈরি করে দিতে পারি।

—বেশ, সেনাবাহিনীর পোশাকের ভার তোমার ওপর দেওয়া হল।

কিছুদিন বাদে একটা গাইয়ে এসে হাজির হল রাজসভায়।

রাজা বললে, তোমার কি চাই ? কি জান তুমি ?

—আজ্ঞে মহারাজ আমি গান গেয়ে লোককে কাঁদাতে পারি।

—তাই নাকি ! তবে তুমি তো বড় ওস্তাদ দেখছি। তোমায় সেনাবাহিনীর ড্রাম-বাজানো বিভাগের বড়কর্তা করে দিলুম।

এবার এল একটা রাখাল। সে গরু চরায়। হঠাৎ তার গরুগুলো বাঘে ধরে নিয়ে যাওয়ায় সে বেকার হয়ে পড়েছে। তাই চাকরির জন্যে রাজার কাছে তাকে আসতে হয়।

রাজা তাকে সেনাদের খাদ্যবিভাগের হেড বাবু করে দিলে।

সব শেষে এল এক শিকারী। সে খুব ভাল তীর ছুড়তে পারে। তাই রাজা তাকেও চাকরি দিলে সেনাবিভাগে।

এতগুলো নতুন লোককে বড় বড় চাকরি দেওয়ায় রাজার পুরানো সেনাপতিরা মনে মনে খুবই চটেছিল। রাজকোষ থেকে শুধু শুধু এত টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। তাই তারা কথাটা রাজার কানে তুললে একদিন। রাজা সে কথায় কান দিলে না। যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল।

এদিকে হয়েছে কি, ভিন দেশের রাজা সৈন্যসামন্ত সাজিয়ে বক্কা রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য এগিয়ে আসছেন। তারা যখন নদীর ওপারে এসে তাঁবু ফেললে, তখন রাজার চর এসে খবর দিলে ভিন দেশের রাজা যুদ্ধ করতে এসেছেন। নদীতে এখন অনেক জল তাই জল না নামা অবধি তারা ওপারে অপেক্ষা করবে।

বলার দরকার ছিল না রাজাকে। প্রাসাদের ওপর থেকে সে নিজেই সব দেখেছে। এখন চরের মুখে সব শুনে তার মুখ গেল শুকিয়ে। তখুনি গোনা শুরু

হয়ে গেল রাজ্যে কত সেনা আছে। দেখা গেল সেনাদের সংখ্যা মোটে পাঁচশ আর সেনাপতির সংখ্যা দেড় হাজার। সেনাপতিরা তো আর যুদ্ধ করে না, উপদেশ দেয়। তাই রাজা পড়ল মহা ফাঁপরে। এখন উপায়!

কোন উপায় না দেখে রাজা ঘোষণা করলে—কে আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পার?

রাজার ঘোষণায় সেনাপতিরা সব মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। কিন্তু কেউই কোন বুদ্ধি দিতে পারে না।

এমন সময় দরজী এগিয়ে এসে বললে, রাজামশাই! আমি এর একটা উপায় বের করেছি। তবে অনেক টাকা খরচ হবে।

রাজা বললে, বেশ তো, তোমার যত খুশি টাকা কোষাগার থেকে নাও।

রাজার আদেশ নিয়ে দরজী চলে গেল।

তারপর সে রাজ্যে যত দরজী ছিল সকলকে ডেকে কাজে লাগিয়ে দিলে। হাজার হাজার লাল নীল বেগুনী বাদামী সবুজ হলদে পোশাক তৈরী হতে লাগল।

তার পরদিন সকালে দেখা গেল, বক্কা রাজার সৈন্যেরা নদীর এদিকে কুচকাওয়াজ করে যাচ্ছে।

প্রথমে গেল পুরানো ছেঁড়া পোশাক পরে একদল সৈনিক। তাই দেখে নদীর ওপার থেকে ভিন রাজার সেনারা হো হো করে হেসে বিদ্রূপ করতে লাগল।

ছেঁড়া পোশাক পরা সৈন্যেরা চলে যাওয়ার পর এল লাল পোশাক পরা সেনারা। তাই দেখে ভিন রাজার সেনারা এবার আর ঠাট্টা করলে না।

লাল পোশাক পরা সেনাদের পেছনে এল বেগুনে পোশাক পরা সৈন্যেরা। ভিন রাজার সৈন্যেরা ক্রমশঃ গম্ভীর হয়ে উঠল।

এইভাবে সারাদিন ধরে কুচকাওয়াজ করতে লাগল নদীর এপারে কখনও লাল, কখনও বেগুনী, হলদে, সবুজ, বাদামী পোশাক পরা সেনার দল।

ভিন রাজার সেনারা সারাদিন ধরে তাদের গুনেছিল। দিনের শেষে দেখলে, বক্কা রাজার অধীনে আছে দশ হাজার সেনা আর তারা এসেছে মোটে চার হাজার।

● পূরবী দেবী

এত লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করা মানেই প্রাণটা রেখে যাওয়া। ব্যস, সে রাতেই তাঁবু গুটিয়ে ভিন রাজা সেনাদের নিয়ে সরে পড়লেন।

ধাপ্পা চিরদিন চাপা থাকে না। বক্কা রাজার ধাপ্পাও গুপ্তচরের মুখে ভিন রাজার কানে এল।—'কি—আমায় ঠকানো, দেখে নেবো এবার', এই বলে তোড়জোড় করে আবার ভিন রাজা এসে তাঁবু ফেললেন সেই নদীর ধারে। জলটা কমলেই নদী পার হয়ে প্রাসাদ আক্রমণ করবেন।

বক্কা রাজা এবার গাইয়েকে ডেকে বললে, তুমি একটা উপায় বার কর বন্ধু! দরজীর ধাপ্পায় তো এবার উদ্ধার নেই।

গাইয়ে বললে, ভাববেন না মহারাজ! আজই এর বিহিত করব।

সেদিন রাত্রে গাইয়ে তার বাজনাটা নিয়ে দক্ষিণদিকের এক পাহাড়ে গিয়ে বসল। দক্ষিণদিক থেকে উত্তরে হাওয়া বইছিল। তাই গাইয়ের গান বাতাসে ভেসে সোজা ভিন রাজার তাঁবুর দিকে চলে গেল।

খুব করুণ করে গাইয়ে একটা কীর্তন শুরু করলে।

গানের সুর এসে ভিন রাজা আর তাঁর সেনাদের কানে লাগল। তারা কান খাড়া করে শুনতে লাগল। তারপর তাদের নাকে ফোঁসফোঁসানি শুরু হল। চোখটা জলে ভিজে এল।

এমন সময় গাইয়ে কেঁদে কেঁদে আর একটা করুণ গান ধরলে। তার মানে হচ্ছে, বাড়িতে ছেলেমেয়েরা বাপেদের জন্যে কত ভাবছে। যুদ্ধে বাবা মারা গেলে তারা অনাথ হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াবে।

সেই গান শুনে শুধু সেনারা নয় রাজার মনটাও কেমন বিষাদে ভরে গেল। রানী আর রাজপুত্রদের জন্যে মনটা কেমন করে উঠল। তিনি কাউকে কিছু না বলে তাঁবু ছেড়ে দেশের দিকে যাত্রা করলেন। রাজাকে চলে যেতে দেখে সেনারাও তাঁবু টাঁবু ফেলে দেশের দিকে পা বাড়ালে। ব্যস্, বিনাযুদ্ধে এবারও বক্কা রাজা বেঁচে গেল।

দেশে ফিরে রাজার আবার খেয়াল হল। আবার তাঁকে ঠকিয়েছে দেখছি। এবার নিজের আর সেনাদের কানে তুলো লাগিয়ে তিনি এসে তাঁবু গাড়লেন নদীর ধারে।

চন্দ্রচূড়

এবার দেখছি আর রক্ষে নেই। বক্কা রাজা মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে আর মন্ত্রী তার মাথায় ঠাণ্ডা তেল ঘষছে।

কি উপায়?

এমন সময় সেই রাখাল এসে বললে, আমায় ভার দিন আর দুহাজার তেজী দ্রুতগামী ছাগল দিন।

তথাস্তু।

সেগুলি নিয়ে ভিন রাজার চোখ এড়িয়ে নদী পার হয়ে রাখাল এল ভিন রাজার সেনাদের তাঁবুর কাছে। তারপর তাদের ভয় দেখিয়ে দিলে ভীষণ তাড়া।

প্রাণের ভয়ে ছাগলরা ভিন রাজার তাঁবুর পাশ দিয়ে ছোটাছুটি করে পালাতে লাগল।

এদিকে ভিন রাজার সৈন্যদের রসদের খুব টানাটানি পড়েছিল। এতগুলো ছাগলকে ছোটাছুটি করে পালাতে দেখে তারা ধর ধর করে তাদের পেছনে ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে তারা অনেক দূরে গিয়ে পড়ল। অস্ত্রশস্ত্র সব তাঁবুতে পড়ে রইল।

তাই দেখে রাখাল এসে সব তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে দিলে।

এইভাবে বক্কা রাজা তিনবার যুদ্ধ না করেই বাঁচল।

বার বার ধাপ্পা মেরে বাঁচা যাবে এটা বোকা হলেও বক্কা রাজার বুঝতে দেরি হল না। অথচ সেনাসংখ্যা না বাড়ালেও চলবে না। বাড়াবার মতো রাজকোষে টাকা নেই। তখন শিকারীকে ডেকে বললে, এইবার তুমি একটা উপায় কর।

শিকারী বললে, যো হুকুম মহারাজ! তবে আপনি আদালতের বিচারপতিদের আদেশ দিন যে যারা মামলা করতে আসবে তাদের তীর ছোড়ার পরীক্ষা নেবে। যে জিতবে সেই মামলার রায় পাবে।

শিকারীর কথামত রাজা আদালতের বিচারপতিকে সেই রকম আদেশ দিয়ে দিলে।

● পূরবী দেবী

চন্দ্রচূড়

তখন শিকারী রাস্তায় গিয়ে প্রথম যে লোকটাকে দেখতে পেলে তার পায়ে মারলে এক লেঙ্গি। ধপাস করে লোকটা পড়ে গেল। তারপর উঠে ধুলো ঝেড়ে চলল আদালতে। সেখানে শিকারীর নামে সে মামলা শুরু করলে।

বিচারক বললে, তীর ছোড়। দেখি তোমাদের মধ্যে কে লক্ষ্যভেদ করতে পারে।

বিচারকের কথা শুনে লোকটা একেবারে অবাক্। কিন্তু কি আর সে করবে। তাই তীর ছোড়া শেখার জন্যে সময় চেয়ে নিল। এর পর শিকারী যাকেই দেখতে পায় তাকেই লেঙ্গি মারে। আদালতে নালিশ করে লোকটি সময় চেয়ে নেয় তীর ছোড়া শেখার জন্যে।

দেখতে দেখতে দেশসুদ্ধ লোক তীর ছোড়া অভ্যেস করতে লাগল।

এ খবর গিয়ে পৌঁছল ভিন রাজার কানে। তিনি শুনলেন, যুদ্ধ করবার জন্যে বক্কা রাজার সব প্রজারা তৈরী হচ্ছে। এ খবর শুনে তিনি যুদ্ধ করার কথা মন থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

বক্কা রাজার দেশে আবার শান্তি ফিরে এল। রাজসভায় আবার দাবার ছক পড়তে লাগল। তবে এবার সেনাপতি রইল মোটে চারজন—দরজী, গাইয়ে, রাখাল আর শিকারী।

লোকটির পায়ে মারলে এক লেঙ্গি।

বাকী সকলকে বক্কা রাজা সাধারণ সেনা করে দিলে।

—পূরবী দেবী
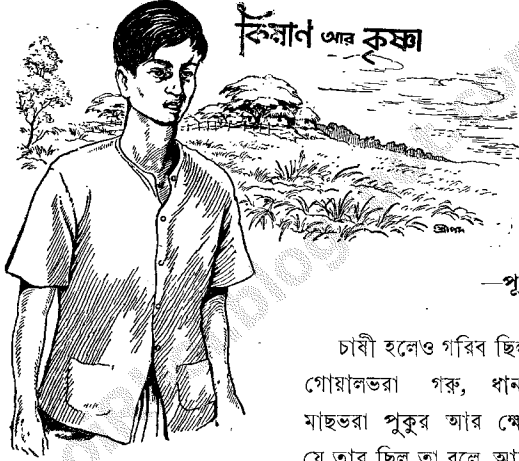
চাষী হলেও গরিব ছিল না কিষাণ। গোয়ালভরা গরু, ধানভরা মরাই, মাছভরা পুকুর আর ক্ষেতখামার কত যে তার ছিল তা বলে আর শেষ করা যায় না। যে বাড়িতে সে থাকতো সেটা সাধারণ চাষীদের মত মাটি দিয়ে তৈরী নয়, দস্তুরমতো পাকা বাড়ি সেটা। তার দোর-জানলা বেড়ার মতো বাখারি দিয়ে তৈরী নয়, ঠিক শহরের পাকা বাড়ির দরজা-জানলার মতো। তবে বেশী ভারী নয়, যে কেউ বয়ে নিয়ে যেতে পারতো সেগুলো।

কিষাণের বাড়িতে মাটির তলায় ছিল মস্ত একটা ঘর। কিষাণের ক্ষেতের সব আখ বিক্রি হত না। অত ফসল কিনবে কে ? তাই বাড়তি আখগুলো পিষে রস বার করে, জালায় পুরে সেই ঘরে সার সার রাখা থাকতো। সময়মতো সেই রস দিয়ে কিষাণ ভালমন্দ মিষ্টি তৈরি করে খেতো, আর কেউ কিনতে এলে তাকেও বিক্রি করতো।

কিষাণ বড় হয়েছে। তার বাবা মা কেউ নেই। সে ক্ষেতে কাজ করতে গেলে বাড়িঘর দেখার লোক নেই। তাই তার বন্ধুরা মিলে তার বিয়ে দিলে একটা মেয়ের সঙ্গে।

সেই মেয়েটার নাম কৃষ্ণা। কিন্তু ভারী সরল আর দয়ালু বলে বাড়ির লোক তাকে হাবী বলেই ডাকতো। যে যা বলতো হাসিমুখে সে সেই কাজ করতে ছুটে যেত। কাজ করতে করতে হয়তো আর একটা কাজের কথা মনে পড়ল। হাতের কাজ ফেলে সে ছুটতো মনে-পড়া কাজটা করতে। কখনও কারো কথায় পারবো না সে বলতো না।

একদিন কিষাণের বাড়িতে একটা মাগুর মাছ দিয়ে গেল এক জেলে। কিষাণ মাগুর মাছ সেদ্ধ খেতে বড় ভালবাসতো। সে ক্ষেতে যাবার আগে বউকে ডেকে বললে, বউ বউ, তুমি মাগুর মাছটা সেদ্ধ করে রেখ। আমি ক্ষেত থেকে ফিরে নুন দিয়ে খাব। তারপর আখের রসে চুমুক দিয়ে আজকের মধ্যাহ্নভোজটা সারবো। তুমি মাটির নীচের ঘর থেকে একগামলা আখের রস তুলে এন।

হাবী বললে, আচ্ছা আচ্ছা। তুমি কিচ্ছু ভেব না, আমি সব ঠিক করে রেখে দেব।

কিষাণ ক্ষেতে চলে যাবার পর হাবী সেই মাগুর মাছটাকে একটা গামলায় ফেলে সেদ্ধ করতে লাগল। মাছ সেদ্ধ হয়ে যেতে একটা থালায় সেটা রেখে হাবী ঠাণ্ডা করতে দিলে।

এমন সময় তার আখের রসের কথা মনে পড়ল। এই যাঃ! সব ভুলে গেছি! সে তাড়াতাড়ি ছুটল রস আনতে।

একটা গামলা নিয়ে একটা জালার পাশে রেখে সে জালাটা আস্তে আস্তে তার ওপর একটু হেলিয়ে দিলে। সবটা একসঙ্গে না ঢেলে একটু একটু করে ঢাললে গ্লাসের মুখ থেকে যেমন একভাবে সুতোর মত জল পড়ে, জালাটা হেলিয়ে দিতে জালার রস ঠিক সেইভাবে গামলায় পড়তে লাগল।

হাবী জালাটা ধরে না থেকে তার তলায় একটা কাঠের টুকরো গুঁজে দিয়ে সেটাকে একভাবে দাঁড় করিয়ে দিলে। সরু সুতোর মত রস পড়তে লাগল।

কিষাণের একটা পোষা কুকুর ছিল। তার নাম কেলো। ভারী পেটুক সে। ঢাকা দেওয়া না থাকলেই সে খাবার দেখতে দেখতে তার পেটে চলে যেত।

চন্দ্রচূড়

ঠিক এমনি সময়ে হাবীর মনে পড়ল কেলোর কথা, ঐ যাঃ! মাছটা খোলা ফেলে এসেছি। এতক্ষণ কি কেলো সেটা আস্ত রেখেছে। যেই এই কথা মনে পড়া, রসের কথা ভুলে সে ছুটল ওপরে মাছ দেখতে। এদিকে রস পড়তেই লাগল।

হাবীও কেলোর পিছু পিছু ছুটল।

•• ওপরে এসে হাবী দেখে কেলো সেই সবে সেদ্ধ মাছটা দেখতে পেয়ে শুঁকছে। কেলোকে তাড়াবার জন্যে হাবী মুখে তাড়া দিয়ে ছুটে এল, এই যাঃ হ্যাস্ হ্যাস্!

কেলো একবার আড়চোখে হাবীকে দেখে সেদ্ধ মাছটা মুখে নিয়ে দে দৌড়।

হাবীও তার পিছু পিছু ছুটল।

অনেকদূর কেলোর পিছু পিছু দৌড়ে হাবী হাঁপিয়ে পড়ল। কেলোকে ধরতে পারলে না। আর কোন উপায় না দেখে একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করতে লাগল।

এমন সময়ে রসের কথা মনে পড়ায় সে আবার হাঁকপাঁক করে উঠল। ঐ যাঃ! জালাটা তো তুলে রাখা হয়নি। এতক্ষণ হয়তো গামলা ভরতি হয়ে মেঝেয় গড়িয়ে পড়েছে"।

একথা মনে হতেই বিশ্রাম করা তার মাথায় উঠল। সে আবার বাড়ির দিকে

● পূরবী দেবী

ছুটতে শুরু করলে। হাঁফাতে হাঁফাতে বাড়ি ফিরে নীচের তলায় নেমে দেখে সব জালা ভেঙে দু' টুকরো হয়ে রসে ঘর থই থই করছে।

হাবী হেলানো জালাটা দাঁড় না করিয়ে চলে গেছল। জালার মুখ খোলা আছে দেখে ইঁদুরদের মহা উৎসাহ লেগে যায়। তারা জালার ওপর লাফালাফি শুরু করে দেয়। তাদের লাফালাফির ধাক্কায় হেলানো জালাটা একটু টলে যেতেই গড়িয়ে পড়ে ভেঙে যায়। অন্য জালাগুলোও পর পর গায়ে গায়ে লাগানো ছিল। একটা গড়িয়ে যেতে সবগুলো সেইভাবেই ভেঙে যায়, আর রসে ঘর ভেসে যায়।

এমনটা যে হতে পারে তা হাবী ভাবেনি। যা ভেঙেছে ভেঙেছে এখন এত রস সে সাফ করে কি করে? এমনি সময় তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলল। তার ভাঁড়ারঘরে বস্তা বস্তা ময়দা ছিল। সে করলে কি, সব বস্তার ময়দা এনে রসের ওপর ছড়িয়ে দিলে। ব্লটিং পেপারের মত ময়দা সব রস শুষে নিলে। হাবীর কী আনন্দ! এতদিন বাদে সে একটা মনের মতো কাজ করেছে।

হাবী যখন সেখানে দাঁড়িয়ে নিজের বুদ্ধির তারিফ করছিল, কিষাণ এসে সেখানে হাজির হল। ব্যাপার দেখে তো তার চক্ষু চড়কগাছ। সে কঠিন স্বরে বললে, এসব কি হল?

হাবী ভেবেছিল তার বুদ্ধি দেখে কিষাণ তার খুব প্রশংসা করবে। তাই সে হাসিমুখে বললে, এই দেখ কেমন বুদ্ধি করে তোমার ঘর শুকিয়ে দিলুম।

সে কথা শুনে কিষাণ ধমক দিয়ে বললে, সব তুমি নষ্ট করে দিলে, বস্তা বস্তা ময়দা, জালা জালা রস, কিছু কি আর রাখলে না!

কিষাণের ধমক খেয়ে হাবীর মনে বড় কষ্ট হল। সে কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে, আমার কাজ যদি ভাল নয় তবে আমায় বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও।

বউকে বাপের বাড়ি পাঠালে বন্ধুরা সব নিন্দে করবে। তাই কিষাণ আর না বকে বললে, ঠিক আছে ঠিক আছে। তুমি ওপরে এস।

সে হাবীকে নিয়ে ওপরে এল। তখন ক্ষিদেতে তার পেট চুঁই চুঁই করছিল। সে বললে, আমার মাগুর মাছ কই?

হাবী বললে, আমি যখন নীচে গেছলাম রস আনতে তোমার পোষা কুকুর সেটা নিয়ে পালিয়েছে। তাকে ধরতে গিয়েই তো এই কাণ্ড হল।

আবার কিষাণ রেগে গিয়ে এক ধমক দিলে।

কিষাণের ধমক খেয়ে হাবী কাঁদতে কাঁদতে বললে, আমি কত চেষ্টা করেছি তোমায় খুশী করতে অথচ তুমি রাগ করছ। আমি থাকলেই তোমার রাগ হবে। আমায় বাপের বাড়ি রেখে এস।

কিষাণ বললে, থাক থাক—।

সে সেদিন শুধু মুড়ি আর জল খেয়ে দিন কাটালে।

হাবীর রকমসকম দেখে কিষাণের মনে ভয় হল। কি জানি কোনদিন হয়তো বোকার মতো তার জমানো টাকা কাউকে দিয়ে বসবে। তার চেয়ে সেগুলো মাটিতে পুঁতে রাখলে হাবী আর নাগাল পাবে না। এই ভেবে সে তার হাতবাক্স-ভরতি টাকাপয়সা বাড়ির সামনে বাগানে পুঁতে রাখলে। সে ভেবেছিল হাবী কিছু দেখতে পায়নি। তাই নিশ্চিন্তমনে বাড়ি ঢুকতেই হাবী জিজ্ঞেস করলে, মাটিতে কি পুঁতছিলে গো?

হাবী যে জানলা দিয়ে দেখছিল সেটা কিষাণ টের পায়নি। সে বললে, ওসব পুরানো অকেজো লোহালক্কড়। তুমি কিন্তু ওগুলো দেখো না।

হাবী বললে, আচ্ছা।

সেদিন কিষাণ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দুজন পুরানো বাসনের বদলে নতুন বাসন বিক্রিওলা এসে তাদের বাড়িতে হাজির হল।

হাবী বললে, আমার ঘরে পুরানো কিছু নেই। আমার বাসন চাই না।

লোক দুটো নাছোড়বান্দা। তারা বললে, বাসন না থাকে না থাক, লোহালক্কড় আছে তো! তাই নিয়ে এস। তার বদলে বাসন দেব।

হাবী বললে, বাড়িতে তেমন কিছু নেই। তবে ঐ মাটিতে পোঁতা আছে। যদি তোমাদের কাজে লাগে মাটি খুঁড়ে দেখতে পার।

হাবীর কথা শুনে লোক দুজন মাটি খুঁড়তে লাগল।
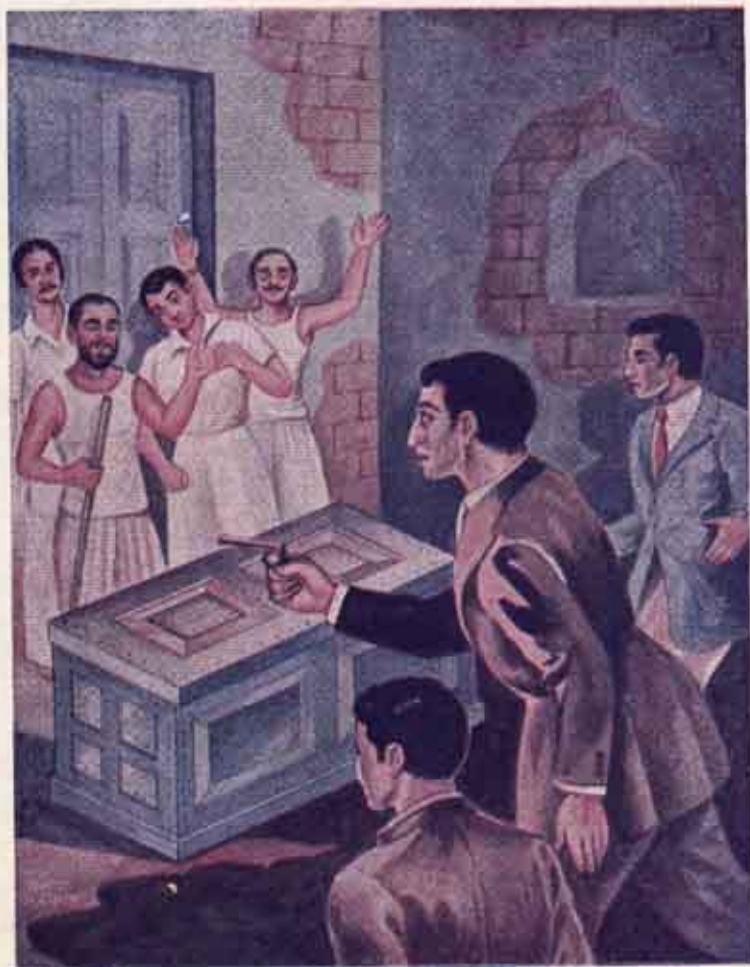
'হাত তুলে দাঁড়া সব শয়তান।' বিরাজবাবুর কর্কশ কণ্ঠ, হাতে নলা রিভলভার। [পৃঃ ২১০

একটু খোঁড়ার পরই তারা টাকাভরতি কিষাণের বাক্সটা পেলে। খুব খুশী হয়ে সব বাসনপত্র হাবীকে দিয়ে বলে গেল, তোমার পুরানো লোহার বদলে এই বাসন দিয়ে গেলাম।

বাজে অকেজো লোহার বদলে এতগুলো নতুন বাসন পেয়ে হাবীর আনন্দ দেখে কে! কিন্তু বাসনগুলো সে রাখে কোথায়? সব জায়গায় জিনিস ভরতি। খুঁজতে খুঁজতে সে একটা বাক্স পেলে। সেই বাক্সের মধ্যে বাসনগুলো রেখে ডালা বন্ধ করতে গিয়ে দেখে বাক্স আর বন্ধ হয় না। বাসনগুলো ভরতি হয়ে বাক্স থেকে মাথা উঁচু করে আছে। কিছুতে ডালা বন্ধ করতে না পেরে হাবী তার উপর চড়ে বসল। হাবীর ভারে বাসনগুলো সব ভেঙে গুঁড়িয়ে বাক্সের মধ্যে ঢুকে গেল আর ডালাও বেমালুম বন্ধ হয়ে গেল।

ডালা বন্ধ করে হাবী বার বার বাইরের দিকে দেখতে লাগল। তার এত বড় বুদ্ধির কথা তো কিষাণকে না বলে আর থাকা যায় না। তাই সে ছটফট করতে থাকে কিষাণের অপেক্ষায়।

একটু খোঁড়ার পরই তারা টাকাভরতি কিষাণের বাক্সটা পেল।

কিষাণকে বাড়ি ফিরতে দেখে হাবী বললে, তুমি যে আমায় ভারী বোকা বল, এবার কিন্তু আমি তোমার চেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ করেছি।

কি হয়েছে?

চন্দ্রচূড়

এসো দেখবে এসো। এই বলে হাবী কিষাণের হাত ধরে বাক্সের কাছে এনে ডালা খুলে দিলে।

বাক্সের মধ্যে একগাদা নতুন ভাঙা বাসন দেখে আশ্চর্য হয়ে কিষাণ বলে, এসব তুমি পেলে কোথায়?

তোমার পুরানো পচা পোঁতা লোহা বেচে পেয়েছি।

সেকি?

বাগানে তুমি যা পুঁতে রেখেছিলে, সেইগুলোর বদলে এত নতুন বাসন দিয়ে গেল।

সে কথা শুনে কিষাণের মাথা ঘুরে গেছে। সে তাড়াতাড়ি বাগানে গিয়ে দেখে এল। তারপর নিজের মাথা চাপড়ে বললে, এ তুমি করলে কী! ওখানে আমার সব জমানো টাকা পোঁতা ছিল যে। হায় হায়, তোমার জন্যে সব গেল দেখছি!

কিষাণের মাথাচাপড়ানি ও ছটফটানি দেখে হাবী বললে, তুমি তো আমায় সে কথা বলনি, বলেছিলে পচা লোহা। আমার আর দোষ কি!

কিষাণ ভাবলে যদি হাবীকে ধমকায় তাহলে সে এখনি বাপের বাড়ি চলে যেতে চাইবে। তার চেয়ে সেই চোর দুটোকে যাতে ধরতে পারা যায় সেই চেষ্টা করা ভাল।

সে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরোল।

হাবী জিজ্ঞেস করলে, কোথায় যাচ্ছ?

চোর ধরতে।

চল আমিও তোমার সঙ্গে যাই। এই বলে হাবী তাড়াতাড়ি শাড়িটা বদলে এল। যাবার আগে বাড়ির দরজায় তালা দিয়ে দিলে। তালা দিয়ে মনে হল যদি পথে চাবিটা হারিয়ে যায় তাহলে ফিরে বাড়ি ঢুকবো কি করে? যেই এই কথা মনে হওয়া অমনি চাবিটা জানলা গলিয়ে ঘরের মেঝেয় ফেলে দিয়ে খুশী মনে কিষাণের পেছনে পেছন যেতে শুরু করলে।

ঠিক দুপুরে অনেকটা পথ হেঁটে কিষাণের তেষ্টা পেল। সে হাবীকে বললে, বড় জলতেষ্টা পাচ্ছে, তুমি একটু জল খাওয়াতে পার?

চন্দ্রচূড়

আগেই বলেছি কোন কাজে হাবী না বলে না। সে বলল, তুমি এখানে বসে থাক আমি আসছি জল নিয়ে।

কিষাণকে একটা গাছের ছায়ায় বসিয়ে হাবী ফিরে এল বাড়িতে। চাবি খুলতে গিয়ে দেখে চাবি নেই। সে সেটা ঘরের মেঝেতে ফেলে দিয়েছে। এখন উপায় ?

এমন সময় তার মনে পড়ল পেছনের খিড়কি দরজাটার কথা। সেটা বিশেষ জোরালো নয়। টানাটানি করলে খুলে যেতে পারে। এ কথা মনে হতে সে বাড়ির পেছনের দরজার দিকে এসে হাজির হল। সে দরজা ভেতর থেকে ছিটকিনি দিয়ে বন্ধ। তা হোক। হাবী প্রাণপণে দরজা দুহাতে ধরে টান দিলে। কবজা থেকে দরজাটা উপড়ে তার হাতে চলে এল।

দরজাটা একপাশে দাঁড় করিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে হাবী এক কুঁজো জল হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল তাড়াতাড়ি। বাড়ির বাইরে বেরিয়ে তার মনে হল দরজাটা যদি সে এমনি আলগা ফেলে যায় তাহলে সেটা চোরের হাতে চুরি যেতে পারে। তাই আর কোন কথা না ভেবে সে দরজাটা পিঠে নিয়েই চলতে শুরু করলে।

তাকে এইভাবে আসতে দেখে কিষাণ তো প্রথমে খুবই চমকে গেল। তারপর সব কথা শুনে রাগ করে বললে, যেমন কর্ম তেমনি ফল। তোমাকেই ওটাকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে।

হাবীর তাতে দুঃখু নেই।

তারপর তারা হাঁটতে হাঁটতে সন্ধ্যের সময় একটা জঙ্গলের কাছে এসে উপস্থিত হল। জঙ্গল থেকে রাত্তিরবেলা বাঘ ভাল্লুক বেরোতে পারে এই ভয়ে তারা একটা গাছে উঠে পড়ল। গাছের ওপরও সেই দরজাটা হাবীর পিঠে ছিল আর হাতে ছিল কলসী।

তারা খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর দুজন ডাকাত এসে গাছের তলায় বসল। তাদের দেখে কিষাণ ও হাবী ভয়ে কাঁপতে লাগল। অন্ধকারে ডাকাতদের মুখ দেখতে পাচ্ছিল না, শুধু তাদের কথাবার্তাই ওদের কানে আসছিল।

ভয় পেতে হাবীর হাত পা অসাড় হয়ে আসতে থাকে। সে ফিসফিস করে

কিষাণকে বলে, আমার হাত ভেরে আসছে। আমি আর কলসীটা ধরে রাখতে পারছি না। এখনি হাত ফসকে পড়ে যাবে।

কলসীটা গিয়ে ধপাস করে একটা ডাকাতের মাথার পড়ে ভেঙে গেল।

সে কথা শুনে কিষাণ চুপি চুপি বলে, খবরদার অমন কাজ কোর না! তাহলে ওরা জানতে পারবে। আমাদের আর রক্ষে থাকবে না।

কিন্তু সে হাত বাড়িয়ে হাবীর কাছ থেকে কলসীটা নিতেও পারছে না।

কিষাণ সাবধান করে দিলেও হাবী আর কলসীটা ধরে রাখতে পারলে না। সেটা গিয়ে ধপাস করে একটা ডাকাতের মাথায় পড়ে ভেঙে গেল। কলসীর জলে ভিজে গেল সে।

আচমকা আকাশ থেকে একটা কলসী মাথায় পড়লে কে না ভয় পায়। ডাকাত দুটোও খুবই ভয় পেলে। এদিক ওদিক ওপরদিকে চেয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে তারা ধরে নিলে নিশ্চয়ই কোন অশরীরী ভূতের কাণ্ড। তা না হলে এই নির্জন বনে গাছের ওপর থেকে আচমকা কলসী ভেঙে পড়বে কেন তাদের মাথায়।

তখন তারা জোড়হাতে প্রার্থনা করতে লাগল, হে অপদেবতা! ভূতরাজ! রাগ কোর না। আমরা তোমার পূজো দেব।

● পূরবী দেবী

সে কথায় কেউ উত্তর দিলে না।

তখন ডাকাত দুজন আবার পরামর্শ করতে লাগল।

এমন সময় হাবী আবার ফিসফিস করে বললে, আমার পিঠটা টাটিয়ে উঠেছে। দরজাটা আর রাখতে পারছি না।

সে কথা শুনে শিউরে উঠে কিষাণ বললে, চুপ চুপ আস্তে! আর একটু ধরে রাখ। ওরা চলে গেলে ফেলে দিও।

চেষ্টা করেও হাবী আর দরজাটা বইতে পারে না। সে সেটাকে ফেলে দেয় পিঠ থেকে। দরজাটা ডালপালা নাড়িয়ে হুড়মুড় করে এসে পড়ল ডাকাতদের মাঝ-খানে। হঠাৎ আকাশ থেকে একটা দরজা পড়তে দেখলে কার না ভয় করে। ডাকাত হলেও সে লোক দুটোও মানুষ। ভয় পেয়ে তারা সব কিছু ফেলে ভোঁ দৌড়।

লোক দুটো চোখের আড়ালে চলে যেতে কিষাণ গাছ থেকে নেমে পড়ল। কিষাণের দেখাদেখি তার বউও নেমে এল। নীচে নেমে এসে দেখে একটা বাক্স পড়ে আছে। বাক্সটা হাতে তুলে নিয়ে কিষাণ সেটা চিনতে পারে। তাড়াতাড়ি ডালা খুলে দেখে তার জমানো টাকাকড়ি সব মজুদ আছে।

সে সেটা হাবীকে দেখিয়ে বলে, ভাগ্যিস তুমি কলসী আর দরজাটা ফেলে দিয়েছিলে তাইতো আবার আমার টাকাকড়ি ফিরে পেলুম। সত্যি তোমার বুদ্ধি আছে।

কিষাণের কাছে প্রশংসা পেয়ে হাবীর খুব আনন্দ হল। সে খুশী হয়ে দরজাটা কিষাণের পিঠে তুলে দিলে।

এবার দরজাটা বয়ে নিয়ে যেতে কিষাণের আর কোন আপত্তি হল না। *

---

* ইংরাজী গল্প থেকে।

———

—প্রবীরকুমার

তখন সবে চাকরিতে ঢুকেছি। চব্বিশ পরগনার এক ছোট শহরে এসে কাজে যোগ দিয়েছি। দিন কয়েক পর নির্দেশ এলো, একটি মামলার তদারকে সুন্দরবন অঞ্চলে যেতে হবে। সেকালের সুন্দরবন ছিল অতি ভয়াবহ। কিন্তু সরকারী চাকরি, না গিয়েও উপায় নেই। ভয়-ভাবনার সঙ্গে তল্পী-তল্পা নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হলো।

যেখানে এসে উঠলুম, সেখানে না ছিল কোন বসতি, না কোন লোকজন। জঙ্গলের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় এক ডাকবাংলো। সরকারী কাজে মাঝে মাঝে লোক-

জন আসে, তাই সরকার থেকেই এই বাংলো তৈরি করে রাখা হয়েছে। বাংলোর খানসামা সেখানেই তার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে থাকে।

কতদিন সেখানে থাকতে হবে তার স্থির নেই। কাজেই খানসামার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে ঘর-দোরগুলি দেখে নিলুম।

বাংলোয় মাত্র দুখানি ঘর আর তারই সঙ্গে একটি স্নানের ঘর। দুতিন বালতি জল সব সময়ই সেখানে সাজিয়ে রাখা থাকে। পাশেই দেয়ালের দিকে একটি গর্ত। স্নানের জল এই গর্ত দিয়েই বাইরের নরদমায় গিয়ে পড়ে।

সারাদিনের পরিশ্রমে গা ঘামে চটচট করছিল। ভাল করে গা-হাত ধুয়ে বারান্দায় এসে বসলাম। খানসামা যা খাবার দিয়ে গেল—এই বিজন বনের পক্ষে তা ভালোই বলতে হবে। খেয়ে দেয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। দেখতে দেখতে ঘুমে চোখের পাতা ভারী হয়ে এলো।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না। ঘুম গাঢ় হয়নি। নানা দুঃস্বপ্নে বড় অস্বস্তি বোধ করছিলাম। চোখের সামনে নানা অদ্ভুত জানোয়ার যেন চরে বেড়াচ্ছে! তাদের হাত এড়াবার জন্য আমি সিঁড়ি দিয়ে উপরে যাচ্ছি কিন্তু ধাপগুলো যেন পায়ের চাপে বসে যাচ্ছে! হঠাৎ মনে হয়, কে যেন আমার বুকে চেপে বসে দম আটকে দিচ্ছে! এমনি সব আতঙ্কের মধ্যে ঘুম ভেঙে গেল।

চোখ মেলে যে দৃশ্য দেখলাম তাতে শরীরের রক্ত জল হবার যোগাড়! আমার বুকে লেপের উপর কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে এক ভীষণ কাল-কেউটে!

স্নানের ঘরের সেই গর্ত দিয়েই যে সাপটা ঘরে ঢুকেছে তাতে সন্দেহ নেই, পরে গরমের আশায় আশ্রয় নিয়েছে এসে বিছানার উপর। নড়ানড়িতে ক্রুদ্ধ হয়ে সাপটা আততায়ীর উদ্দেশে এদিক-ওদিক মাথা ঘুরিয়ে দেখছে। চোখ দুটি যেন জ্বলছে! চেরা জিভটি মুখের ভিতর থেকে একবার বেরুচ্ছে আবার ঢুকছে আর শব্দ হচ্ছে হিস্ হিস্ করে!

সাক্ষাৎ মৃত্যুর কবলে পড়ে আতঙ্কে সেই শীতের রাতেও ঘামে আমার কপাল ভিজে গেল। আমি স্থির হয়ে পড়ে রইলুম। এ বিপদেও আমার এটুকু জ্ঞান ছিল যে, এখন একটু নড়াচড়া করলেই আর রক্ষা নেই!

কেউটে চোরটার মুখেই মারলে এক ছোবল। [পৃঃ ২৪৯

আমি স্থির হয়ে পড়ায় সাপটাও ক্রমশঃ শান্ত হয়ে ফণা গুটিয়ে আবার কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়লো। ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছি; কিন্তু সাপটা এক জায়গায় চেপে বসে থাকায় ক্রমশঃ তার ভারটা অসহ্য হয়ে উঠতে থাকে। হয়ত খানিক পরেই আমি নড়ে উঠতাম! এমন সময় ঘটলো এক কাণ্ড! জানলা খুলে একটি লোক ঢুকলো আমার ঘরে।

আবছা-অন্ধকারে আড়চোখে চেয়ে তার চেহারা আর হাব-ভাব দেখে বুঝলাম, চুরির উদ্দেশ্যেই সে ঘরে ঢুকেছে। তার হাতে এক ছোরা।

আমার গায়ে ছিল লেপ। এদিক-ওদিক চেয়ে চোর আমার পায়ের দিকে গিয়ে আস্তে আস্তে লেপখানা ধরেই টানতে থাকে, কিন্তু ভারী দেখে আশ্চর্য হয়ে মাথার দিকে এগিয়ে আসে।

ভয়ে আমার প্রাণ ধড়ফড় করতে লাগলো। সাপটা জেগে উঠে প্রথমে

আমাকেই ছোবল দেবে তো! চোর ততক্ষণে এগিয়ে এসে অন্ধকারে লেপের বদলে সহসা কেউটেকে ধরেই দিলে টান!

আর যায় কোথা? কেউটে চোরটার মুখেই মারলে এক ছোবল। যন্ত্রণায় সে একবার পেছিয়ে গেল, তারপরই হাতের ছোরার আঘাতে সাপটাকে দু-টুকরো করে ফেললে। মৃত্যু নিকটে বুঝে হতাশায় চোর মেঝের ওপর বসে পড়ে।

আমিও ততক্ষণ বিছানা ছেড়ে চেঁচামেচি শুরু করেছি! চাকর আর খানসামা ছুটে এসে প্রথমেই চোরটাকে গ্রেফতার করতে উদ্যত হলো। কিন্তু তাদের বাধা দিলুম আমি। আহা বেচারা! না জেনে আমার প্রাণ বাঁচিয়ে নিজে সে মরণের পথে যাচ্ছে। এখন ওকে টানা-হেঁচড়া করে কষ্ট দিয়ে লাভ কি?

এই ঘটনার পর চোরটি আর মাত্র বারো ঘণ্টা বেঁচে ছিল। তারপর বহুদিন আমি রাত্রে ভাল করে ঘুমোতে পারিনি। চোখের পাতা বন্ধ করলেই মনে হোত সাপটা যেন আমার বুকের ওপর চেপে বসে আছে!

বিপদের মুখোমুখি

[শিকার কাহিনী]

—শ্রীপ্রবীরকুমার

রাম সেনের শিকারী বলে বন্ধু-মহলে বরাবরই খ্যাতি ছিল। কিন্তু কেবল শিকারী বললে তাঁকে ছোট করাই হয়। যে কেউ একবার মাত্র শিকারের সময় তাঁর সঙ্গী হয়েছে, সে-ই জানে, কী অদ্ভুত তাঁর সাহস! সে-সময় তাঁর সঙ্গীদের যদি কেউ বিপদে পড়তো, নিজের জীবন তুচ্ছ করেও তিনি তাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করতেন।

একদিনের ঘটনা বলি।

তখন ছিল শীতকাল। বন্ধু-মহলে রটে গেল, রাম সেন আবার শিকারে বেরুবেন। সামনে বড়দিনের কয়েকদিন ছুটি। কলেজ বন্ধ। হাতেও বিশেষ কোন কাজ নেই। ইউ. টি. সি.তে বন্দুক ছোড়ার ট্রেনিং নিয়েছি। ভাবলাম, বীরত্ব দেখাবার এমন সুযোগ ছাড়ি কেন? ঘুরে আসি না কেন একবার আমাদের রামদার সঙ্গে। চাই কি, ভাল সাহস দেখিয়ে একটা কিছু শিকার করতে পারলে, বন্ধু-মহলে রামদার সঙ্গে আমার নামটাও শিকারী বলে ধরা হবে।

তখুনি রামদার সঙ্গে দেখা করে সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেললাম। শিকারের চিন্তার মধ্যে উত্তেজনা থাকলেও কোলকাতা থেকে যখন আমরা সুন্দরবনের দিকে যাত্রা করলাম, তখন যেন বড় ভয় ভয় করতে শুরু করলো। আগেই বলে রাখা ভাল, এর আগে আলিপুরের খাঁচা ছাড়া বাঘের সঙ্গে মুখোমুখি আমার আর কখনো হয়নি।

চন্দ্রচূড়

বার বার মনে হতে লাগলো, আবার ফিরে আসবো তো? এই সুন্দর কোলকাতা মহানগরী—একে আবার দেখতে পাবো তো?

সেবারে আমরা ছিলাম তিনজন। আমি, রামদা, আর রামদারই আর এক অফিসের বন্ধু। বন্ধুটি আরও দুবার রামদার সঙ্গে শিকারে গিয়েছিলেন। আমাকে সাহস দেবার জন্য তাঁরা নানারকম গল্পের অবতারণা করতে থাকেন; কিন্তু মুখে সাহস দেখালেও মন আমার ক্রমশঃই ভয়ে অবসন্ন হয়ে পড়ছিল।

গ্রাম থেকে সকাল বেলা কিছু খেয়ে নিয়ে শিকারীর পোশাক পরে সঙ্গে কিছু পাঁউরুটি আর ফ্লাস্কে চা নিয়ে আমরা যাত্রা করলাম বাঘের উদ্দেশ্যে।

স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে সংবাদ পাওয়া গেল, আজ কদিন ধরে নাকি একটা বাঘ গ্রামে ভীষণ অত্যাচার করছে। আজ এর গরু, কাল তার ছাগল তো নিয়ে যাচ্ছেই, এর ওপর মোড়লের ছেলেকে নাকি পরশু রাত্রে ধরে নিয়ে গেছে। খবরটা শুনে আমার মনে হল, এ যাত্রা বন থেকে কেবল এক রামদা ছাড়া আমাদের মধ্যে আর কেউই বোধ হয় ফিরবে না।

মনের ভাব যথাসম্ভব মনেই চেপে রেখে শিকারী-বুট ঠকঠক করে হাতে বন্দুক দুলিয়ে আমরা যাত্রা করলাম সেই বাঘটার উদ্দেশে।

বনের মধ্যে ঢুকেই রামদা আমাদের নির্দেশ দিলেন নিঃশব্দে তাঁকে অনুসরণ করতে। কেন যে রামদা আমাদের নিঃশব্দে অনুসরণ করতে বললেন, তা প্রথমটা বুঝিনি। বুঝলাম খানিকক্ষণ পরে, যখন মাটির ওপর বাঘের বিরাট বিরাট পায়ের ছাপ আর তাজা রক্তের দাগ সুস্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম। রামদার বন্ধু ভয় পেয়ে গিয়ে রামদাকে প্রশ্ন করেন,—"রক্তটা কিসের?"

উত্তরে রামদা বলেন,—"শিকার মুখে করে বাঘটা যখন বনের মধ্যে ঢুকেছে, তখনই এই রক্ত মাটির ওপর পড়েছে। রক্তটা জন্তুরও হতে পারে, মানুষেরও হতে পারে।"

—মানুষেরও হতে পারে!

চন্দ্রচূড়

কথাটা শুনেই ভয়ে মনটা কেমন ছ্যাঁৎ করে উঠলো। কারুরই মুখে কোন কথা নেই! পায়ের চাপে কেবল শুকনো পাতা ভাঙার মচমচ শব্দ।

আমরা যে পথটা দিয়ে চলেছিলাম, সে পথটা একটা সোজা মাটির টিলার কাছে এসে শেষ হয়ে গেছে। টিলাটাও বেশ উঁচু। ওদিকে যে কি আছে, তা টিলার ওপর না চড়ে দেখবার উপায় নেই। রামদা আমাকে লক্ষ্য করে ফিসফিস করে বললেন,—"কাছেই বাঘ থাকা সম্ভব।"

ঠিক সেই সময় একটা ঘর্‌-র্‌-র্‌ ঘর্‌-র্‌-র্‌ আওয়াজ আমাদের কানে এলো। টিলার পাশে একটা ঝোপ ভীষণভাবে দুলে উঠলো। পরমুহূর্তেই একটা বিরাট বাঘ বিড়ালের মত লাফিয়ে লাফিয়ে টিলার উপর উঠতে লাগলো। গায়ের হলদে রঙের ওপর কালো ডোরা কাটা দাগ! সূর্যের আলোতে তার মসৃণ দেহ যেন চকচক করে উঠলো। একটা উৎকট বিশ্রী গন্ধে সেখানকার সমস্ত বাতাস ভরে উঠলো। আলিপুর চিড়িয়াখানায় সুরক্ষিত খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে বাঘ দেখার একরকম অনুভূতি, আর অনভিজ্ঞ হাতে বন্দুক নিয়ে সুন্দরবনে বাঘের মুখোমুখি দাঁড়ানো আর এক অনুভূতি।

রামদার বন্ধু ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বন্দুক তুলে ধরে গুলি ছুড়লেন। আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে আওয়াজ হল—গুড়ুম—গুড়ুম!

ততক্ষণে বাঘটা ঠিক টিলার ওপরে উঠে গেছে; বন্দুকের আওয়াজ শুনে পিছন ফিরে একবার আমাদের দেখে নিল। সে কী বীভৎস তার চোখের চাহনি! যেন দুটো নীল আগুনের গোলা দপদপ করে জ্বলে উঠলো! পরমুহূর্তেই বন কাঁপিয়ে ব্যাঘ্ররাজ দিলেন এক হুংকার! তারপর টিলা থেকে লাফিয়ে পড়ে অদৃশ্য হলেন।

রামদাও তাড়াতাড়ি টিলার ওপরে উঠতে থাকেন। কলের পুতুলের মত আমরাও তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলুম। টিলার ওপরে উঠে দেখি ততক্ষণে বাঘ মহাপ্রভু পৌঁছে গেছেন পঞ্চাশ-ষাট গজ দূরে ছোট্ট একটা সরু নদীর ধারে। তাকে নদী বললে নদীর অপমানই করা হবে। একটা ছোট খালই বলা চলে; সমুদ্রের জল সেই খালের মধ্যে ঢুকে বনের মধ্যে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। সেখানে বাঘটা হঠাৎ মাটির ওপর চারটে পা দুমড়ে শুয়ে পড়লো। তারপরই লাফিয়ে অনায়াসে

● শ্রীপ্রবীরকুমার

খালটা পার হয়ে গেল। ততক্ষণে আমরাও রামদার পেছন পেছন খালের ধারে এসে পৌঁছেছি। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, বাঘটা গেল কোথায়? ওপারে তো তার চিহ্নমাত্রও নেই!

খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে রামদাকে প্রশ্ন করি,—"বাঘটা তাহলে ভয় পেয়ে পালিয়েছে কি বলেন?"

—"পালিয়েছে! না ওপারে গা-ঢাকা দিয়ে আমাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বার জন্য সুযোগের অপেক্ষা করছে! যত তাড়াতাড়ি পারো, এইবেলা গাছে উঠে পড়ো। নইলে কোন্ সময় যে বাঘটা ওপার থেকে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে, কে জানে!"

রামদার কথা শুনে চক্ষু তো স্থির হয়ে যাবার যোগাড়! ভয়ে আমার ভীষণ পিপাসা পেয়ে গেল—মুখের ভেতরটা একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে। সামনে জল দেখে মুখে-চোখে জল ছিটিয়ে নিজেকে খানিকটা সুস্থ করে নেব ভাবলাম। কিন্তু যেই জলে হাত দিতে যাব, সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে রামদা আমার শার্টের কলারটা টেনে ধরলেন। চেঁচিয়ে বললেন,—"করছো কি? মনে রেখো, এটা সুন্দরবন! এখানে ডাঙায় বাঘ, জলে কুমির! কুমির এখুনি লেজের এক ঝাপটায় তোমাকে কোথায় যে ফেলে দেবে, ঠিকানা নেই!"

প্রথমটা রামদার কথা বিশ্বাস হল না। তাই রামদার মুখের দিকে বোকার মত চেয়ে রইলাম। আমার মনের কথা বুঝতে পেরে দূরে রৌদ্রে পড়ে-থাকা একটা গাছের গুঁড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে রামদা বললেন,—"ভাবছো ওটা গাছের গুঁড়ি? তা মোটেই নয়! শিকার ধরবার আশায় কুমির ঐভাবে মড়ার মত পড়ে আছে!"

রামদার কথা শুনে ভয়ে আমার হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে যাবার যোগাড়। তখন খানিকটা প্রাণের দায়েই তাড়াতাড়ি আমরা তিনজনে একটা গাছে উঠে পড়লাম। তিনজনে তিনটে গাছের ডাল আশ্রয় করে ভগবানের নাম-জপ করতে লাগলাম।

ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে আমার হাতে দিয়ে রামদা আমাকে বলেন,—"খেয়ে নাও, শরীরে বল পাবে।"

চন্দ্রচূড়

চা খেয়ে শরীরে যেন নতুন উদ্যম ফিরে এলো। ওদিকে সূর্যদেবও ক্রমশঃ মাথার ওপর থেকে পশ্চিমে ঢলে পড়েছেন। ঘড়ির কাঁটা ঘোষণা করে, আর দুঘণ্টা পরে সূর্য অস্ত যাবে!

বন-পথ ধরে অন্ধকারে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতেও আমার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। কিন্তু সে কথা রামদাকে বলবার উপায় নেই। তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওপারের দিকে চেয়ে বাঘের প্রতীক্ষা করছেন।

ওপারের একটা ঝোপ হঠাৎ দুলে উঠলো। পরমুহূর্তে তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো আমাদের পূর্বপরিচিত সেই ব্যাঘ্ররাজ! চোখে তার কী হিংস্র চাহনি! সে এক-একবার পিছন দিকে চায়, আবার মুখ ফিরিয়ে আমাদের লক্ষ্য করে। আমার তখন কেবলই মনে হচ্ছে, বাঘটা যদি সোজা লাফিয়ে এসে পড়ে আমাদেরই গাছের নীচে?

হঠাৎ সরসর করে কিসের যেন আওয়াজ শোনা যায়। বাঘের ওপর থেকে চোখ ফেরাতে তখন আর ইচ্ছা হচ্ছিল না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও চোখ ফেরাতে হল, যখন ঝপাৎ করে একটা শব্দ হল! মুখ ফিরিয়ে যা দেখলাম, তাতে আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল! একটা ময়াল সাপ গাছের ডালে নিজের দেহটাকে জড়িয়ে নিয়ে দিবানিদ্রা দিচ্ছিল। আমরা গাছে ওঠাতে তার সুখ-নিদ্রা ভেঙে যায়। গাছের ডালের পাক খুলতে-খুলতে সাপটা দোল খাচ্ছে। আর প্রতিমুহূর্তে রামদার বন্ধুকে ধরে জলযোগের চেষ্টা করছিল। খুব সম্ভব রামদার বন্ধু বিপদের গুরুত্ব অনুভব করে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়েছেন! মাটির দিকে চেয়ে দেখি, তিনি কেবল মাটিতেই পড়েননি, একেবারে গিয়ে পড়েছেন খালের ধারে।

সাপের হাত থেকে রেহাই পেলেও, কুমির বা বাঘের পেটে তাঁকে যে যেতে হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই!

ভয়ে আমি তখন ভগবানের নাম জপ করতে লাগলাম।

ওদিকে জলের ওপরেও কি যেন ভারী জিনিস পড়ার শব্দ হল। দূরে চেয়ে দেখি, কুমিরটা এতক্ষণ যেখানে রোদ পোয়াচ্ছিল, সেখানে আর নেই। কুমিরটার

বিশাল দেহটা একবার শুধু জলের ওপরে দেখা গেল। পরমুহূর্তেই জলের তলায় সেটা অদৃশ্য হল।

রামদার শত নিষেধ সত্ত্বেও আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো একটা কথা,—"কি হবে রামদা!"

আমাকে ভয় না পেতে বলে রামদা লাফিয়ে পড়লেন বন্ধুটির কাছে। তারপরে বন্ধুর দেহের দুদিকে পা রেখে হাঁটু গেড়ে তিনি যেন কিসের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। তাঁর সেই চ্যালেঞ্জের ভাব আমি কোনদিন ভুলবো না। তাঁর মুখে যেন ফুটে উঠেছিল,—আমাকে না মেরে আমার বন্ধুর কেশাগ্র স্পর্শ করবার ক্ষমতা কারুর নেই!

ঠিক এমনি সময় কুমিরটা এসে তার লেজের ঝাপটা মারলো পাড়ের ওপর! সেই ঝাপটায় অনেকখানি পাড় ভেঙে জলে পড়লো। আমাদের গাছটাও থরথর করে কেঁপে উঠলো!

সুযোগ বুঝে বাঘ মহারাজও দিলেন এক লাফ! সোজা একেবারে রামদার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়াই তার লক্ষ্য! কী ভয়ানক দৃশ্য! এখুনি বাঘটা সজোরে এসে পড়বে রামদার ঘাড়ের ওপর! তারপর······

আমি আর চেয়ে দেখতে পারলাম না—ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললাম।

গুড়ুম—গুড়ুম—

বন্দুকের আওয়াজ শুনে মনের মধ্যে আবার সাহস এলো। তাহলে রামদাকে বাঘ মারতে পারেনি! চেয়ে দেখি খালের মাঝামাঝি জায়গায় এসে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে একবার গর্জন করে উঠলো বাঘটা। তারপরই ঝপাৎ করে গিয়ে পড়লো জলের মধ্যেই!

বিশ্রী কালো কালো কয়েকটি হিংস্র মুখ বাঘটির দেহ ঘিরে জলের ওপর ভেসে উঠলো, তারপর বাঘটার মৃতদেহ নিয়ে তারা জলের তলায় ডুব দিল।

আবার গর্জে উঠলো রামদার বন্দুক! এক ঝলক আগুন গিয়ে সাপটার সমস্ত আস্ফালন থামিয়ে দিল।

আমাকে নেমে আসবার জন্য ইশারা জানিয়ে রামদা ছোট ছেলের মত কোলে তুলে

নিলেন তাঁর বন্ধুকে। তারপর সেখান থেকে খানিকটা সরে এসে তাকে শুইয়ে দিলেন ঘাসের ওপর। ততক্ষণে আমিও গাছ থেকে নেমে এসেছি। কিছুক্ষণ দুজনার শুশ্রূষার ফলেই রামদার বন্ধু চোখ মেলে চাইলেন। খানিকটা গরম চা তাঁর মুখে ঢেলে দিতে দিতে রামদা বললেন,—"কি রকম ব্যাপার, আর বাঘ শিকার করতে আসবে?"

আকাশ বাতাস···গর্জন করে উঠলো বাঘটা। [পৃঃ ২৫৫

অস্তমিত সূর্যের শেষ আলোয় আমরা যাত্রা শুরু করলাম গ্রামের দিকে।

গ্রামের লোকেরা যখন জানতে পারলো যে, রামদা তাদের সেই মহা শত্রু বাঘটাকে মেরে ফেলেছে. তখন তাদের সে কী আনন্দ! আর এর পর আমি যে আর কোনদিন শিকারে গিয়ে বাহাদুরি দেখাতে চেষ্টা করিনি সে-কথা অবশ্য আজ আর স্বীকার করতে বাধা নেই!

শেষ